শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

১

সংকলিত গল্প

প্রাপ্তিস্থান

দে বুক স্টোর, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম প্রকাশ

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬২

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

প্রকাশনা

কল্পনা সেন

৫৪, নন্দনা পার্ক

কলিকাতা-৩৪

ব্যবস্থাপনা

সুব্রত চক্রবর্তী

মুদ্রণ

সুদীপ প্রিন্টার্স

৪/১এ, সনাতন শীল লেন,

কলিকাতা-১২

সংকলন কেন

বাবা চলে যাওয়ার পর তাঁর কিছু সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ গল্প ও কবিতার পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলাম। কবিতাগুলো দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। কেননা জানতাম লেখক-জীবনের প্রথমে কিছু কবিতা তিনি লিখলেও, পরে বিশেষ আর কবিতা লেখেননি ; কারণ কবিতার মাধ্যমে বক্তব্যকে তুলে ধরা ছিলো তাঁর মতে—'ভাবের ঘরে চুরি—আসলে জোচ্চুরি।'

কবিতাগুলো পেয়ে শুধু অবাক হইনি, সত্যি কথা বলতে কি, হয়েছিলাম আহত। কারণ আমার পরম স্নেহময় বাবা তাঁর শেষের একটি কবিতায় জীবনকে গোলাপফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন :

'স্মৃতি অতি উপাদেয়, এক গুচ্ছ গোলাপের মতো।

... ...

জীবনের মূল্য তাবৎ ফুলের চেয়ে বেশি জেনো,

তবে কেন মিছে রক্তাক্ত হওয়ার সাধ।'

এ'সব জানি। জেনেও রক্তাক্ত হওয়ার সাধ জাগে, সেই ক্ষতটুকুর লোভে, ক্ষতের দাগটুকুর লোভে।, বাবা কি সেই লোভের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন না হলে কী করে 'লাশ পিঠে লোক'এর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে লিখলেন 'যাবতীয় ইচ্ছার ওপর মারো ঝাঁটা।'

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটজনেরা জানতেন, দুর্বার কাঠিন্যে এই ধরনের উক্তি তিনি করলেও বাস্তব-তাঁকে এ'ভাবে চেনা কিন্তু কঠিন। বাস্তব বলতে, আমি তাঁর পারিবারিক জীবনের কথা বলছি, যে-জীবনের সঙ্গে তাঁর লেখক জীবনের কোনো মিল নেই। 'কোনো মিল নেই' কথাটা যত সহজে লিখলাম তার চেয়ে অনেক সহজে, অনেক অনায়াসে তিনি ছিলেন আমার বাবা। উনি ছিলেন আমার বন্ধুর মতো, সেজন্য পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে পারিনি, মাথা ঠেকিয়েছি নিশ্চয়, তবে তাঁর বুকে। সেজন্য বড় হয়েও তাঁর লেখা পড়তে আমার অস্বস্তি হত। ওই বিশেষ কারণ—লেখার

মধ্যে বাবাকে খুঁজে পাব না। আমার বাবা, লেখার মধ্যে কখনো 'লোকনাথ' কখনো 'ভূপতি'।

বাবা অসম্ভব রাগী, অসম্ভব অভিমানী ছিলেন কিন্তু তাঁর মধ্যে লুকিয়ে থাকত শিশুর অসহায়তা—শরৎবাবুর সিনেমা দেখতে বসে, আমি কাঁদিনি কিন্তু পাশে বসে বাবার কান্না দেখেছি। কিন্তু বাবা যখন 'লোকনাথ', তখন তিনি বোঝেন 'মানুষের স্নেহ, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা, রাগ, অভিমান কী ঠুনকো,—আদর্শ কী অলীক!'

বাবা চলে গেছেন আজ প্রায় সাত বছর হল। কিন্তু বাবার স্মৃতি আমার কাছে 'বাতিল বাবার স্মৃতি' নয়। অযৌক্তিক কিছু দুর্বলতা এই দীর্ঘ সাত বছর আমাকে হাত গুটিয়ে রাখতে বাধ্য করেছিল। গল্পগুলি সবই মুদ্রিত তবে অগ্রন্থিত। সেগুলিকে গ্রন্থাকারে রূপ দেওয়া হল। এলোমেলো ভাবে—কালক্রম না মেনে ; সম্পাদনা অপ্রয়োজনীয় জেনে। আমার প্রকাশনার অনভিজ্ঞতার কারণে অনেক ভুল-ত্রুটি থেকে গেল। কী করি!

বাবা জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না। এই বই প্রকাশে আমার কোনো জাগতিক স্বার্থ নেই। শুধু একটিমাত্র স্বার্থই কাজ করছে, গল্পগুলিকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া।

এই বই প্রকাশনার ব্যাপারে বহুজনের কাছে আমি নানা-ভাবে উপকৃত। তাদের সকলকে পৃথকভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো, এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবু যাঁর নাম উল্লেখ না করলে, আমার এই লেখা অসমাপ্ত থেকে যাবে, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। এই বইয়ের প্রচ্ছদ শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী স্বেচ্ছায় করে দিয়েছেন, তাঁর প্রিয় শান্তিদাকে স্মরণ করে। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর অবকাশ কোথায়! শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতাটি পুনঃ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। শ্রীরাধানাথ মণ্ডল এবং শ্রীসিদ্ধার্থ বসু, এঁদের আন্তরিক সহযোগিতা বিনা এই বই প্রকাশনা প্রায় অসম্ভব ছিল। এঁদের সকলের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

—অনন্যা দাশ

ভূমিকা নয়

ভূমিকা, দূর! এভাবে হয় না। বিষম সম্ভ্রান্ত দায় যে! যা কিনা বিদগ্ধ বিদ্বজ্জনেরই সাজে। না না, বিনয় নয়, ওটা কস্মিন কালে আমার ছিল না, এখনও নেই, তবু মুখর মুখবন্ধ একই সঙ্গে সৎ শ্রম আর স্থিরতা চেয়ে বসে কিনা! মুশকিল সেইখানে। দুটোকে কী করে মেলাই? তুকতাক-জানা পুরুত, নিদেন অঘটন-ঘটন-পটীয়ান ঘটক হলেও হয়তো-বা পারতুম। ভালো করতে গিয়ে যদি ভাণ্ডচি দিয়ে ফেলি? যদি ফেলি? এই ভয়। কলমটা খুলছি আর আঁটছি, খালি কালিই জমে যাচ্ছে। সাধে?

তবু বুক বেঁধে বসা তো গেল। ধৈর্যের আর স্থৈর্যের যে ঘাটতি, সেটা কি আর পুষিয়ে নিতে পারব না? আলবৎ পারব। অন্তত স্মৃতি দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে? মোটামুটি একই সঙ্গে তো লেখা-লেখির রাস্তায় হাঁটাহাঁটি শুরু করি—আমরা অনেকেই। কিংবা মাঠে নেমে পড়ি। খেলা আর হবে না ভাই বলে সে আচমকা গা-ঢাকা দিয়েছে কবে, আমরা কেউ কেউ এখনও লাইনসম্যান হিসেবে খড়ির দাগের বাইরে দাঁড়িয়ে নিশান ওড়াচ্ছি।

ইতিহাস হাতড়াতে গিয়ে এখন মনে হয়, সব যেন নদীর পাড়ের ঝাপসা ঝাউয়ের সারি, প্রাক্-ইতিহাস। মরা পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে গট গট যেতাম, সে কবে, কত দশক আগে? (আজ যা দশা, কে জানে শতকও হতে পারে।) যাক। আমাদের মনের মর্মর একই, তবে শান্তির পায়ের চাপে পাতাগুলো কাতরাত বেশি, মড়মড় আওয়াজ তুলত একটু আলাদা রকম। ওর আবার নাল-বাঁধানো জঙ্গি-জাতের বুট কিনা! বোধ হয় তাই।

এখন মনে হয়, জঙ্গি জীবনটাকে কোনও দিন ছাড়েনি শান্তি, ছাড়তে পারেনি, টিউনিকের মতো ওটা ওর বুকে-পিঠে সেঁটেই ছিল, যদিও জলচল গৃহস্থ বৃত্তি সে পরে মেনে নেয় বা মানতে বাধ্য হয়, কিন্তু জঙ্গি ভঙ্গিটা তার বরাবর বহাল রইল—আজীবন, আমরণ। যেমন তার লেখায়, তেমনই তার ওঠা-বসা চলা-ফেরার রোজানা নিয়মে কিংবা বে-নিয়মে। জঙ্গি এবং আরও সরাসরি বলি, জংলি। একে বিভূতিবাবুর আদলে আরণ্যক বললে শোধনবাদী হয়ে পড়ব।

লেখক শান্তির কথা বলতে গেলে মানুষটার কথা উঠেই পড়ে, আবার মানুষটার কথা বলতে গেলে—লেখকের। ওই যে আদিম, উদ্ধত, দুর্মদ প্রবলতা এর কতখানি ছিল তার খোলস, কতটাই বা তার সত্তা? এও তো হতে পারে খোলসটাকেই প'রে প'রে অভ্যাস করে ফেলেছিল বলে সেটাই কালে কালে তার নিজস্বতা হয়ে দাঁড়ায়। হয়ত আমদের অনেকেরই তাই। বাইরে থেকে আহৃত বস্তুতে নিজেকে এমন করে আবৃত করি যে, সেটা স্বভাবের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। যেমন নারকেল। রুখো-শুখো ছিবড়ে আর শক্ত খোলার তলায় সে যে নিজেকে ঢাকে, সেটা তার জল আর শাঁস লুকিয়ে রাখবে বলে নয় তো! আমি মনো-বিকলনের বিশারদ নই, তাই বলতে পারব না, শান্তি তার অভ্যন্তরে, নিভৃতে একটি সুন্দর সুডৌল স্বপ্ন, সংসার আর পৃথিবী মায়া দিয়ে, ছায়া দিয়ে সৃজন আর লালন করে গেছে কিনা। সেই যে স্বপ্ন, সেই যে সাধ, বাইরে তার বিম্ব দেখতে পেত না বলেই হয়তো আত্মহারা হয়ে আরও খেপে যেত সে—আঘাত পেয়ে আরও মাত্রাছাড়া জোরে আঘাত করে সব ভেঙেচুরে চুরমার করতে চাইত। এই ব্যাপারে অনুমান করি তার আর এক প্রধান পূর্বসূরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তার অরোধ্য, প্রায় আরাধ্য প্রেরণা। সমাজ-ব্যবস্থার স্বত্বভোগীদের সম্পর্কে যতটা, উপস্বত্বভোগীদের সম্পর্কেও ততটা—তার ঘৃণা ক্ষমাহীন। বলতে কি পরগাছাদের সম্পর্কে গ্লানি-বোধ করত বলেই শেষের দিকে সে পারতপক্ষে পত্র-পল্লবে শ্যামল বনস্পতির দিকেও তাকিয়ে থাকতে চাইত না। সে এক বিধ্বংসী জেদ—সে এক কালাপাহাড়ি জেহাদ—সাহিত্য-শিল্প-বিষয়ক সমুদয় সংস্কারের বিরুদ্ধে, প্রচলিত প্রতিটি প্রকরণের বিরুদ্ধেও। চরিত্রে আপস ছিল না বলেই সুষ্ট বা দুষ্ট সব চরিত্রকেই আগাগোড়া ব্যঙ্গ করে গিয়েছে সে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিখায় আর প্রাকারে ছিটিয়েছে থুতু, যেখানে ভেবেছে সে নিজেও সামিল, সেখানে আত্মগ্লানি থেকে রেহাই দেয়নি আপনাকেও।

তার বিদ্রূপের ছাপ ফুটে আছে এই বইয়ে সংকলিত গল্পের পর গল্পের নামকরণে। অনেকগুলি গানের, বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের। এখানে প্রশ্ন: এ কি শুধুই বিদ্রূপ? ঠাট্টা করে ব্যথাটা ওড়ানোর ফিকিরও নয় তো? সুন্দর, শোভন, মহীয়ান, মায়াবী কোনও সৌর-জগৎ সম্পর্কে পিপাসা, অভীপ্সা ওই ব্যঙ্গের ছদ্মবেশের তলাতেও ছলকে ওঠেনি কি?

এখানেই শান্তির সত্তার বিভাজন। তার ব্যক্তিত্বের, তার শিল্পকৃতিরও। অনেক মিথ্যের মুখোশ ছিঁড়ে দিয়েছে যে, সে নিজেও কি জানত এই কঠিন পরিহাস: আজন্ম একটি মিথ্যাকে বহন করেছে সেও? তার নামটাই মিথ্যে। শান্তি কোনও দিন শান্তি পায়নি।

তবু আর্ত খুঁজে গেছে। সেখানেই সে শিল্পী, সেখানে সে বড় মাপের মানুষও। এই সংকলনে গ্রন্থিত পাঠকদের সতর্ক করে দিয়ে বলি, কোনও জলাশয় বা নদীর স্রোত আশা করবেন না যেন। প্রায় সবটাই হবে মরু-চারণা, আমাদের জীবন-চারণা, সেই সত্যের দাহে কোনোখানে এতটুকু মরূদ্যানের স্নিগ্ধ আশ্বাসও মেলা কঠিন।

মরূদ্যান পেতে হলে আমাদের সঙ্গী হতে হবে লেখকের—কেননা নিঃসন্দেহে জানি, সে যতই জলুক আর যতই জ্বালাক, বরাবর, বার বার নির্গত হয়েছে একটু স্নিগ্ধ শ্রী, একটু জলের সন্ধানে। বিশেষ করে শেষের দিকে।

শান্তিরঞ্জনের একেবারে শেষ-জীবনের ছবির সঙ্গে প্রথম জীবনের ছবি—আশ্চর্য, কোথায় যেন মিলে গেছে। একটি বৃত্ত এই ভাবেই সম্পূর্ণ হয়, অনেক ছবি মিলে যায়। আমার মনে প্রথম যে-ছবিটা এখনও লেখা, সেটি সুপুরুষ, সুঠাম ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু আরও কী কী সব ধ্রুপদী শব্দ আছে না? চেহারাটা সব মিলিয়ে। বলা বাহুল্য, একদম পছন্দ করতে পারলাম না। দেখতে-ভালো মেয়েরা আমার বুকে ধক করে ধাক্কা দেয় চিরকাল, কিন্তু দেখতে-ভালো ছেলেরা মুখে চালায় ঘুসি। সইতে পারি না, জ্বলে পুড়ে মরি। রবীন্দ্রনাথকে রেহাই দিন, আমি এখন আমাদের কথাই বলছি। সেইদিনই সাব্যস্ত করি, এর সঙ্গে আমার মিল-মিশ কক্ষনো হবে না। তখনকার আলাপ হাঁ-হুঁ দিয়ে ঠেকা দেওয়ার মতো, তার বেশি আর কিচ্ছু না।

এর পরে আমাদের কাছাকাছি এনে দেয় অভিবাদন পত্রিকার যুগ এবং পূর্বাশা। তখন দেখি, আরে, ওর চুল যে একদম পাতলা হয়ে এসেছে, যাক আর হিংসে নেই। বুকের ছাতি অবিশ্যি সবিশেষ চওড়া, তবে আমরা তখন পুরুষদের বুকের মাপ নিতাম না তো! চরিত্রের রঙও দেখতাম না। বড়ো জোর চোখ কুঁচকে পরখ করতাম, কার গায়ের রঙ কতটা উজ্জ্বল। সেই সময়ই পালা করে বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি খানাপিনার শুরু আর তখনই হঠাৎ আবিষ্কার করি সর্বনাশ, শান্তি যে আমাকে খুব

ভালবাসে দেখছি। প্রতিদান দিতে দেরি করিনি। ওটা আমি দিব্য পারি, কেউ ভালোবাসলেই তাকেও অম্লান ভালোবাসি বলে ফেলি।

এই টানা-পোড়েনে, আকর্ষণে-বিকর্ষণে বছরের পর বছর কাটছিল। আমরা দুজন প্রায় দুই কাননের পাখি। হলেই বা দুই কাননের, তবু পাখি তো! ওড়াউড়ি একই আকাশে। দুটি মেরুও কখনও কখনও একটি চুম্বক-দণ্ডে পরস্পর আবদ্ধ থাকে। আদিতে একই জীবন ছিল আমাদের, গল্পের উপাদান এক, কিন্তু আমি ধীরে ধীরে পুরানো চেনা প্রকরণ-উপকরণ ছেড়ে অচেনা নির্বস্তুক অন্তর্লোকে পাড়ি দিতে চেয়েছি। সে কিন্তু বিশ্বস্ত থেকেছে তার সেই বাঁধা জানা জীবনে। বস্তুতান্ত্রিক শান্তিরঞ্জন একই সঙ্গে বাস্তবনিষ্ঠ এবং তান্ত্রিকও। প্রায়শ ভয়াল, কখনও হাড়ে হাড়ে ঠকঠকি লাগিয়ে দেয়।

এটা অবশ্য আমার ধারণা। ধরে নিয়েছিলাম যে, যে-বিশ্বাসে সে স্থিত, যে অঙ্গীকারে বন্ধ, সেই বিশ্বাস, সেই শপথ তাকে স্থিতি দিয়েছে —একটি নিবিড় নীড়। সেই ধারণাও টাল খায় হঠাৎ বছর সাতেক আগে, সে যখন তারই মতো ঢঙে সটান চলে যায়। লেখাগুলো ছিল, লেখাগুলো আছে।

কন্যার প্রযত্নে আর নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে সতত উৎগ্রীব এমন এক আত্মীয়ের উৎসাহে নতুন সাজে সংকলিত হচ্ছে।

এই পর্যন্ত একটানা লিখে একটু দম নিচ্ছি আর ভাবছি, এবার কী, কী লিখি? ওই যে গোড়াতেই বলেছি, ভূমিকা, দূর! এভাবে ভূমিকা লেখা যায় নাকি? সে থাকলে এতটুকুও লিখতে দিত না, কাগজগুলো কেড়েকুড়ে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে হো হো করে হাসত। এখনও যেন এই আধো অন্ধকার ঘরে টের পাই সে আছে, এসেছে, দেখছে। ঘাড়ের উপরে তার ঘন নিশ্বাস। স্বভাবসিদ্ধ শ-কার ব-কার মিলিয়ে বলছে, আমার বই? তার আবার ভূমিকা? যা-যা। ফেলে দে, ফেলে দে। আমার স্বকাল আর সমাজ আমাকে কোনও ভূমিকা দিয়েছিল কি? অথচ আমি কিন্তু সেই কাল আর সমাজকে তার প্রাপ্য ভূমি দিতে কসুর করিনি।

অথবা এটা আমারই ভুল—অতিপ্রাকৃত অপ্রকৃত অনুভূতি। যে-ভুবন ছিল তার ভিতরে, তাকে সে এখন এই ক্ষণে, কে জানে ঢাকনা খুলে হয়তো দেখাতেও পারে। সেই পৃথিবী রূঢ়, রুক্ষ, ধুলোয় ময়লা নয়, সেখানে নদীর ছলচ্ছল শব্দ কেবল। হয়তো মাথা নুইয়ে শান্তি বলবে, আমাকে আর নীল কস্তুরী আভার চাঁদের লোভ দেখানো কেন? আর আমার লেখা? গভীর অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদে ওদের আত্মা কত দিন লালিত? সময়-গ্রন্থির প্রয়োজন নেই, স্মৃতিরও না, ওদের ঘুমোতে দে, জাগাতে চাইছিস কেন?

বলা তো যায় না, শান্তি হয়তো এত দিনে শান্ত হয়ে গেছে।

—সন্তোষকুমার ঘোষ

বেঁচে থাকা, তাঁরই

১.

এক গ্রীষ্মের মধ্যরাতে যিনি অন্তিম দরজাটি পার হলেন অনায়াসে, এবং পিছনের পাল্লাটি শান্ত-সংযত আঙুলের টানে বন্ধ করতে ভুললেন না। গণিত হীন, নিরাকার অন্ধকারে ছিলেন যিনি নিরালম্ব, ঋজু এক সরলরেখা। আকাশের নীল লয়, নক্ষত্রে কীর্ন ষড়যন্ত্র, দু'পাশের দিগন্তে মেলে দেওয়া উড়ন্ত ডানা, সে'মুহূর্তে গতি স্তব্ধ হলো। আকস্মিক, পূর্বাভাসহীন। ১১ই জুলাই ১৯৯৯। 'সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়' এ'ভাবেই প্রথানুগ ঘোষিত হলো তাঁর মৃত্যু-সংবাদ। পাপের কালি মেখে ঝাঁপ দিলো সারবন্দী সীসের করুণা, সাদা নিরপরাধ নিউজপ্রিন্টে প্রচারিত মুদ্রণ মহিমার, শহরের দৈনিকে, প্রথম পাতায় পরাজিত অবিচুয়ারি।

> 'ইচ্ছে করলেই যে সবিশেষ হতে পারত, সে যেন একরোখা জেদে, কিছুটা বা অভিমানে শুধু 'জনৈক' হয়ে থাকাই পছন্দ করল। একটু আপস করল না, তার লেখাকে এতটুকু রাংতা পরাল না।'[১]

আমরা 'সবিশেষ' বলতে ফ্রেমে বাঁধানো পরিমিতি, স্থির চিত্রের একরঙা, নিঃসাড় চরিত্র বুঝি। প্রশংসার রজনীগন্ধা মালা, শ্রদ্ধায় এলাইত ধূপ; দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা জনপ্রিয়তা, নৈতিকতার গজফিতেয় মাপা জীবনযাপন। কিন্তু শান্তিরঞ্জন ছিলেন না চরিত্র, তিনি ব্যক্তিত্ব—যা'স্পন্দিত, জৈব তাঁকে একজন মানুষ বলা চলে না। তাই তাঁর প্রাপ্য 'জনৈক'-আখ্যাটি অতীব ঠিক ও নিরাপদ। তিনি আজো সময়াতীতে আছেন, এবং শারীরিক উপস্থিতিও ছিলো পরস্পর বিরোধী, সংঘাতময় কয়েকটি মানুষের আশ্চর্য সহাবস্থান। যেন, শীতল আগুন কিংবা উত্তপ্ত বরফ। নিরহংকার স্পর্ধিত। বন্ধুত্বময় একাকী। সাংসারিক সন্ন্যাসী। এই বৈপরীত্যের আলো-আঁধারে, প্রত্যেকটি পৃথক ভেতরের জন পরস্পরের দিকে রাগী চোখে চেয়েছিলো, সারাজীবন কিংবা সব বুঝে মৃদু হাসাহাসি চলেছিলো হয়তো। যেমন, তাঁর মেয়ে বাবার লেখায় মনোযোগী হতে পারেন না। ভাবেন, 'এ'তো অচেনা অন্যকোনো মানুষ!' যেমন, প্রতিবেশীদের সাহিত্য-না-ছোঁয়া মন্তব্যে, 'সাতেপাঁচে থাকতেন না… ভদ্রলোক খুব খেতে ভালবাসতেন।' যেমন, যশস্বী তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে একজনের উজ্জ্বল স্মৃতিচারণে, তিনি ছিলেন, 'দেবশিশু' 'যাদের বয়স কখনো

বাড়ে না। কিংবা বয়স বাড়লেও যাদের হাসিটি সর্বদা অম্লান থাকে।' সুতরাং, সৃষ্টিশীল ভাবে নিশ্চিত 'স্ববিরোধী' ছিলেন, এবং 'স্বজনবিরোধী' হওয়ার সুযোগ পাননি ; কেননা, প্রকৃত অর্থে তাঁর কোনো 'স্বজন' ছিলো না। কি স্বয়ংসম্পূর্ণ অসহায়তা !

নোনাধরা দেয়ালে ঝোলে জীর্ণ-হলুদ দিনলিপি। উজান বিরুদ্ধে বয়ে আসা হাওয়া, সন তারিখের নিষ্প্রাণ মাথানত পশ্চাতধাবন। ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২০-তে জন্ম, অধুনা বাংলাদেশের বগড়ায়। শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ননীবালা দেবীর প্রথম সন্তান। পুলিশে চাকরিরত বাবার বদলির জন্য অগুণতি বিদ্যালয় পেরিয়ে, অবশেষে হাওড়া বি কে. পাল ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক। স্নাতক উত্তীর্ণ হন, কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, শিক্ষকদের অভিমতে 'অন্যায় আচরণের' কারণে বিতাড়িত হন। তারপর, দ্বিতীয় চিন্তা ছাড়াই এগিয়েছেন সামনের দিকে, কখনো পেছনের দিকে ফিরে তাকান নি। জীবনধারনের জন্য বিভিন্ন পেশার বিচিত্র, সুদীর্ঘ এক তালিকা অতিক্রমণ—১৬নং বেংগল ব্যাটেলিয়ন ও ৭৬ জি. পি টি কোম্পানীতে সৈনিকবৃত্তি ; লিভার ব্রাদার্স ও পোর্ট কমিশনার্সে মসীজীবি ; 'সওগাত' 'দেশের কথা', 'শিশু সওগাত', পরে 'স্বরাজ', পশ্চিমবঙ্গ'—আবার 'স্বরাজ'— এবং 'সত্যযুগ', এইসব পত্রিকায় সাংবাদিকতা ; স্বরাজ-কালীন তিনি স্বল্পকাল চলচ্চিত্রের সহ-পরিচালক ; অবশেষে ১৯৫৩ সনে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র বিজ্ঞাপন বিভাগে এসে পৌঁছান, ও পরে সংবাদ বিভাগে। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকায় ছিলেন, সহসম্পাদক পদে। এই শ্বাসরুদ্ধ দৌড়ের অবসরেই তিনি, ১৯৪৫-এ বিমলপ্রতিভা নন্দীকে ভালোবেসে ও জাতকুলের কাঁটাতার তুড়ি দিয়ে অনুষ্ঠানহীন কাগজকলমে সারাজীবনের সঙ্গিনীরূপে অর্জন করলেন।

> 'সাংবাদিকতা আমার জীবিকা, আর সাহিত্য আমার জীবনধারণের প্রায়শ্চিত্ত। আমার অনেক সাংবাদিক বন্ধু নিজেদের সাংবাদিক বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। তৃপ্তিও পান। আমার মনে হয়, বেশ্যাদের সঙ্গে সাংবাদিকদের মূলগত পার্থক্য একটি মাত্র—তা'হলো, বেশ্যারা তাদের পেশার গর্ব করে না, আমরা, সাংবাদিকরা করি।'[8]

বাংলা ভাষার অন্যতম দৈনিকে ষোল বছর কাটানো-র পর, মৃত্যুর তিন বছর আগে কেন এই স্বীকারোক্তি ? অববাহিকামগ্ন মোহনায় জেগে ওঠা উদ্ধত চর, কোথায় উৎস প্রস্রবণের ধারায় ? এ'কি আত্মধিক্কার ! নাকি সম্ভাবনাহীন নির্মেঘ আকাশ জুড়ে ক্ষণিক বিদ্যুত-চমক ? সমাধানের কোন সরল সমীকরণে না গিয়ে, বলা যায় না পেশা তাঁর ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করতে পারে নি ? কিছু নিজস্ব মুহূর্ত

ছিলো গোপন সঞ্চয়ে, অনন্ত টানাপোড়েনের ভারসাম্যে তিনি ছিলেন স্থিত, সহ্যশীল। 'অশান্ত শান্তি' ছিলেন তিনি অংশত, অন্যত্র ছিলো পায়ের নীচে স্বোপার্জিত মাটি। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য স্বামী, দায়িত্বশীল বাবা। প্রায়দিনই সকালে যেতেন সব্জি-মাছ কিনতে; তাঁর 'রাণু'-নামে একটি প্রিয় কুকুর ছিলো; প্রতিবেশী শিশুকে বিস্কুট খাওয়াতেন বা বালকদের দিতেন গল্পের বই। আবার, পান্থশালা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। শিকড়ছিন্ন ভেসে যাওয়া। কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়ে নেমে গেছে জ্বালাধরানো তরল। বারদুয়ারীতে, খালাসীটোলায়—তিনি অনিকেত। মস্তিকের কোষে, স্নায়ুতে উদ্দাম বেজেছে গান। একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্যে, উড়ে গেছে সংস্কার, নীতির জগদ্দল পাহাড়। তিনি তাঁর অনুজ লেখকদের কাছাকাছি চলে গেছেন। তাদের 'শান্তিদা' হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

২.

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর সাতটা বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে তাঁর কোনো বই পুনর্মুদ্রিত হয় নি; অগ্রন্থিত হয়ে পড়ে আছে অজস্র গল্প, উপন্যাসও দু'টি। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা, মূল্যায়ন তাঁর সাহিত্যের, যতদূর জ্ঞাত, হয়নি। তাঁর কোনো বই প্রাপ্তব্য নেই। এমনকি জীবৎ কালীনও ছিলো না—তারশেষ বই, 'সুসমাচার' বের হয়েছিলো ১৯৬৪তে ও ২য় সংস্করণ ১৯৬৬। মৃত্যুর ঠিক পরে, বাঁধভাঙা কিছু ভিজে-স্বর স্মৃতিচারণ, কিন্তু প্রত্যেকেই এড়িয়ে গেছেন তাঁর সাহিত্যকে। কেন ? কেন ?

> 'আমাদের দশদিক ঘিরে যখন ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী বুদ্ধিজীবিদের হল্লা, সাহিত্যকে নিয়ে জুয়াখেলা, এবং বাজারী ফাটকাবাজদের তেজী মন্দার চীৎকার; তখন শান্তি ঐ বাজারের কেন্দ্রস্থলে থেকেও সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন।'[৬]

শান্তিরঞ্জন সাহিত্যের লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন, একটি কবিতার বই, 'চন্দ্রসূর্য'-র আশাবাদী তারুণ্য ছড়িয়ে, সেই ১৯৪৩-এ। পরের বছর, তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'রাত্রির আকাশে সূর্য' প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ সাল থেকে চার বছর নিয়মিত বের হয়েছে তাঁর সম্পাদনায় 'অভিবাদন' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা—যা'র লেখকেরা পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ও দেশভাগের পটভূমিকায় লেখা গল্পগুলি, 'রাম রহিম'—এই অর্থময় নামের একটি বই হয়ে প্রকাশিত হয়ে ছিলো, ১৯৫২-তে। এই 'গ্রন্থের সব ক'টি গল্পই অসামাজিকনীতি ও ঘৃণ্য সমাজ-বিস্ফোটকের ওপর বোধবুদ্ধির অস্ত্রোপচারের কাহিনী'।[৭] '৫০ থেকে '৬০ দশ বছরে তিনি অনুবাদ করেছেন, স্টীফেন জাইগের ৭টি, গী দ্য মপাসাঁর ১টি ও অরস্কিন কল্ডওয়েলের ১টি, বইসমূহ। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থটি ভারতের প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের ওপর অন্যতম প্রথম এবং 'দুঃসাহসিক হলেও অভিনন্দন যোগ্য।'[৮] তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'তিমিরাভিসার' আত্মজৈবনিক; তাই মূল চরিত্র লোকনাথ লেখকেরই প্রতিরূপ. যে সমাজ-সংস্কারকে মোহহীন দৃষ্টিপাতে, নগ্নরূপে চিনতে চেয়েছে; চেনাতে চেয়েছে পাঠকদেরও। কিংবা '৬১-র উপন্যাস 'এসো নীপবনে'-তে অতি পরিচিত ত্রিভুজ, তিনটি চরিত্র ফর্মুলাকেই সম্পূর্ণ আলাদাভাবে প্রয়োগ করেছেন। ব্যক্তিসত্তার নৈরাশ্য ও ক্লান্তি এবং সামাজিক নীতির সংগে দ্বন্দ্বে উন্মুক্ত হয়েছে মূল চরিত্র-ত্রয়। তিনটি পর্বে বিভক্ত লেখাটিতে, 'এক একটি অনুসংগে স্মৃতিচারণা করে, কখনো অতীত ঘটনাকে আগে কখনো বা বর্তমান ঘটনাকে পরে সাজিয়ে ঘটনার গতি দ্রুত ও নিরবিচ্ছিন্ন রেখেছেন।'[৯] শান্তিরঞ্জনের ৯টি গল্পগ্রন্থ, ৪টি উপন্যাস, ১টি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ৯টি অনুবাদ গ্রন্থ—এই বিস্তৃত, দুরূহ অরণ্যের মধ্যে কিভাবে চিহ্নিত করা যায় প্রত্যেকটি বৃক্ষকে? যেমন, 'প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি' যদি তাঁর মানচিত্রে গভীরতম প্রদেশ হয়, সেখানেও পাবো, অন্ধকারময় হতাশায়, সরু ছিদ্র দিয়ে নেমে আসা তির্যক ব্যংগের রৌদ্ররেখা।

> 'সবই ভগবানের -'
> 'হাত!'
> ভগবান? পেটে শশধরের আমাশার পাক দিয়ে ওঠে ভগবানের ভরসায় থেকে কচুপোড়া হয়েছে বলে। ভগবানের কাছে নালিশ জানিয়ে আর্জি পেশিয়ে কাঁচকলা মিলেছে বলে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছর-বছর ভগবানের শিষ্য-সামন্তদের নাজেহাল অবস্থা সচক্ষে দেখেছে বলে।'[১০]

শান্তিরঞ্জন কি আশ্চর্যজনক ভাবে সারাজীবন সমাজের নীচের ধাপের সুখ-দুঃখ, ভণ্ডামী অসহায়তা. জেহাদ-বশ্যতা নিয়ে লিখে গেলেন। তাঁর সৈনিক জীবনের প্রভাব, স্থায়ী ছাপ ফেলেনি তার মানসিকতায় ('হে সৈনিক'-নামে উপন্যাসটি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে) কিংবা তাঁর যৌবনারম্ভের প্রেমও তাঁকে একবারো শিথিল, নম্র, আবেগার্ত করে তোলেনি। (অপ্রকাশিত উপন্যাস '২৭শে এপ্রিল ১৯৪৯' কি প্রেমবিষয়ক হতে পারতো?)। এমনকি, কথা বলার, বক্তব্য জানানোর

ভঙ্গিটিও ছিলো রূঢ়, উচ্চস্বরে—ছোট্ট ছোট্ট বাক্যবন্ধের চোরাগোপ্তা চালানো। কি অশৈল্পিক তাঁর বিশুদ্ধ অমার্জনা! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবের কথা তিনি নিজের স্বীকরোক্তিতে নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন এবং ফারাকটুকু তাঁরই চোখে পড়েছে—মানিকবাবু যেখানে আশাবাদী, তিনি নিরাশাবাদী। জেগেঘুমোনো, দুধেভাত বাঙালী পাঠকদের কাছে তাঁর অনাদর তাই; যদি তার 'রচনার একমাত্র অভিধা হতে পারে প্রতিবাদের সাহিত্য'[১১] তাহলে সেই প্রতিবাদ, তার শরীর থেকে প্রতিধ্বনির আভরণ খুলে ফেলে, কি ক্ষণকালে হারিয়ে গেলো! তিনি তো জনপ্রিয়তা, প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর লোভে, কখনো কাঠের পায়ে দাঁড়াতে চাননি। জীবিত শান্তিরঞ্জনের কোনো লেখাই ছাপা হয়নি, তাঁরই ইচ্ছায়, প্রাতিষ্ঠানিক সাময়িক পত্রে—যেখানে তিনি যুক্ত ছিলেন সুদীর্ঘ আঠারো বছর! আদর্শের প্রতি, বিশ্বাসের প্রতি তিনি কটাক্ষ করেছেন; কবিতাকে আক্রমণ করেছেন 'জোচ্চুরি' বলে এবং গদ্যময় পাথুরে জমিতে কি গ্রাম্য এক সারল্যে ঠেলেছেন হাল। শস্য কি ছিলো তাঁর স্বপ্নে? তবে কেন অন্ধকার দুঃস্বপ্ন ছড়িয়ে আছে, অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা তীব্র বিষাদ? অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে ব্যক্তিসত্বার 'মানুষ'টা কি আষ্টেপৃষ্ঠে হাত-পা বাঁধা এবং ভেতরে 'জানোয়ারটা' কতো স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, বারংবার। অথচ তাঁর পতাকা ছিলোনা হাতে, ছিলোনা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কোনো মতবাদের প্রতি আসক্তি। নিরস্ত্র একা, বধ্যভূমির নিয়তির দিকে মাথা উঁচু হেঁটে গেলেন করুণ সূর্যাস্তে। উত্তরাধিকারে দিয়ে গেলেন, সাদাদেয়ালে লেখা এলোমেলো হস্তলিপিতে—'সবারে আমি ক্ষমি' এই রক্তিম এপিটাফ; আর পড়ে রইলো, অপ্রয়োজনীয় অলংকার যা ছিলো তার কাছে, ঐ চশমাটি। আজো পড়ে রয়েছে।

—সিদ্ধার্থ বসু

সংকলিত গল্প

প্রথম খণ্ড

সওয়াল

কাল যে সওয়ারি বইত আজ সে নিজেই সওয়ার ! চার-চারটে মানুষের কাঁধে ! পিছনে আবার মিছিল !

বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নার বদলে হঠাৎ গলা চিরে ছেলেকে ডাকতে ডাকতে দুহাতে যামিনী বুক চাপড়ানো শুরু করে দেয়। তাকে সামলাতে গিয়ে তার শামিল হয় ভূষণের বউ, কুমির মা।

অ্যাও ! বাবুদের কাঁধে চড়ে মিছিল করে ব্যাটা আসছে, দেখেশুনে বুক কোথায় ঢাই হয়ে উঠবে, তার বদলে বুক-চাপড়ানো ! কান্না কিসের ? বলি কান্না কিসের ?

গুরুপদর ধমকের চোটে যামিনীর গলা চড়ে।

দেখছেন আজ্ঞে, দেখছেন ! অ্যাই, থামলি !

হাত ধরে সীতেশ ডাকে, গুরুপদ !

থামলি মাগী !

গুরুপদদা ! মণ্টু ধরে আরেকটি হাত।

এমন নেই-আক্কেল মেয়েছেলের—

বোসো গুরুপদ।

বোসো গুরুপদদা, বোসো।

দুপাশ থেকে দুজনে টেনে বসিয়ে দেয়।

হুম ! বসবে তো বটেই। ঘর থেকেই জলচৌকিটা এনে বরং বসা দরকার। কামিজ-পিরান চড়িয়ে বসা দরকার। লখাইয়ের মাকে পাশে নিয়ে গ্যাট হয়ে বসা দরকার।

ব্যাটাকে কাঁধে করে বাবুরা আসছে—সভ্যভব্য হয়ে থাকতে হয় না ? নইলে ব্যাটাই বা কী ভাববে !

কিন্তু দ্যাখো ওই মাগীকে ! বুকটা একেবারে উদোম !

কাপড়ে টান পড়েছে ? গামছা নিয়ে আয়। গামছা নেই ? ঘরে গিয়ে সেঁধো। তা নয়—

বলি তোর হায়াফায়া নেই র‍্যা ? অ্যাই—অ্যাই লখাইয়ের মা !

গুরুপদ !

গুরুপদদা !

আপনেরাই বিবেচনা করুন আজ্ঞে—

তুমি পুরুষমানুষ—তুমি ব্যাটাছেলে—

বটেই তো ! বটেই তো ! মাথা ঝাঁকিয়ে গুরুপদ জোরালো সায় দেয় ।

লখাইয়ের মা যাই করুক, তুমি কেন—

সায়-দেওয়া চালিয়ে যায় । মেয়েছেলে অবুঝনাবুঝ । দুনিয়ার হালচাল বোঝে কচু । মেয়েছেলের পোঁ ধরে চললে ব্যাটাছেলে আর ব্যাটাছেলে থাকে ? ভগবান কি সাধেই—

ওকি ! ওকি ! মাথা-ঝাঁকানো মুলতুবি রেখে আচমকা গুরুপদ উঠে দাঁড়ায় । ওনারা ওদিক পানে কোথায়—অ মণ্টুবাবু ?

ঘুরে আসছে গুরুপদদা ।

—অ দাদাবাবু ?

রাস্তা দিয়ে ঘুরে আসছে গুরুপদ ।

সামনে এসে আড়াল হয়ে গেল ! চোখের নাগালে এসে !

তা নাক-বরাবর চলে আসা বাবুদের পক্ষে মুশকিল বইকি । ঝোপঝাড় ভেঙে ডোবার পাশ দিয়ে চলে আসা ।

লখাই কিন্তু আসত । দু-দুবার হেলের কামড় খেয়েও গুগলিতে পা কেটেও আসত । মাঝরাত্তির হলেও আসত ।

রাস্তা দিয়ে এলে ঘুরপথ হয় না ? কতখানি বাড়তি হাঁটা ! দিনভর সওয়ারি বয়ে হল্লাক শরীর রাজি হবে কেন বাড়তি মেহনতে ।

আজ অবিশ্যি মেহনত নেই । তায় ওই মিছিল ! ডোবার পাশ দিয়ে আসা মানায়, না, পারে আসতে ?

থেকে থেকে চিল্যে উঠছে কেন ? অ মণ্টুবাবা, চিল্যে উঠছে কেন ?

জিন্দাবাদ দিচ্ছে !

—অ দাদাবাবু ?

বলছে লখাই দাস জিন্দাবাদ—মানে জিতা রহ—মানে বেঁচে থাকো—মানে—

আচ্ছা! মুখের চামড়ায় অগুনতি ভাঁজ পড়ে। পুরনো মারবেলের মত দুই চোখের মণি ঠেলে বেরোয়। যামিনীর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। শোন মাগী, শোন! আর তুই এখনতক হাতপা ছইড়ে! জল রেখেছিস? বলি জল তুলে রেখেছিস? এসেই তো ব্যাটা ঢকঢকিয়ে একঘটি সাবড়াবে। না পেলে কুরুক্ষেত্তর—

গুরুপদ!

বলে বলে আর পারি নি দাদাবাবু! ব্যাটার মোট্টে যত্নআত্তি করে না। একটুন চা খেয়ে কোন্ ভোরে বেইরেছে—দুধ-চিনি-ছাড়া একটুন চা খেয়ে —একখান বাসি রুটি অব্দি—

ফিশফিশ করে মণ্টু ডাকে, সীতেশদা?

উঁ।

এখনও—

হুঁ! দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সীতেশ বলে, একেই মাথার গোলমাল তায় একমাত্র ছেলে!

কিন্তু—

হুঁশিয়ার! হঠাৎ কিছু না করে বসে— খুব হুঁশিয়ার!

রেতে, জানলে মণ্টুবাবা, রেতে মাগী আমাকে আগেভাগে খাইয়ে দিল। তা খাওয়া। সোয়ামিকে খাওয়াবি খাওয়া। কিন্তুক ব্যাটার তরে রেখেঢেকে—

রেখেঢেকে! কান্না থামিয়ে যামিনী ক'কিয়ে ওঠে। নিজেই চেয়ে চেয়ে—

শুনছেন! শুনছেন দাদাবাবু? শুনলে মণ্টুবাবা—শুনলে? বলি আমি চাইলেই তুই দিবি? যদি বেম্ভোণ্ড চাই, দিবি? গগনের চাঁদ, চাই, দিবি?

জবাব না দিয়ে যামিনী ফের ফোঁপানো শুরু করে।

বলি খিদে পেলেই খেতে হবে? পেট না-ভরা অব্দি খেতে হবে? কেন তুই খেতে ডেকেছিলিস? বল, কেন তুই—

ডেকেছেল! নিজেই সনঝে থেকে ঘ্যানর ঘ্যানর করে—

আমি কচি খোকা যে ঘ্যানর ঘ্যানর করলেই—

এটা ভাঙে ওটা ছড়ায়—

চোপ ! মুখে মুখে তকরার ! চোপ ! চোপ !

গুরুপদ !

গুরুপদদা !

আপনেরাই বলুন আজ্ঞে -- খিদের চোটে খেতে চেইছি—দোষ করিছি ? মানুষ যদি খিদের চোটে দিশে হারায়—অপরাধ হয় ? অ মণ্টুবাবা—হয় ?

মণ্টু ডোবার দিকে তাকায়।

খিদের চোটে মানুষের হুঁশহাঁশ থাকে দাদাবাবু ?

অপলক সীতেশ আকাশ দেখে।

কিন্তুক খিদেকে ও নাই দিল কেন ? ব্যাটাকে বঞ্চিত করে ওই মাগী কেন—

গুরুপদ গজগজ করে। মেয়েছেলে কি আর গাছে ফলে ! বুড়ো হয়ে মরার দাখিল এখনও আক্কেল হল না বিবেচনা হল না ? পেটের ছেলে, পাঁচটা মরেহেজে গিয়ে একটা ছেলে, যার দৌলতে বেঁচেবর্তে আছে —তার কথাটা মনে পড়ল না ? একখানা নয় দুখানা নয়—ছ-ছখানা রুটি তাকে গিলিয়ে দিল ? ব্যাটার কথা না ভেবে ছ-খানা রুটি— ছ-ছখানা রুটি—ছ-ছখানা—

ওই দ্যাখো গুরুপদ !

ওরা এসে গেছে গুরুপদদা।

না না, তোমায় যেতে হবে না। ওরাই এখানে আসবে।

দোমড়ানো শরীরটা গুরুপদ প্রাণপণে সিধে করে দাঁড়ায়। দু-পাশে নেতিয়ে-পড়া দুই হাত তার থরথর করে :

মিছিল এগিয়ে আসে।

আর জিতা রহ বলছেছি মণ্টুবাবা ?

মনে মনে বলছে গুরপদদা। মনে মনে—

মনে মনে কেন মণ্টুবাবা মনে মনে কেন ? চেঁচ্যে চেঁচ্যে—

বলবে। চেঁচিয়েও বলবে। চাপাস্বরে মণ্টু শুধায় শ্লোগান দেব সীতেশদা ?

চোখ টিপে সীতেশ মানা করে।

মিছিল থমকে দাঁড়ায় ফণিমনসার ঝোপের পাশে। খাটিয়া-কাঁধে চারজন গুটি গুটি এগিয়ে আসে। পিছনে জনাকয়েক।

দু-চোখ কাটিয়ে গুরুপদ দেখে। লখাইকে কাঁধে নিয়েছে রায়বাবুর নাতি গণেশ, ইয়াকুবের ভাগনে হানিফ, নিমু মুখুজ্জের ভাই হারু, দক্ষিণপাড়ার সুবল মান্না? কী কাণ্ড!

মানুষগুলো একেবারে ঘেমেনেয়ে গেছে! কাঁধে কাছে ফালাফালা সুবল মান্নার জামা! কী কাণ্ড!

হানফে না হয় লখাইয়ের দোস্তবন্ধু। দুজনেই সরকারের রিকশা টানে কিন্তু বাকি তিনটে বাবু ভদ্রলোক—

লখাই দাস—জিন্দাবাদ! লখাই দাস—জিন্দাবাদ! লখাই দাস—জিন্দাবাদ!

হাজার গলার আকাশ-ফাটানো হঠাৎ-আওয়াজে আচমকা হকচকিয়ে গেলেও ওরা থামামাত্র গুরুপদ চেঁচিয়ে ওঠে, লখাইব্যাটা—জিতা রহ। লখাইব্যাটা—লখাইব্যাটা—

এবার হকচকানোর পালা আর-সকলের!

সীতেশদা?

!

গণেশরা মুখচাওয়াচাওয়ি করে। ফণিমনসার ঝোপের পাশে জমায়েতটা ছটফটিয়ে ওঠে।

সীতেশ?

গুরুপদকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজের মাথায় সীতেশ টোকা দেয়।

লখাইব্যাটা—অ মণ্টুবাবা, জিতা রহ বলছনি কেন? বলো বলো—লখাই দাস—অ মণ্টুবাবা—

এবার যাই সীতেশদা! আর আমি পারছি না! সবাই এসে গেছে, এবার আমি—। বলতে বলতে ঠোঁট কামড়ে মণ্টু কয়েক পা পিছু হটে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই ডোবার দিকে দৌড় দেয়।

মণ্টুবাবা! মণ্টুবাবা! অ দাদাবাবু, মণ্টুবাবা কেন—

ও কিছু না গুরুপদ!

কিছু না? কাঁদো কাঁদো গলায় কিছু না? তার দিকে চেয়ে সবাই

গুজগুজ করছে—কিছু না? লখইয়ের মা আথালিপাথালি লাগিয়েছে, কুমির মারা কেঁদে সারা হচ্ছে—তবু কিছু না?

চারপাশে তাকিয়ে গুরুপদর কেমন কেমন লাগে। দাদাবাবু?

এসো। ছেলেকে দ্যাখো।

সবুই ভাম মেরে গেল দাদাবাবু?

ওই দ্যাখ্যো, হাত ধরে সীতেশ তাকে খাটিয়ার কাছে নিয়ে যায়, তোমার লখাই।

গলা অবদি ফুলে ঢাকা। দুই চোখ বোজা। ধবধবে বিছানায় ব্যাটা তোফা ঘুমোচ্ছে। লখাই! অ্যাই লখাই!

বাপের ডাকে লখাই সাড়া দেয় না।

ওঠ না! অবেলায় ঘুমোয়!

ওঠা দূরে থাক, খাটিয়া ধরে বাপ নাড়া দিলেও ব্যাটা নট নড়নচড়ন।

অ্যাই! উঠলি!

গুরু!

তুমি জানোনি গণেশবাবু, অবেলায় ঘুমুলে ব্যাটাছেলের তাগদ মিইয়ে যায়। ওঠ বাপ—ওঠ।

চাচা!

গুরুপদ!

গুরুপদদা!

কারো কথায় কান না দিয়ে লখাইকে ওঠার জন্যে গুরুপদ হরদম তাড়া দিয়ে চলে। উঠে পড় বাপ উঠে পড়। বাবুর বিছানাপত্তর ফিরো নে যাবে না? উঠে পড়।

গণেশ বলে, না নিয়ে এলেই হত দেখছি।

সুবল বলে, আমি গোড়াতেই মানা করেছিলাম।

হারু বলে, অথচ দুদিন আগেও আমার সঙ্গে দিব্যি—

হানিফ বলে, পাগল তো নয় বাব্বু, মাথার গোলমাল। বুনো কচুঘেঁচু খেয়ে হয়েছে। মোর দাদীটু তো টেঁসেই গেল!

ছেলের কপালে গুরুপদ হাত বুলোয়। ওঠ বাবা! চুলের গোছা আলতো মুঠোয় ধরে। ওঠ ওঠ!

মহা মুশকিল হল !

আর দেরি করাও ঠিক নয়। বেলা পড়ে আসছে।

মোহিত কাকা, আপনি একবার—

না না না ! ঘাবড়ে গিয়ে মোহিত বলে, ওকে আমি কিছু বলতে-পারব না। তার চেয়ে কাঁধ দিতে বলো—রাজি আছি। সুবল বরং—

ক্ষেপেছেন ! সুবল রুখে ওঠে। কাঁদাকাটির মধ্যে আমি নেই। কান্না ! কোনও মানে হয় ! দাঁতে দাঁত ঘষে ! এখানে না এসে এই মিছিল নিয়ে যদি ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম !

ইবলিসের বাচ্চাগুলোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে—! হানিফ হিসিয়ে ওঠে।

কিছু-একটা করে বসার অকথ্য তাগিদে আকাশে ঘুঁষি পাকিয়ে গণেশ হাঁক পাড়ে, লখাই দাস—

হাজার মানুষ গলা ফাটিয়ে আশীর্বাদ জানায়।

যামিনী হুমড়ি খেয়ে পড়ে খাটিয়ার ওপর। ছেলের মুখটা বুকে চেপে ধরে হিক্কা তোলে। তাকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদে ভুষণের বউ কুমির মা।

মোহিত ফোঁপায়। চোখের জল আটকাতে প্রাণপণে কেশব চোখ রগড়ায়।

গলায়-ফাঁস লাগা দশাসই এক জানোয়ারের মত ফণিমনসার ঝোপের পাশে জমায়েতটা দাপাদাপি করে।

অ্যাঁ ? চারপাশে তাকিয়ে গুরুপদর বেকুব বেকুব লাগে। দাদাবাবু ? অ দাদাবাবু ? দাদাবাবু !

না শোনার ভান করে সতীশ সরে যায় !

গণেশবাবু ?

তোমার ছেলে—তোমার ছেলে—

আমার ব্যাটা লখাই !

হ্যাঁ, তোমার লখাই—তোমার ব্যাটা লখাই আর নেই গুরু !

ভ্যাট ! মাথা ঝাঁকিয়ে গুরুপদ বলে, ওইত। বলে হন হন করে

খাটিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বাবুরা কি বলেরে বাপ! ছেলেকে সাক্ষী মেনে ফিক করে হাসে।

লখাই মরে গেছে গুরুপদ!

ইয়ারকি! মরে অমনি গেলেই হল? বুড়ো বাপ মাকে ফেলে মরে যাবে এমন বেইমান কিনা ব্যাটা তার।

ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে গুরু। বারকয়েক মহড়া দিয়ে চটপট কথাটা বলে ফেলতে যায়, কিন্তু গলা দিয়ে মোহিতের ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বেরোয় শুধু। গুরুপদর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কোঁৎ কোঁৎ ঢোঁক গেলে।

দোস্তকে পুলিশ খুন করেছে চাচা। গুলি করে মোর দোস্তকে—

থাম তুই! গুলি করে খুন করেছে? খুন মাগনা! স্বাধীন দেশে খুন অমনি করলেই হল! দেশে সরকার আছে না?

আসলে মস্করা। গরিবগুর্বো মানুষ পেয়ে বাবুদের মশকরা।

খাটিয়ায় শুইয়ে ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে কাঁধে বয়ে এনে ব্যাটার সাথে মস্করা করছে, ব্যাটা খুন হয়ে গেছে ভড়কি দিয়ে বাপের সাথে করছে। মজা দেখার জন্যে মস্করা করছে।

খেয়াল! বাবুদের খেয়াল!

কিন্তু এ কোন্ দেশী মস্করা? মরা নিয়ে এ কেমনতর মজা দেখা? এ কী বিদঘুট্টি খেয়াল?

তোমার ছেলে খেতে চেয়েছিল বলে—

বাজে বোকোনি—হাটো। লখাইয়ের মা সর, ব্যাটাকে উঠতে দে। লখাই!

লখাই আর উঠবে না ভাই!

ভাই? গুরুপদ থতমত খায়। ফিরে তাকায়। নারায়ণ ঘোষ না? নারায়ণ ঘোষ তাকে ভাই বলছে?

তোমার লখাইকে—

তুই-তোকারির বদলে তুমি?

তোমার লখাইকে ওরা—

নারায়ণ ঘোষের হাতখানা কাঁধে পড়তে গুরুপদ সিঁটিয়ে যায়। ভাই

ডেকেও সাধ মেটে নি বলে কাঁধে হাত রাখল ? এরপর বুকে জড়িয়ে ধরবে ?

হারু বলে, তোমার ছেলে সরকারের কাছে খেতে চেয়েছিল বলে—

রেতে যে কিছু খায় নে গো বাবু ! আহা, কাল রাতে শুধু খায় নি নয়, আজ সকালেও শুধু চা খেয়ে বেরিয়েছে ! দুধ চিনি ছাড়া চা ! ব্যাটা জানত নি বাবু সরকার চাল পাঠ্যে দিয়েছে ?

সরকার চাল পাঠিয়ে দিয়েছে ?

সরকার চাল—?

সরকার—?

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গুরুপদ বলে, তা আপনার গে দুতিন কিলো হবেন আজ্ঞে। মণ্টুবাবারা আসার একটুন আগে হাঁদা দে গেল।

আচ্ছা ! বাজারে নাকেকানে খত দিয়ে এসে—

শ শ মণ গায়েব করে মুষ্টিভিক্ষের খয়রাতি !

লখাইয়ের মাকে সেই ইস্তক বলছি বাবু চালগুনো চাপ্যে দে চাপ্যে দে, তা মাগী কেঁদেই কুল পায় না ! উঠে আয় বাপ। আমি তোকে রেনে খাওয়াব। উঠে আয়. মনে কর মাটা তোর ফৌত হয়ে গেছে, উঠে আয়। ওঠ্ ওঠ্। খাটিয়া ধরে গুরুপদ জোরসে নাড়া দেয়।

জোর করে সরিয়ে নিয়ে যাব সীতেশদা ?

জোর-জবরদস্তির কাজ নয় সুবল।

প্রথমেই যদি বলে দিতে সীতেশ !

বলি নি মোহিতকাকা ! বিশ্বাসই করে না।

সিদিন কদ্দিন ভাত খাই না বলছিলিস। আজ খা,যত্ত পারিস খা। তিন কিলো চালের ভাত একা খা। আমি একগ্রাসও খাবু নি—কালীর দিব্যি ! তোর মাকেও খেতে দেবু নি—শেতলার দিব্যি ! তবে হাঁ তুই খেয়ে যদি বাঁচে—বলতে বলতে গুরুপদ চাদর সরায়। চাদর সরিয়েই আঁতকে ওঠে। ইকি ! ইকি !

বেয়েনটের খোঁচায়—

? ? ?

সঙ্গীনের খোঁচায়—গুলি খেয়ে পড়ে গেলে সঙ্গীনের খোঁচা মেরে মেরে—

কী কান্ড ! এভাবে খোঁচা মারে ! বুকের একেবারে মধ্যিখানে ! কালচে রক্ত ডেলা পাকিয়ে গেছে !

সাধেই ব্যাটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। বাপের ডাকে রা কাড়ছে না সাধে।

কোথায় এখন গ্যাঁদা পাতা পাই বলো দিকি ! এই ঘা যদি গে বিষ্যে যায়—

হারু বলে, ওকে বরং আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই গুরুপদ।

নারাণ ঘোষ বলে, হাসপাতালই ভালো গুরু ভাই। হাসপাতালে—

মোহিত বলে, হাসপাতালে বড় বড় ডাক্তার, মেলা ওষুধবিষুধ।

সে যে দেড় কোশ পথ গো। এতটা পথ কাঁধে করে—

তাতে কি ! আমরা—

আম্মো তবে যাই।

না না, তোমায় যেতে হবে না। তুমি বুড়ো মানুষ—

আমরা আছি কী করতে !

আমরা কাঁধ দেব।

আমরা সবাই—

সব্বাই। সব্বাই।

ফণিমনসার ঝোপের পাশ থেকেও দুদ্দাড় করে কয়েকজন ছুটে আসে।

কাঁধ দেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

দেখ গুরুভাই দেখ। চোখের জলে নারাণ ঘোষের গাল ভাসে। তোমার ছেলেকে কাঁধে তুলে নিতে—। গলা বুজে আসে।

গুরুপদ ঘুরে-ফিরে দেখে লখাইকে বয়ে নিয়ে যেতে সবাই তৈরি। ছেলেবুড়ো সবাই। তবে আর ভাবনা কিসের। দেড় কোশ পথ কেন ভাগাভাগি করে কলকাতা অবদি নিয়ে গেলেও কারো মেহনতটি হবে না।

আমি তবে যাবু নি বলছ ?

কী দরকার। আমরা থাকতে—

নে যাও তালে। গুরুপদ সরে দাঁড়ায়। উঠে আয় লখাইয়ের মা। ব্যাটাকে বাবুরা হাসপাতালে নে যাবে। উঠে আয়।

লখাই দাস—

হাজার মানুষ গলা ফাটিয়ে আশীর্বাদ জানায়।

খাটিয়া হাত-ছাড়া-হতে মাটিতে যামিনী মুখ থুবড়ে পড়ে।

কুমির মা ভুষণের বউ ডুকরে ডুকরে কাঁদে।

মোহিত ফোঁপায়। অনর্গল চোখের জল ঝরায় নারাণ ঘোষ।

কান্না চাপতে গিয়ে সুবল গর্জে ওঠে, লখাই দাস—

বুকফাটা কান্নায় হাজার গলা আশীর্বাদ জানায়।

কী কাণ্ড! কাল যে সওয়ারি বইত আজ সে নিজেই সওয়ার! সারা মুখ গুরুপদর হাসিতে টইটুম্বুর হয়ে ওঠে। কী কাণ্ড!

কিন্তু সন্ধের পর সরকারের বাড়ি থেকে পাঠানো দুজনের ভাত ডাল তরকারি দমভর একা খেয়ে ভরপেটে রাতভর ঘুমিয়ে মাথাটা তার হয়ে যায় এমনই সাফসুফ যে শেষ রাতে যামিনীর বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না মিনিটখানেক শুনেই ছিটকে বেরোয় ঘর ছেকে।

লখাই রে! পাড়া-জাগানিয়া এক হাঁক পেড়ে দাওয়ার খুঁটি জড়িয়ে ধরে।

খুঁটি জড়িয়ে ধরে কাঁদে।

দমাদ্দম দাওয়ায় মাথা ঠুকতে ঠুকতে কাঁদে।

পটাপট বুকের লোম ছিঁড়তে ছিঁড়তে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে কাঁদে।

কাঁদতে কাঁদতে দিশেহারা হয়ে ডোবায় গিয়ে ঝাঁপ দেয়।

সীতেশরা ধরে নিয়ে এলে উঠোনে গড়াগড়ি খায়। চোখের জলে নাকের সিকনিতে মাখামাখি মুখ মাটিতে রগড়ায়। লখাই! লখাই! লখাই রে!

মণ্টু বলে, তোমার এক ছেলে গেছে গুরুপদদা—

ছেলে যে আমার একটাই ছেলোরে বাপ

গণেশ বলে, আমরা তোমার ছেলে।

সুবল বলে, আমরা তোমার লখাই।

হানিফ বলে, আজ থিকে তুমি মোকে লখাই বলে ডেক চাচা। আমি তুমায় বাপ বলব। বাজান!

শুধু গাঁয়ের ছেলেরা নয়, কলকাতা থেকেও ছেলেরা আসে গুরুপদর ছেলে হবে বলে। সুন্দর সুন্দর ছেলে। লেখাপড়া-জানা ছেলে। ভালো ভালো জামা-কাপড়-পরা ছেলে।

এক ছেলের বদলে এতগুলি ছেলে পাওয়া অবিশ্যি ভয়ানক ভাগ্যের কথা। এমন সব ছেলে পাওয়া! কিন্তু হাভাতে মন গুরুপদর বুঝ মানে না। রোগা কালো মুখে বসন্তের দাগ পরনে আট-হাতি ধুতি গায়ে ফুটোফাটা শার্ট বাইশ বছরের একটি ছেলের জন্যে বুকটা তার হু হু করে।

শুধু তোমার লখাই নয় গুরুপদ, আরও অনেকে শহীদ হয়েছে।

মণীন্দ্র বিশ্বাস নুরুল ইসলাম আনন্দ হাইত।

অলক মজুমদার তপন দে—

গুরুপদর তাতে সান্তনা? পরের ছেলে মরেছে বলে তার ছেলেটি তো ফিরে আসবে না? দেশশুদ্ধ লোকের ছেলে মরলেও ফিরে আসবে না!

যান যান—আপনেরা যান আজ্ঞে! জোরালো গলায় সবাইকে যাওয়ার হুকুম দিয়ে নিজেই যায় ঘরের মধ্যে পালিয়ে।

বাবুরাই যত নষ্টের গোড়া। ছেলেকে তার ভুলিয়েভালিয়ে উসকে দিয়ে মিছিলে পাঠিয়ে খতম করে নিজেরা কেমন দিব্যি বহাল! কথাগুলো দারোগাবাবু ঠিকই বলেছে। থানায় ডেকে পাঠিয়ে প্রথমে এক চোট খিস্তি করলেও পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে পরে খাঁটি কথাই বলেছে।

মুষ্টিভিক্ষার চাল রেঁধে নিয়ে আসে ভূষণের বউ।

খেতে বসেই গুরুপদর মনে পড়ে যায় সরকারের চাল পরের দিন ডোবায় ফেলে দিলেও আগের রাতে তার ভাত ডাল তরকারি গিলেছে। তবু ওলাউঠো হয় নি! তবু ওলাউঠো হয় নি!

ওই গুয়োড়ব্যাটা হাকিমের সাথে ষড় করে দারোগাকে দিয়ে লখাইকে খুন করেছে, আর ওর ভাত আমি খেইছি। ব্যাটার পিণ্ডি গিলিছি বউমা! ব্যাটার পিণ্ডি গিলিছি!

খেয়ে উঠেই গলায় আঙুল দিয়ে হড়হড় করে বমি করে।

সীতেশ বলে, এর চেয়ে পাগল থাকা ছিল ভালো।

মোহিত বলে, তাই। রোজ এভাবে বমি করতে করতে কবে না হার্টফেল করে।

হানিফ বলে, পাগল তো নয় বাবু, বুনো কচুঘেঁচু খেয়ে মাথার গোলমাল হয়েছেল। মোর দাদীটা তো—

দাদী তোর মরে বেঁচে গেছে রে হানিফ। নারাণ ঘোষ আপসোসের শ্বাস ছাড়ে।

ভাতের বদলে রুটির ব্যবস্থা করো। ভাত খেলেই যখন সরকারের কথা মনে পড়ে—

সরকারকে সেদিন থান ইট ছুঁড়েছিল।

ছুঁড়েছিল, লাগে নি।

লাগে নি? ঈস! এখানে নাকেকানে খত দিয়ে কলকাতায় গিয়ে তড়পাচ্ছে। আর আসবে না গাঁয়ে! সুবল দাঁতে দাঁত ঘষে।

ওর ছেলেটা কিন্তু—

থামুন সীতেশদা! শুয়োরের বাচ্চা শুয়োরই হয়—জোতদারের ব্যাটা জোতদার।

দু হাতে মাথা গুঁজে থেকে গুরুপদ ছটফট করে। কেন আসে বাবুরা! রোজ রোজ কেন আসে! কেন তার সামনে বকবক করে।

তার হাত ফসকে সরকার বেঁচে গেছে। সে বুড়ো মানুষ! অথর্ব মানুষ! কিন্তু যোয়ান যোয়ান ওই মরদগুলোর হাতফসকে সরকার পালায় কি করে? দারোগাটা এখনও টিকে আছে কি করে? হাকিমটা এখনও আস্ত আছে কি করে?

যান যান—আপনেরা যান আজ্ঞে! হাঁটুতে মুখ গুঁজে গুরুপদ গর্জে ওঠে। বেহায়া বাবুরা তবু ফের আসে। দুদিন বাদেই।

তোমার জন্যে আমরা চাঁদা তুলেছি গুরুপদ। পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেছে।

আরও উঠবে গুরুপদদা। কলকাতাতেও—

অ্যাদ্দিন যারা ফিরেও তাকায় নি, গুরুপদ বেঁচে আছে না মরে গেছে খোঁজও নেয় নি দরদে আজ তারা উথলে উঠে চাঁদা তুলছে? দরদ!

দরদ দেখিয়েছে দারোগাও। হাকিমকে বলে মোটা টাকা পাইয়ে দেবে বলছে। তার কথামত চললে পাইয়ে দেবে।

হাকিমও নাকি দরদে খাবি খাচ্ছে। বাড়ি বয়ে সেদিন সরকারও এসেছিল দরদ দেখাতে।

তোমাদের দুজনের যাতে খাওয়াপরার কোনরকম কষ্ট না হয়—

ছেলেকে খুন করিয়ে চাঁদা তুলছে! ছেলেকে খুন করে টাকা পাইয়ে দেবে বলেছে!

না-খাওয়া ছেলেটা গুলি খেয়ে মরল আর তারা দুজনে খেয়েপরে বেঁচে থাকবে।

টাকাগুলো রাখ গুরুপদ—ধরো।

ভিক্ষে?

ভিক্ষে কেন বলছ গুরুপদদা!

ভিখিরি বানো্য দিলে মণ্টু বাবা? লখাই নেই বলে আমরা তোমরা ভিখিরি বানো্য দিলে! টাকার থলি হাতে গুরুপদ ডুকরে ওঠে।

ভিক্ষে নয় গুরুভাই। তোমার লখাই সকলের জন্যে জান দিয়েছে—

জানের দাম ঘোষ মশায়? আমার লখায়ের জানের দাম?

সরকারকে তাক করে ইট ছুঁড়েছিল, সরাসরি নারাণ ঘোষের মুখে ছুঁড়ে মারে টাকার থলি।

যান যান—আপনেরা যান আজ্ঞে!

লখাইয়ের জানের দাম মিটিয়ে দিতে বাবুরা কোমর বেঁধেছে। কত দাম লখাইয়ের জানের? পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি টাকা? একশো টাকা? দুশো টাকা? পাঁচশো টাকা?

পাঁচশো টাকা তার হাতে ধরে দিলেই লখাইয়ের জানের দাম শোধ হয়ে যাবে? পাঁচশো টাকা পেলেই বুকের সমস্ত জ্বালাপোড়া নিভে যাবে?

দারোগা যদি পাঁচশো টাকা পাইয়ে দেয় তবে পিঠে গুলি করে বুকে সংগীনের খোঁচা মেরে মেরে লখাইকে খুন করার শোধবোধ হয়ে যাবে?

লখাইয়ের মা! ঘরে আগুন লাগ্যে চল দোজনায় চলে যাই। এ গাঁ ছেড়ে চলে যাই। যেদিকে দু চোখ যায়—

ঝাপসা চোখে যামিনী সায় দেয়।

ঘর মানে সাত পুরুষের ভিটে। লখাই জন্মেছে ওই ভিটেয়। নিজের হাতে এই ভিটেয় আগুন লাগানো! স্বর্গ থেকে লখাই দেখবে না?

তার চেয়ে থাকুক ভিটে যেমনকে তেমন। ভিটের মায়া না করে ব্যাটা চলে গেছে, বাপও যাবে। মাটাকে তার সাথে নিয়ে যাবে।

ভিটেয় আগুন লাগাবু নি লখাইয়ের মা।

ঝাপসা চোখে যামিনী সায় দেয়।

তার চে মনসার ঝোপটাকে সাফ করে দে যাই?

যামিনী ফুঁপিয়ে ওঠে।

নিজের হাতে লাগিয়েছিল। এক রত্তি সেই চারা ফুলে-ফেঁপে কী প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। লখাই বলত, আমার ব্যাটা আমার নাতিপুতি আমার সনসার! রোজ ঘুম থেকে উঠে এর গায়ে লখাই হাত বুলোত।

গুরুপদও বুলোয়। আঙুলে তালুতে কনুইয়ে কাঁটার খোঁচা নেয়। গালে কপালে ঠোঁটে কাঁটার খোঁচা নেয়। বুকে ভরে কাঁটার খোঁচা নেয়।

সর্বাঙ্গে কাঁটার খোঁচা নিতে নিতে সাধ জাগে একেবারে ন্যাংটো হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঝোপের ওপর।

পড়েই মরে যায়। লখাইয়ের মাকে সাথে নিয়ে মরে যায়। লখাইয়ের নাতিপুতির সংসারে দুই বুড়োবুড়ি মরে পড়ে থাকে।

পড়শীরা দয়া করে খাওয়াচ্ছে। কদ্দিন খাওয়াবে? এর পর তো না খেয়ে ধুকে ধুকে মরতেই হবে? সে বড় কষ্ট! না খেয়ে মরা বড্ড কষ্টের!

কিন্তু আচমকা মরে যাওয়ায় কষ্ট নেই। লখাই মরে গেছে আচমকা। বন্দুকের গুলি খেয়ে সঙ্গীনের খোঁচা খেয়ে মরে গেছে মুখ দেখে কে বলবে! যেন ফুলের বিছানায় তোফা ঘুমোচ্ছে!

কী ভাগ্যিমান ব্যাটা! কী ভীষণ ভাগ্যিমান!

ব্যাটার সৌভাগ্যে বুকটা বাপের ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে যায়।

গুরু! গুরুপদ! গুরুভাই! গুরুপদদা! হই হই করতে করতে সবাই ছুটে আসে।

আমরা জিতে গেছি ! জিতে গেছি ! কোরাসে চেঁচিয়ে ওঠে ।

মণ্টু এক হাত ধরে, সীতেশ আরেক হাত। আস্ত মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে নারাণ ঘোষ ।

মণ্টু বলে, সরকার শেষ অবধি হার মেনেছে গুরুপদদা ।

সুবল বলে, লখাই আর তোমার একার ছেলে নয় গুরুপদ। লখাই এখন সবার ছেলে ।

গণেশ বলে, এই গাঁয়ের ছেলে। দেশের ছেলে ।

হানিফ বলে, দোস্ত জান দিয়ে মোদের দাবি আদায় করেছে বাজান !

হারু বলে, এবার থেকে ঠিকমত রেশন মিলবে। বাজারে পুলিশ আর হামলা করবে না। আমাদের দাবি সরকার মেনে নিয়েছে গুরুপদ। এই দ্যাখো, কাগজেই লিখেছে—

তোমার লখাই সকলের জন্যে শহীদ হয়েছে গুরুভাই ।

এতদিন লখাই শুধু তোমায় রোজগার করে খাইয়েছে, আর আজ তার রোজগারে—

সবাই খাবে। সবাই খাবে ।

আচ্ছা ! শুনতে শুনতে পুরনো মারবেলের মত দুই চোখ গুরুপদর ঠেলে বেরোয়। এমন বাহাদুর ! মুখখানা হাঁ হয়ে যায়। ব্যাটা তার এমন বাহাদুর !

আর ব্যাটার রোজগারে এবার সবাই খাবে ? সওয়ারি বয়ে রোজগারের টাকায় নয়, জান দিয়ে দাবি আদায়ের রোজগারে ? কী কাণ্ড !

ব্যাটা তার এতগুলি মানুষের এতবড় উপকার করেছে ? পিঠে গুলি খেয়ে বুকে সঙ্গীনের খোঁচা খেয়ে মরে গিয়ে এমন উপকার করেছে ? কী কাণ্ড !

লখাইয়ের মা শুনছিস ? শুনছিস ?

তোমার ছেলে—

ব্যাটা ! আমার ব্যাটা লখাই ! দোমড়ানো শরীরটা গুরুপদ প্রাণপণে সিধে করে দাঁড়ায়। আমার ব্যাটার রোজগারে সবাই খাবে বাবু ? সবাই খাবে ?

সবাই সবাই ! এই গাঁয়ের—এই তল্লাটের সবাই ।

লখাই দাস—

জিন্দাবাদ।

লখাই দাস—

থামো বাবু থামো! কথাটা একটুন বুঝতে দাও। সবাই খাবে? আমার ব্যাটার রোজগারে—

বলছি কি তবে। তোমার ব্যাটা—

থামো না! বলি আমার ব্যাটার রোজগারে ওই সরকারের গুষ্টি খাবে। বাবু? আমার ব্যাটার রোজগারে দারোগার গুষ্টি খাবে বাবু? ওদের পোঁ-ধরারাও খাবে বাবু?

এ কী হিংস্র-ভয়ংকর চোখমুখ! বাবুরা ঘাবড়ে যায়।

কেন বাবু কেন? ওরাও কেন খাবে বাবু? অমানুষিক আক্রোশে গলা চিরে ফেলে গুরুপদ শুধায়, আমার ব্যাটার রোজগারে—আমার লখাইয়ের রোজগারে ওই বাপ্তোতরাও কেন খাবে বাবু?

তড়িঘড়ি জবাব খুঁজে বাবুরা পায় না।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে রীতিমত একটা সাড়া পড়ে যায়, কমলা পর্যন্ত ছেলেমানুষ হয়ে ওঠে, ভিড় করে আসে টুনুর মা, চাঁদুর পিশিরা—নির্বিকার শুধু পরেশ।

মাছ দুটি নামিয়ে দিয়ে পরেশ ঘরে এসে তক্তাপোশে পা ঝুলিয়ে চুপ-চাপ বসে থাকে।

'কী টাটকা!' 'বারে পুকুরের মাছ যে!' 'এমন মাছ আজকাল দেখা যায় না।' 'যারা দেখবার ঠিকই দেখে।' 'যা বলেছেন দিদি, দুটোয় কোন না সের পাঁচেক হবে।' 'তার মানে, কম করেও, প-নে-র টা-কা। ওরে বাব্বা!' 'ইলিশ হলে কদিন রেখে খাওয়া যেত।' পুকুরে ইলিশ— ? 'আমি মুড়ো খাব না।' 'ধেৎ বোকা, মেয়েদের মুড়ো খেতে নেই।' 'না থাক গে।' 'পটকাটা আমায় দেবে মা।' 'তেলের বড়া করবে মা ?'

পরেশ সবাই শোনে। স্পষ্ট যেন দেখতেও পায়—মাছ দুটির দিকে তাকিয়ে তার ছেলেমেয়েদের চোখগুলি লোভে জ্বলজ্বল করছে, ভাড়াটেদের ঈর্ষায় এবং এতগুলি জ্বলজ্বলে চোখের দিকে চেয়ে ভারি দোটানায় পড়ে গেছে কমলা। স্বামীকে একবার জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত বেচারী ঠিক করে উঠতে পারছে না দুচার টুকরো করে ভাগ সবাইকে দেবে কিনা।

পরেশের একবার যাওয়া উচিত, বউকে উদ্ধার করার জন্যে না হোক—নিজের বাহাদুরি শোনানোর এমন মওকা সহজে মেলে না বলে। কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছেটা ঘন ঘন ঘাই দিয়ে উঠলেও কী করে তাকে লাই দেয় পরেশ—সমস্যাটার কিনারা না করে ?

প্রথমে চমক সেজে দেখা দিয়ে এখন গ্যাঁট হয়ে বসেছে যে-সমস্যা ? এতক্ষণ হাজার ভেবেও কোন হিল্লে করে উঠতে পারেনি যে সমস্যার ?

নিজের ঘরে নিজের বিছানায় চুপচাপ বসে খানিকক্ষণ এখন ভাবলে যদি হদিশ মেলে। যথারীতি চোখ বুজে ও গালে হাত দিয়ে ভাবলে।

যথারীতি চোখ বুজে ও গালে হাত দিয়ে ভাবার জন্যে পরেশ তাই বালিশে কনুইটা সবে গুঁজেছে—কমলা ঘরে ঢোকে।

কী হল ? মাছ রেখেই চলে এলে কেন ?

কারণ আছে।

এবারেও কি বাজার থেকে—

ক্ষেপেছ ! অত শখ নেই।

শখ নেই ! মাছ ধরবার শখে সারাটা দিন যে পুকুর পাড়ে কাটাতে পারে—

পরেশের ইচ্ছে হয় বলে, গিন্নি, সারাটা দিন পুকুর পাড়ে কাটাবার শখটা চাগিয়ে তুলেছিলুম বলেই মাসদেড়েক পরে এয়োস্ত্রী মানুষটা আজ দাঁতে আঁশ কাটতে পারবে, ছেলেমেয়েগুলো পেট ভরে দুটি ঝোল-ভাত খাবে।

কিন্তু এমন বেফাঁস কথা কি বলা চলে ? এখন যা হবে হাসির ব্যাপার রাগারাগির সময় তা-ই হয়ে দাড়াবে মোক্ষম হাতিয়ার।

সুতরাং পরেশ গম্ভীর হয়ে থাকে।

দুটোই তুমি ধরেছ ?

ঘাড় নেড়ে পরেশ সায় দেয়।

নেহাৎ ও দুটোর কপালে মরণ ছিল—!

কমলা ঠাট্টা করছে। অতীত দিনের কথা নিয়ে ঠাট্টা। মাছ ধরবার জন্যে পরেশ যেদিন আপিস কামাই করত। কিন্তু খালি হাতে ফিরত বেশির ভাগ দিন। ঠাট্টার জ্বালায় শেষের দিকে বাজার থেকে মাছ কিনে নিত। একদিন বুঝি বেখেয়ালে একটা ইলিশ এনে হাজির করেছিল। তারপর—

কিন্তু, সেসব দিন তো কবে তামাদি হয়ে গেছে। শখের জন্যে আপিস কামাই দূরস্থান—ছুটির দিনেও কি দম ফেলবার ফুরসত এখন মেলে ?

নেহাৎ মাছ মাছ করে ছেলেমেয়েগুলি রোজ দুবেলা খাওয়ার সময় কান্নাকাটি না করলে, দিনের পর দিন আধপেটা না খেয়ে থাকলে, মিনটা মাছের জন্যে বায়না ধরে পরশু ওভাবে সাত-চোরের মার না খেলে

পরেশের কি মনে পড়ত তামাদি-হয়ে-যাওয়া তার শখটির কথা ? ওই শখের দৌলতে সন্তোষদের দলে ভিড়ে গিয়ে বিনে পয়সায় সবাইকে একদিন মাছ খাওয়ানোর কথা ? একদিনের জন্যে হলেও মাছের সমস্যাটা মেটানোর কথা ?

কিন্তু হায়, কে জানত—সাধারণ সমস্যা মেটাতে গিয়ে এমন অসাধারণ এক সমস্যায় তাকে থেমে যেতে হবে !

কী ব্যাপার বলো দেখি ? বন্ধুবান্ধবের সাথে ঝগড়া করে আসনি তো ? দিনকে দিন মেজাজ যা হয়ে উঠছে—

বড় সমস্যায় পড়ে গেছি হে ।

কী এমন সমস্যা ?

সমস্যা বড় গুরুতর প্রিয়ে ।

মরণ ! চা খাবে ?

উঁহু । বিকেলে চা খেয়েছি—। পরেশ ভুঁড়ি চাপড়ায় ।

তা, খাওয়াটা ভুঁড়ি চাপড়াবার মতই নয় কি ? চার-চারখানা আস্ত লুচি এবং আলুভাজা এবং দুটি সন্দেশ—কোথায় ? না, মহাদেব মাস্টারের বাড়িতে ।

দু বছর আগে যার ওখানে ভাঙা কাপে কয়েক চুমুক চা খেয়েই প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল, সেখানে কিনা—

তা খাওয়ালে কে ? বন্ধুর বোন ? নাকি বন্ধুর বউ খাইয়ে দিলে নিজের হাতে ?

ঠাট্টা নয় ঠাট্টা নয়—সিরিয়াস ব্যাপার—গুরুতর সমস্যা ।

সে তো বুঝতেই পারছি । অনর্থক একটা কটাক্ষ বিলিয়ে বেরিয়ে যায় কমলা ।

স্বস্তি পায় পরেশ । কটাক্ষর প্রতিদান সময় মত দেওয়া যাবে, আপাতত ঘরটা ফাঁকা থাকা দরকার । ধীরে সুস্থে ভেবে সমস্যার ফয়সালা করার জন্যে ।

বালিশে কনুই রেখে গালে হাত দেয় পরেশ, চোখ বুজে ভাবার উদ্যোগ করে : বউটার সাহায্য নেবে কি ? বুঝসুঝ মেয়ে—যেভাবে সংসারটার হাল ধরে আছে । হয়ত বুঝবে, বোঝা উচিত অন্তত—দু

বছর আগেও যে মানুষটা বস্তি-বাড়িতে থাকত, তাও ঠিকমত ভাড়া দিতে পারত না—সে কিনা আজ বাড়ি হাঁকিয়ে বসেছে !

বুঝলে সমাধানও হয়ত করে দিতে পারবে। মাঝে মাঝে স্বামীকে বেমালুম থ বানিয়ে, অকথ্য ধাঁধার মত একেকটা সমস্যার সমাধান যে-ভাবে করে দেয়। কিন্তু—

কিন্তু সেসব হল পরেশের ঘর সংসারের সমস্যা, এ সমস্যা জগৎ সংসারের। আজকের বস্তি-বাসিন্দা কালকের বাড়ি-হাঁকানোর মধ্যে হয়ত সমস্যার কিছু ও খুঁজেই পাবে না। 'দেখো না জহরবাবুকে,' হয়ত সাফ জবাব দেবে, 'কোমরে শুধু ঘুনসী পরে যে দোকান সামলাত, চালের চোরাকারবারে রীতিমত বাবু বনে গিয়ে সে-ই কেমন মাতব্বর হয়ে উঠেছে।

এমন বলা স্বাভাবিক কমলার পক্ষে। কমলা তো আর মহাদেব মাস্টারকে চেনে না।

মহাদেব মাস্টারকে না, তার বউকে না, তার দুই ছেলে ও তিন মেয়ে কাউকে না।

কিংবা, এ-ও হতে পারে, সব শুনে কমলা হয়ত ধাঁ করে গম্ভীর হয়ে যাবে। শেষজীবনে, অতি সাধারণ হলেও, শহরতলীতে মাথা গোঁজার একটা আস্তানা করেছে। বাড়ির সকলকে, দামী না হোক, আস্ত আস্ত কাপড় পরিয়ে রেখেছে। নাতি নাতনীদের, দুখানা দুখানা গুড় রুটি হলেও, বিকেলে জল খাবার খাওয়াচ্ছে। চিররুগ্ণা স্ত্রীকে মাগনা মাদুলির বদলে, ভিজিট দিয়ে ডাক্তার দেখাচ্চে। অতিথি এলে, শুধু মিষ্টি কথা নয়, মিষ্টি মুখও করাচ্ছে, দুদণ্ড তার সাথে বসে সুখ দুঃখের কথা কইতে চাইছে, কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রাণ খুলে হাসছেও—এরই নাম তো ভদ্র-ভাবে বাঁচা? ভদ্রভাবে বাঁচার অতি সাধারণ এই উপকরণগুলিও যে জোগাড় করতে না পারে—

কথা না শেষ করে ঠোঁট ওল্টাবে কমলা। চলে যাবে গায়ে-ছ্যাঁকা-দেওয়া দৃষ্টি হেনে।

সুতরাং ওকে ডেকে দরকার নেই। নিজে থেকে ভেবে বার করা যাক—কী করে এটা সম্ভব হল? সম্ভব হল মহাদেব মাস্টারের মত

একটা জলজ্যান্ত ভদ্রলোকের পক্ষে ভদ্রলোকের বাঁচা? আজকালকার দিনে? মাত্র দু বছরের মধ্যে?

তবে কি মহাদেব মাস্টার ব্যবসা ফেঁদেছিল? দুবছরে লাল হয়ে গেছে সেই ব্যবসায় জহর পাঁজার মত?

গাঁয়ের সকলে যখন আড়ালেও শ্রদ্ধাভক্তি করে, ব্যবসা হলে চাল-ডাল নয়—উঁচুদরের ব্যবসা। যেমন ধরো—দেশপ্রেমের ব্যবসা, সাহিত্যের ব্যবসা, শিক্ষার ব্যবসা।

দেশপ্রেমের ব্যবসা করতে হলে খবরের কাগজ বার করতে হয়, কিংবা দল গড়তে হয়।

উঁহু, দেশপ্রেমের ব্যবসা-চালিয়ে-লাল-হওয়ার মত খবরের কাগজ পয়দা করা মহাদেব মাস্টারের কর্ম নয়। তার আগে একটা যুদ্ধের দরকার হয়। যুদ্ধের মওকায় কাগজের চোরা কারবারে ফলাও ব্যবসার বনেদটা গড়ে নিতে হয়। তারও আগে—

সে অনেক সিঁড়িভাঙা। দু বছরে তা অসম্ভব। এবং দল গড়ার ধাতও মহাদেব মাস্টারের নয়। সে-সাধ্যও নেই।

তবে কি সাহিত্যের ব্যবসা? হতে পারে। কিছু টাকা থাকলে আর বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের নাম শোনা থাকলে জাতে ওঠার জন্যে এ-ব্যবসা আজকাল অনেকে করে। নিজের নাম সই করতে গিয়ে তিনবার মাথা চুলকোতে হলে কি হয়, প্রকাশক হতে পারলে অনায়াসে একটা কেউকেটা বনে যাবে। সাহিত্যের ব্যবসা দুরকমের। এক প্রকাশক হয়ে কিছু লেখককে ভাড়া খাটাতে হয়, কিংবা লেখক হিসেবে ঘোমটা খুলে ফেলে আসরে নামতে হয়। জনপ্রিয়তার খেমটা নাচে পাঠকদের চমকে দিয়ে ধাঁধিয়ে দিয়ে বেকসুর আহাম্মক বানিয়ে দিয়ে দুহাতে তাদের পকেট হাতাতে হয়। মহাদেব মাস্টার কি—

উঁহু, সাহিত্যের ব্যবসা মহাদেব মাস্টারের দ্বারা হবে না। সাহিত্যের ওপর মহাদেব মাস্টার বরাবর হাড়ে চটা। দেবেশের অঙ্কের খাতায় প্রেমের কবিতা দেখে ক্লাস থেকে তাকে বার করে দিয়েছিল, খাতা কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেছিল প্রেমের শ্রাদ্ধ করতে করতে।

মহাদেব মাস্টার শিক্ষক, প্রতিটি ব্যাপারে সে অত্যন্ত সিরিয়াস।

মহাদেব মাস্টার শিক্ষাজীবী—সে-শিক্ষা বিলিয়ে জীবিকার সংস্থান হোক না হোক। এ নিয়ে তার বড় দেমাক ছিল। বোমার সময় ইশকুল বাড়ি ফৌজী আখড়া হয়ে উঠলে, ছাত্রের খোঁজে মহাদেব মাস্টার বাড়ি বাড়ি গিয়ে কড়া নেড়েছে যা মাইনে হয় দিক, না দিতে পারে নাই দিক—ছেলেরা তবু লেখাপড়া করুক। মানুষ হোক। অশিক্ষা মানে অজ্ঞানতা। এর চেয়ে বড় পাপ নেই, অজ্ঞানতার চেয়ে অভিশাপ নেই। যুদ্ধ একদিন শেষ হবেই, কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যদি অজ্ঞানতার অন্ধকারে থেকে যায়, তারা যদি মানুষ হয়ে না ওঠে তারা যদি—

সে কী লেকচার!

সামনে সবাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেও আড়ালে বলত পাগলা মাস্টার।

মহাদেব মাস্টার কি কিছু বুঝত না? বুঝত বইকি—সত্যিই কিছু পাগল তো নয়। বুঝলেও ভ্রূক্ষেপ করত না। শিক্ষা বিতরণের মহান দায়িত্ব যে স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে, মোটা মাইনের সরকারী চাকরি পেয়েও নেয়নি—এ সব ব্যাপারে তার ভ্রূক্ষেপ করলে চলে? শিক্ষার মূল্য এরা যদি বুঝবেই, তবে আর মহাদেব মাস্টারকে এত হ্যাফাজত পোয়াতে হয় কেন? অজ্ঞানের ঠাট্টা বিদ্রূপে ব্রত থেকে বিচ্যুত হবে মহাদেব মাস্টার? দুর্দিন এসেছে বলে পিছিয়ে যাবে? শিক্ষার মত জিনিস—

সন্দেহ নেই, সোজা হয়ে বসে পরেশ, নির্ঘাত শিক্ষার ব্যবসা। মৃদুমন্দ মাথা দোলায়ঃ নির্ঘাত! শিক্ষার ব্যবসা করেই ফেঁপে উঠেছে শিক্ষাব্রতী। আর পাঁচটা শিক্ষাব্রতীর মত। হয়ত কলকাতার কোন কলেজে মোটা শেয়ার আছে। মাঝে মাঝে নামকাওয়াস্তে দু চারটে ক্লাস নেয়, আর সাসপেন্স অ্যাকাউণ্টে মোটা টাকা।

দেখে সেটা অবশ্য মনে হল না। কিন্তু কলেজ-কারবারীদের কাকে দেখে সেটা মনে হয়? কী ধীর স্থির প্রশান্ত পুরুষ একেকটি! ভাজা মাছ উল্টে খাবে কি, পাতে মাছ আছে কিনা বুঝতেও পারে না!

আসলে চেহারা দিয়ে কি মানুষ চেনা যায়? বাস্তববাদী লেখকরা যদিও ভিলেনকে আঁকে ভাটার মত চোখ, মুলোর মত দাঁত, কুলোর মত

কান, হাঁপরের মত হাঁ-য়ের অধিকারী করে—কিন্তু বাস্তবের ভিলেনরা কি তাই ? বরং, এর উল্টোটাই নয় কি ?

অতএব দেখে কিছু মনে হওয়ার প্রশ্ন বাতিল।

কিন্তু মহাদেব মাস্টারের পক্ষে কি বনেদী কোন কলেজের ফলাও কারবারে হুট করে ভাগ বসানো সম্ভব ? আলু, পটল, ঝিঙে, মাছ, কচু-কপির ব্যাপারীদের মত এই কলেজ কারবারীদের মধ্যেও কি জমাট একতা নেই ? আঁতে ঘা পড়লে নির্ভেজাল প্রাকৃতে সেই জমাট একতা কি মুখিয়ে ওঠে না ? কেন ওরা ভাগিদার জোটাতে যাবে ? আর, মহাদেব মাস্টারের মত মানুষও কি মাত্র দু বছরেই না, মহাদেব মাস্টারকে বাদ দিতে হয়। ব্যবসা ট্যাবসা মহাদেব মাস্টারের সাধ্য নয়। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গাতেও যে বদলায়নি, দুবছরেও তার এমন পরিবর্তন অসম্ভব। স্বাধীন ভারতেও।

ফের বালিশে কনুই রাখে পরেশ। ফের গালে হাত দেয়। ফের চোখ বোজে।

হেমলতা ? স্ত্রীর দৌলতে এইসব হয়েছে ? শেলাইয়ের ব্যবসা করে হেমলতা বাড়ি করেছে ? স্বামী সন্তান নাতি-নাতনী নিয়ে ভদ্রভাবে বেঁচে আছে ?

ভালো শেলাইয়ের কাজ জানত হেমলতা। পাড়ার মেয়েরা তার কাছে শেলাই শিখত। পাত্রী দেখানোর সময় হেমলতার শেলাইয়ের কাজগুলি পাকা দেখার পথ অনেকখানি পরিষ্কার করে দিত।

ইশকুল উঠে গেলে হেমলতা লুকিয়ে লুকিয়ে এটা সেটা তৈরি করে বিক্রি করত। শেষকালে কোন এক দোকানের সাথে নাকি ব্যবস্থাও হয়েছিল। হেমলতার রোজগারেই একসময় সংসারটা টিকে ছিল। না খেয়ে মরার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। বস্তিতে উঠে গিয়েও।

হেমলতা কি শেলাইয়ের ব্যবসা করে ?

নিজের মাথায় গাঁট্টা হাঁকাতে ইচ্ছে হয় পরেশের—শেলাইয়ের কাজে বাড়ি হাঁকানো, ভদ্রভাবে বাঁচা ! শেলাইয়ের কাজ তো তপনের বিধবা দিদিটাও করে, দিনরাত স্নচ-স্নতো নিয়ে থেকেই তো চোখের দফা সারা করে এনেছে—কিন্তু মাসান্তে ভাইবউয়ের হাতে নিজের ও ছেলের খোরাকির টাকাটাও কি সববার পুরো দিতে পারে !

সুতরাং হেমলতা নয়।

তবে কি মীনার বর!

জামাই শ্বশুরকে বাড়ি বানিয়ে দেবে? সেই সাথে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার জন্যে হাতে গুঁজে দেবে নগদ টাকাও?

তাও মহাদেব মাস্টারের মত মানুষের জামাই? লেখাপড়া ভালো জানে না বলে গাঁট্টা-ফেরান বড়লোকের ব্যাটা হওয়া সত্ত্বেও নন্দর কাকাকে এক কথায় খারিজ করে প্রাইমারি ইশকুলের এক মাস্টারের হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়ে সোনার টুকরো ছেলে বলে নিজের সৌভাগ্যের কথা জনে জনে ডেকে জানান দিয়েছে যে মহাদেব মাস্টার?

তাহলে কি সেজ মেয়ে লীনা? লীনা গান গেয়েই?

হ্যাঁ, এটা হতে পারে। গান গেয়ে দিব্যি রোজগার করা যায়। রেডিওতে গাইলে মোটামুটি, রেকর্ডে বেশ মোটা, সিনেমায় গাড়ি বাড়ি ইস্তক। আর, গানও লীলা ভালোই গাইত। গলা ছিল, সুরবোধ ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত তো অপূর্ব শোনাত ওর গলায়।

শুধু রবীন্দ্রসংগীতে অবিশ্যি গাড়ি বাড়ি করা যায় না—কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত যে গাইতে পারত, আধুনিকটা ম্যানেজ করা তার পক্ষে শক্ত কী? মাথামুণ্ডু কতকগুলো শব্দকে জোরালো অর্কেস্ট্রার সাথে পাল্লা দিয়ে কখনো খাদে কখনো উঁচু পর্দায় কখনো ঢিমে তালে কখনো দ্রুতে জলদে গলা দিয়ে গড়গড়িয়ে উগরে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে! কিন্তু—

কিন্তু—অমন হতকুচ্ছিত মেয়ের পক্ষে কি গান গেয়ে নাম করা সম্ভব? নাম করে রোজগার করা?

গান কেন, দেখতে-খারাপ মেয়ের পক্ষে কোন কিছুই সম্ভব নয়। পাড়ার ছোকরাদের শিস-দেওয়ানো ছাড়া। লীলার পক্ষে বোধ হয় তাও সম্ভব নয়ঃ তার সামনে আসতেই যেমন লজ্জা পাচ্ছিল। বিয়ে-হল না, অথচ যৌবন চলে যায় বোঝা সত্ত্বেও যেমন সেকেলে বেশভুশা আঁকড়ে আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া কিছু না গাওয়ার জিদ ধরে আছে বাপের মতই, শিক্ষার জায়গায়, বিনে মজুরিতে গান শেখানোর ব্রত নিয়ে আছে!

পারলে বরং মীনা পারে। সত্যিই সুন্দরী। স্বাস্থ্যও মজবুত। ফিগার চমৎকার। বয়স বছর একুশ ঃ একুশ বছরের নারীদেহ অনেক কিছুই করতে পারে—এ তায় কুমারী, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী।

ফাটকাবাজিতে বাস্তুহারা হতে হতে মেয়েটার জন্যেই না বেঁচে গেল তালুকদার সাহেব ?

এটা অবশ্য পরেশের শোনা কথা। কিন্তু ভবতোষকে তো চোখের সামনে দেখছে ? বাইশ বছরের চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েও ভবতোষ যে সপরিবারে বেঁচে আছে—দু-দুটি উপযুক্ত মেয়ে ছিল বলেই না ? মেয়ে বলেই না একজন ধরমতলার এক চায়ের দোকানে পঞ্চাশ টাকার চাকরি করে আরেকজন চাকরি না করেও টিকিয়ে রেখেছে অতবড় সংসারটা ?

কোন সন্দেহ নেই—মীনাই। মীনার জন্যেই—

মীনার মুখখানা মনে ভেসে উঠতেই চাপা আর্তনাদ করে ওঠে পরেশ—একী ভাবছে সে ! একী ভাবছে ! অমন ফুলের মত মেয়ে—তার সম্পর্কে এই সব চিন্তা ! পরেশদা, ভালো আছ ? বলে শিশুয়ালী হেসে প্রমাণ করা মাত্র বকেয়া-বরপণের জন্য স্বামী-শাশুড়ীর-গঞ্জনায়-গলায়-দড়ি-দিয়ে মরে যাওয়া বোনটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় যাকে বুকে টেনে নেবার জন্য প্রাণটা হঠাৎ উথলে উঠেছিল—তার সম্পর্কে পরেশ কিনা—

পরেশ সোজা হয়ে বসে। দুহাতে চুল মুঠো করে ধরে। দেওয়ালে ঠকাঠক মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা বইয়ে ইতর মনটাকে শায়েস্তা করার জোরালো ইচ্ছে জেগে উঠে।

শুধু ইতর নয়—উজবুকও। দু'দুটো সোমত্ত ছেলে থাকতে সে কিনা ভাবছে বুড়ো বাপের কথা, চিররুগ্‌ণ মায়ের কথা, মেয়েদের কথা ? যে-মহাদেব মাস্টারকে সে বাপের চেয়েও বেশি সম্মান করত, যে-হেমলতাকে স্বর্গের দেবী ভাবত, যে বীণা-লীনা-মীনাকে নিজের বোনের মত দেখত তাদের সম্পর্কে—

ছি ছি ছি ! সংসারের অভাব-অনটন মানুষের মনকে এতখানি পশু করে দেয় ? পশুরও অধম করে দেয় !

নিজের ওপর ঘেন্না জাগে পরেশের। সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ইস্তফা দিয়ে দুই দাবনায় দুই হাত রেখে গুম হয়ে বসে থাকে পরেশ।

কিন্তু 'ভাবব না' ভেবে চুপচাপ বসে থাকলে না ভেবে পারা যায় ? বিশেষ করে ভাবনার গরমিলটা ধরে পড়ে গেলে ?

কেন এমন ভুল হল ? বীরেনদা আর নীরেনটার কথা কেন এতক্ষণ মনে পড়েনি ?

ও-বাড়ি নিশ্চয় বীরেনদা করেছে। হোক রাইটার কনেস্টবল—পুলিশের চাকুরে তো ? যে-অনার্স গ্রাজুয়েট বাপের অমতে কনেস্টবলগিরিতে নাম লেখাতে পারে—তার অসাধ্য কী ?

কিন্তু বাপের অমতে চাকরি নেবার সময় বীরেনদা তো কেঁদে ভাসিয়েছিল ? 'মত না দাও, মুখ ফুটে তুমি মানা করো না বাবা' বলে বাপের পায়ে মাথা খুঁড়েছিল ?

দু বছর আগেও তো শুনেছে এতদিনেও বীরেনদার কোন উন্নতি হয়নি শুনে খুশিও হয়েছে—মহাদেব মাস্টারের রক্তে হেমলতার গর্ভে যার জন্ম, সে করবে পুলিশের চাকরিতে উন্নতি !

না, তবে বীরেনদা নয়—নীরেন। হুঁ, কোন সন্দেহ নেই। এই সবের মূলে নীরেন। চালাক চৌকোশ চটপটে ছেলে। দুবছর আগে রাস্তায় দেখা হতে ও-ই জোর করে বাসায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বেকার—সে নিয়ে আপসোস নেই। মুখে বড় বড় কথার বকুনি। অবিকল বাপের মত। শিক্ষার বদলে রাজনীতি এই যা তফাৎ।

আসার সময় মহাদেব মাস্টার বলেছিল, একটু দেখিস বাবা, যদি কোথাও খোঁজটোজ পাস—

হ্যাঁ পরেশদা, চাকরির খোঁজখবর পেলে জানাবে কিন্তু তবে একটা কথা—আমি কিন্তু জেলফেরৎ দাগী আসামী—

জেলফেরৎ ? পরেশ হকচাকিয়ে যায়।

মহাদেব মাস্টার বলে, স্বদেশী করে জেলে গিয়েছিল ওতে দোষের কী আছে।

দোষের কী আছে ! হাড়পিত্তি জ্বলে যায় পরেশের—ভারতে স্বদেশী করায়, স্বদেশী করে জেলে যাওয়ায় দোষের কী আছে !

আরেকটা কথা, নীরেনদের বলে, চাকরি করতে গিয়ে কোন অন্যায় যেন না করতে হয়, মানসম্মান বজায় রেখে যেন চাকরি করতে পারি—একটু দেখ।

সে তো একশবার। মহাদেব মাস্টার সাথে সাথে সায় দেয়।

ন্যায়অন্যায় বিচার করে চাকরি! মান সম্মান বজায় রেখে চাকরি! মাস্টার মানুষ গুরুজন বলে ছোট ভাইয়ের মত নীরেনের গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছে করে পরেশের।

নীরেনের সাথে আজ দেখা হয়নি, কিন্তু কথায় কথায় জেনেছে আজও ওর চাকরি জোটেনি।

কই, আজ তো মহাদেব মাস্টার চাকরির খোঁজটোজ পেলে জানাতে বলল না? সমর আর দেবেন পাশে ছিল বলে?

নাকি চাকরির প্রয়োজনই আজ ফুরিয়ে গেছে? অনেকানেক শিক্ষিত বেকারের মত নীরেনও ওয়াগন-ভাংগা, নোট-জাল, মদ-চোলাই ইত্যাদির একটা বেছে নিয়েছে?

ওই করে বাড়ি করেছে? ভদ্রভাবে বেঁচে আছে?

তাই! আর দেখাতে হবে না। তাই! তাই! তাই!

সমস্যা সমাধানের আবেগে 'ইউরেকা! ইউরেকা!' বলে চেঁচিয়ে উঠছিল পরেশ, হঠাৎ খেয়াল হয়—সমাধানটা হাতে নাতে একবার যাচাই করে দেখা দরকার। শত হলেও মহাদেব মাস্টারের ছেলে। হেমলতার গর্ভে জন্ম। বীরেনদা এবং বীণা-মীনা-লীনার সহোদর ভাই।

এবং আজ পলিটিকস করে কাল যেমন মেজাজ বিগড়ে যায়, তেমনি গুলির মুখে এগিয়েও তো যায়। গুলি খেয়ে হাসিমুখে মরেও তো যায়?

এমন নজিরও তো জানা পরেশের?

এখুনি একবার সন্তোষের কাছে যাওয়া দরকার। সন্তোষের বাবা যখন হেমলতার চিকিৎসা করে—ঘরের খবর সন্তোষ দিতে পারবে। নিজে না জানে, পরেশকে বসিয়ে রেখে বাপের কাছে থেকে জেনে এসে দেবে।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে মিনি, রিনি, ভ্যাবলা, খোতন ও ছোটকা।

বাবা, শিগগির এসো।

এখুনি মাছ কোটা হবে।

মাছ কোটা দেখতে তুমি ভালোবাসো বাবা, আমিও ভালবাসি বাবা. —কী মজা বাবা—না?

ও বাবা, এসো না।

মা যে ডাকছে, ধেৎ।

চারপাশ থেকে ছেলেমেয়েরা ছেঁকে ধরে ধরে, হাত ধরে টানাটানি করে। ধমক দিয়ে পরেশ বলে, যা যা এখন বিরক্ত করিসনি। আমি বেরোচ্ছি।

বাঃ রে, মা যে তোমায় ডাকতে বলল।

বলুক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাক—সন্তোষের কাছে থেকে সমাধানটা যাচাই করে না আসা পর্যন্ত স্বস্তি পাবে না পরেশ।

অ মা—বাবা যাচ্ছে না। সমস্বরে ছেলেমেয়েগুলি চিৎকার করে ওঠে। তাড়াতাড়ি স্যাণ্ডেল গলিয়ে দরজায় পা বাড়ায় পরেশ। মাছ কোটা দেখবে! মাছ কোটা দেখতে ভালোবাসে! এমন সমস্যায় মাথাটা ঝিঁ ঝিঁ ধরে থাকলে ও-মাছ কি তার মুখে রুচবে? ও মাছ খেতে গিয়ে কি গলায় কাঁটা আটকে মরবে না! ছেলে মেয়ের হাঁকডাকে কমলা এসে ঘরে ঢোকে।

এ কী—এত রাতে চললে কোথায়?

সন্তোষের কাছে।

সন্তোষের কাছে? মানে সেই হাওড়া কদমতলায়?

হুঁ।

তুমি কি খেপে গেলে নাকি? এই শোনো শোনো—

পরেশ ততক্ষণে রাস্তায়।

সন্তোষের কথা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে পরেশ। যাক বাড়ি তাহলে নীরেনও করেনি, ভদ্রভাবে বাঁচার ব্যাপারে নীরেনেরও কোন হাত নেই জেনে মনটা তার ভারি স্বস্তি পায়।

তাই বল্। সবজান্তার মত মাথা দোলাতে দোলাতে পরেশ বলে, লটারি—লটারির টাকায় সব হয়েছে আর আমি কিনা গাড়লের মত কী সব যা তা—।

আত্মগ্লানিতে শিউরে ওঠে পরেশ সরকার।

এক বৃন্তে দুই ফুল

'আমায় ডেকেছেন স্যার ?'

'বসুন।'

আনন্দ বসে। দু দাবনায় দুহাত রেখে। দুপা জুড়ে। অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে।

ঘাড় গুঁজে একটার পর একটা চিঠিতে সই করে চলেছে—দত্ত সাহেবের চকচকে চাঁদি, শুঁয়োপোকা ভুরু থলথলে কাঁধ, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, কানে রোঁয়া রোঁয়া চুল—আনন্দ অনিমেষ। এত কাছে থেকে এমন বেপরোয়াভাবে মানুষটাকে দেখবার সুযোগ কখনো পায়নি।

দত্তসাহেবকে অনিমেষ না দেখে উপায়ও নেই। চোখ তুললেই জিতেনের সাথে চোখা-চোখি হয়ে যাবে। সে ঘরে ঢোকামাত্র মুচকি হেসেছিল। ভারি বিচ্ছিরি জিতেনের ওই মুচকি হাসা। ছাতাপড়া দাঁতের মুচকি হাসি।

সই শেষ করে দত্তসাহেব বলে 'এখনই সবগুলো ডেসপ্যাচ করে দাও। একস্‌প্রেস। ওক্কে ?'

'ইয়েস স্যার।'

ফাইল পত্র বগল-দাবা করে জিতেন বেরিয়ে যায়।

দত্তসাহেব পাইপ ধরায়। পাইপ কামড়ে ধরে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে, 'ইউ আর এ বিট অফেণ্ডেড। আরণ্ট্‌ ইউ ?'

'স্যার ?' আনন্দ থতমত খায়।

'স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট পেলেন না বলে ? ন্যাচারাল। দো ইউ রিয়েলি ডিজারভ এ'—ফের পাইপ মুখে গোঁজে, কিন্তু স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট পেলে আপনি অসুবিধেয় পড়তে পারেন মিস্টার সেন। পড়তেন কিনা ? কারণ—'

এই ব্যাপার ! এই জন্যে তলব ? স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট না-পাওয়ায় অফেণ্ডেড হয়েছে কিনা জানতে চাওয়ার অজুহাতে সেটা না-দেওয়ার কারণটা জানিয়ে দেওয়ার জন্যে তলব ?

'কলিগরা পাঁচ কথা বলত। যা সব কলিগ আপনার! আর আপনিও এমন নিরীহ ভালো মানুষ!

একই সাথে কলিগদের নিন্দে, তার তারিফ! নিন্দে-তারিফ এক মুখে! বর্তে-যাওয়া গলায়, আনন্দ বলে, 'আমি এতেই খুশী, স্যার। কোম্পানী যে দয়া করে—'

'ও নো নো। আপনি অনেস্ট অ্যান্ড মোস্ট রিলায়েবল এমপ্লয়ি। কোম্পানীকে যে-সার্ভিস আপনি দিয়েছেন কোম্পানী সেজন্য—'

'আমি তো ইনক্রিমেণ্ট পেয়েছি, স্যার।'

'অ্যাজ ইজুয়াল। সবাই পেয়েছে। আপনার একটা স্পেশাল পাওয়া উচিত ছিল। আমি বললে কোম্পানী দিতও। কিন্তু,' দত্তসাহেব সেকেন্ড কয়েক চুপ করে থাকে, 'আমি বলিনি। আপনার অসুবিধের কথা ভেবেই — বুঝলেন না?'

চটপট মাথা নেড়ে আনন্দ বুঝিয়ে দেয় যে বুঝেছে। যদিও ইউজুয়াল ইনক্রিমেণ্ট সবাই এবার পায়নি, কিন্তু তা নিয়ে সোরগোলও কিছু হয়নি। নাকে খত দিয়ে অর্থাৎ বণ্ড লিখে দিয়ে তারা চাকরি ফিরে পেয়েছে এই ঢের—একটা ইনক্রিমেণ্ট না-পাওয়ার দরুন সোরগোল করা সাজে না।

কিন্তু সে যদি স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট পেত? সহকর্মীদের মুখগুলি মনে করে আনন্দে শিউরে উঠে। নাকে-খত-দেওয়া সহকর্মীদের মুখগুলি মনে করেও।

'আপনি খুবই কনসিডারেট স্যার।' কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়।

দত্তসাহেব মৃদুমন্দ হাসে। হাসতে হাসতে দেরাজ খুলে একটা খাম বের করে।

'এই নিন। একবছরের ইনক্রিমেণ্ট। মান্থলি টেন্স হলে ওয়ান-টু-ও হত—এখানে ওয়ান-ফাইভ-ও আছে। সঙ্গে একটা চিঠি। কোম্পানী আপনার সার্ভিস অ্যাপ্রিসিয়েট করে থ্যাংকস দিয়েছে। কই—ধরুন।

'স্যার!'

'ধরুন।'

দম বন্ধ করে আনন্দ হাত বাড়ায়। হাত তাকে বাড়াতেই হয়।

'আমি ভাইজাগ চলে যাচ্ছি, শুনেছেন বোধ হয়?'

শুনেছে, কিন্তু বেসরকারী সেই শোনাটা স্বীকার করা ঠিক হবে কিনা ঠাওর করতে না পেরে মুখখানিকে আনন্দ অবাক অবাক করে তোলে। কাতর হয়ে শুধোয়, 'আপনি চলে যাচ্ছেন স্যার!'

'নেকস্ট মানথে।'

দত্তসাহেবের মিয়োনো গলা শুনে, ম্লান মুখ দেখে আনন্দর মায়া জাগে। তার সার্ভিস কোম্পানী অ্যাপ্রিসিয়েট করল, আর আসল লোকটিকে ভাইজাগের মত ওঁচা জায়গায় ট্রান্সফার? দত্তসাহেবের বাড়াবাড়িতে স্ট্রাইক শুরু হলেও বাড়াবাড়ির চরম করে দত্তসাহেবই কি সেই স্ট্রাইক শেষ অব্দি বানচাল করে দেয়নি?

'আমার জায়গায় এক মাদ্রাজী আসছে।'

'মাদ্রাজী আসছে!' এক মাদ্রাজীকে হটিয়ে এই চেয়ারে বসেছে, ফের মাদ্রাজী?

'লোকটা কেমন জানি না। তবে ওদের বিশ্বাস নেই। বাঙালী স্টাফের পিছনে লাগতে পারে।'

ভয়ের কথা! আনন্দ আতংক বোধ করে। এক মাদ্রাজীর ডিমোশনের শোধ যদি আরেক মাদ্রাজী এসে তাদের উপর নিতে শুরু করে?

'তখন এই চিঠিটা আপনার কাজে লাগবে। চিঠিতে যা লেখা আছে—বুঝলেন না?'

না বুঝলেই ছিল ভালো!

দত্তসাহেবের ঘরে আদৌ না যেতে হলে!

ব্যাপারটা আদৌ না ঘটলে!

ম্যানেজারের চেম্বার থেকে আনন্দ করিডরে দাঁড়ায় খানিক। ওদিকে সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে। যাওয়ামাত্র ছেঁকে ধরবে।

কী বলবে ওদের? দত্তসাহেবের সেলাম দেওয়ার কী কারণ দেখাবে? অফিসে আসামাত্র সেলাম দেওয়ার?

এই খামের কথা?

সর্বনাশ !

ক্যাণ্টিনে গিয়ে এক কাপ চা নিয়ে ভেবেচিন্তে কারণ একা তৈরী করে নেবে ?

থুতু ফেলার জন্যে তার কামরা থেকে বেরিয়ে জিতেন বলে, 'এই যে আনন্দবাবু—এখানে দাঁড়িয়ে ?' বলে মুচকি হাসে।

থুতু ফেলতে বেরুনোটা অজুহাত। আনন্দকে দেখে বেরিয়ে এসেছে। নইলে গলা খাঁকারি দিয়ে বেরুলেও 'এই যে আনন্দবাবু' বলে থুতু গিলে ফেলে ?

অর্থাৎ ব্যাপারটা জানি ম্যানেজারের পি-এ ! তাই ওই মুচকি হাসি ?

'অমন ভাম হয়ে কেন ? সাহেব বকাঝকা করলেন বুঝি ?'

হাড়পিত্তি জ্বলে যায় আনন্দর। জেনেশুনে ন্যাকামি !

'কিন্তু সাহেবের মেজাজটা তো আজ ভালোই ছিল। এক কথায় আমার দুটোয় ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল।'

প্রাণে আনন্দর সাধ জাগে, ঠাস করে একটি চড় কষিয়ে লোকটার ন্যাকামি ঘুচিয়ে দেয়।

কিন্তু প্রাণের এ-সাধ মেটালে কেলেংকারির একশেষ। সারা অফিস জেনে যাবে যে স্ট্রাইক বানচাল করায় সবচেয়ে বেশি মদত দেওয়ার বকশিস পেয়ে আনন্দ সাপের পাঁচ-পা দেখেছে। এমনই এক সাপের এমনই পাঁচখানা পা যে দত্ত সাহেবের অতি পেয়ারের পি-একেই চড় মেরে বসেছে।

অগত্যা আনন্দ ঘনিষ্ঠ হয়। অন্তরঙ্গ হয়। ফিশফিশ স্বরে শুধোয়, 'আর কে কে পেয়েছে জিতেনবাবু ?'

'কী কে পেয়েছে ?'

'কেন ইয়ে করছেন ভাই ! বলুন না ! আপনি জানেন না হতে পারে ?' বলে আনন্দ ফিক করে হাসে। আপ্যায়নের হাসি।

আচমকা গম্ভীর হয়ে গিয়ে জিতেন বলে, 'আমি কিছু জানি না মশায়। আমি কী করে—'

'জানেন না ?'

'উঁহু।' জিতেন পেছন ফেরে।

খপ করে আনন্দ তার হাত ধরে ফেলে, 'আমি দেড়শো টাকা পেয়েছি, এই মাত্র পেলাম—জানেন না ?'

'আচ্ছা !' জিতেন এক গাল হাসে। এ তো মহা খোশখবর মশায়। তাহলে আমাদের মিষ্টিফিষ্টি—মিষ্টান্নং ইতরে জনা—'

'ব্যাপারটা কনফিডেনশিয়াল জানেন ?

সেটা জানা স্বাভাবিক। জিতেন কবুল করে। নইলে সাহেব চেম্বারে ডেকে নিয়ে টাকা দেবে কেন ? তাকেও ঘর থেকে বের করে দিয়ে ?

তবে ওই চিঠি সে টাইপ করেছে, না সাহেব বাইরে থেকে টাইপ করে এনেছে তা জিতেন বলতে পারে না। সামান্য পি-এ বই তো নয়—অত বলাবলির মধ্যে থাকায় তার দরকার ?

জিতেনের যুক্তি শুনে আনন্দ মোহিত হয়ে যায়। বেছেবুছে পি-এ বানিয়েছে বটে দত্ত সাহেব ! ছোকরা নাকি মদ টদ খায়, এখানে-সেখানে যায়—কিন্তু অফিসের কাজে সানশো। ইউনিয়নের মেম্বার হয়নি, স্ট্রাইকের সময় নিয়মিত এসেছে—তবু অফিসের একটা লোকও ওর ওপর চটেনি। সব দিক ম্যানেজ করার কায়দা-কানুন জানে। সবাইকে হাতে রাখার কায়দা-কানুন !

কত আর বয়েস হবে ? বছর তিরিশেক। কিন্তু মাথাটি পেকে ঝানু।

তা এমন পাকা ঝানু মাথার কাছে সারেণ্ডার করা চলে।

আনন্দ বলে, 'দেখবেন জিতেনবাবু। এটা যেন ঘুণাক্ষরেও জানাজানি—'

'ক্ষেপেছেন !'

'আপনাকে আমি একদিন—'

আপনার দয়া !'

সত্যিই সবাই উদগ্রীব হয়ে ছিল। আনন্দ ঘরে ঢুকতেই কী ব্যাপার কী ব্যাপার বলে এগিয়ে আসে। অফিসে আসতে না আসতে তলব ! মারাত্মক কোন ভুলচুক নয় তো ? কোরাসে উৎকণ্ঠা জানায়।

কাল সে কোন মারাত্মক ভুল করে গেছে, সেজন্যে দত্তসাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়ে আচ্ছাসে ধাতানি দিয়েছে—বলতে পারলেই স্বস্তি পেত।

কিন্তু হুট করে কোন ভুল তৈরি করে ফেলতে না-পারায় আনন্দ বলে, 'ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন—ভাইজাগে—সেই কথা—'

তপেশ বলে, 'এ তো পুরনো খবর।'

'নতুন যে মাদ্রাজী আসছে সে নাকি লোক সুবিধের নয়। তাই সাবধান করে দিলেন। বললেন, সবাইকে যেন বলে দি—'

'এ বলেছে সুবিধের নয়? তার মানে সেটা এটার থেকেও–' কথা থামিয়ে দুই চোখ পংকজ ড্যাবডেবিয়ে তোলে।

গুপ্ত বলে 'এ তবু বাঙালী ছিল। এরপর ইংরেজিতে কথা বলতে হবে? সেরেছে!'

প্রিয়নাথ বলে, 'দত্ত সাহেবকে একটা ফেয়ার ওয়েল দিলে হয় না? হ্যাঁ হে বিভূতি?'

বিভূতি দেয় পাল্টা প্রস্তাব 'একে ফেয়ারওয়েল দেওয়ার বদলে যে আসছে তাকে ওয়েলকাম জানানো বেশি উপকারী—না কি বলিস দেবু?'

কিছু বলা দূরে থাক, ফাইল থেকে দেবু মুখই তোলে না। বাড়িশুদ্ধু ডেংগু, তার ওপর প্রথম পোয়াতী বউটার যখন-তখন অবস্থা; দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার দেবু এসে-ইস্তক ফাইল খুলে গুম হয়ে আছে।

আনন্দ পাশে এসে দাঁড়ায় দেবুর। বলে, 'তুই অফিসে এলি কেন? তোর আজ—'

নীতিশ বলে, 'মশার কামড়ে ডেংগু হয়। যে-মশা দিনে আবার কামড়ায়। সেই ভয়েই দেবু—'

'তুই থাম' নীতিশকে ধমক হাঁকিয়ে আনন্দ দেবুর পাশে বসে। চাপা গলায় বলে, 'টাকা পয়সার জন্যে ভাবছিস? চাস তো আমি তোকে হেল্প করতে পারি। পঞ্চাশ—হাণ্ড্রেড—আপটু শ দেড়েক—'

দেবু ফোঁস করে ওঠে, 'ধার নিলেই হল? শুধতে হবে না? একেই বোনের বিয়ের সময় কো-অপারেটিভের সেই বারশো—।' ভোস করে শ্বাস ফেলে।

শ্বাস ছাড়ে আনন্দও। চাপা দীর্ঘশ্বাস। হল না! টাকাগুলোর হিল্লে করার প্রথম চেষ্টাই বরবাদ!

টাকার অমানুষিক দরকার, অথচ শোধ করবার কথা ভেবে ধার নিতে

চায় না। দেবুকে কি বলবে—দেড়শো টাকা তোকে আমি অমনি দিয়ে দিতে পারি? জন্মেও তোকে তা শুধতে হবে না—বলবে?

ক্ষেপে যাবে ছেলেটা। এখনও যা টনটনে আত্মসম্মান! কলেজের গন্ধ গায়ে লেগে আছে বলে এখনও!

অথচ এই টাকাগুলির একটা হিল্লে করা দরকার। সংসারের জন্যে এ-টাকা খরচের কথা ভাবাই যায় না। এ-টাকা বাড়িতে নিয়ে গেলেও সংসারের অকল্যাণ।

একটি মৃত্যু, আর অনেক দীর্ঘশ্বাস ও অভিশাপের বিনিময়ে এই টাকা! রক্ত আর চোখের জলে মাখা এই টাকা! বন্ধুর রক্ত আর সহকর্মীদের চোখের জল!

বড় অমঙ্গুলে! এই টাকা বড় অমঙ্গুলে।

বুক পকেটে টাকা ভরতি খাম। ওই টাকা বুকে করে আছে ভাবলে গা গুলিয়ে ওঠে। থেকে থেকে তাই কাঁধ উঁচিয়ে তুলে বুক কুঁচকিয়ে ওই খামের ছোঁয়া থেকে বুকটাকে আনন্দ বাঁচাতে চায়।

‘কোথায় যাচ্ছেন?’

‘ডেসপ্যাচ থেকে ঘুরে আসি।’

‘আপনার জন্যে মিঠে পান আনতে দিয়েছি।’

‘আসছি এখনি।’

ইদানীং বিভূতিও তাকে তেল দিচ্ছে! ইউনিয়নের পাণ্ডা বিভূতিও তার সার্ভিস অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে! কোম্পানীর তবে কী কসুর!

আনন্দ দোতলায় নামে।

ডেসপ্যাচের বরদা রেস খেলে। বরদাকে টাকাগুলি দেবে। বলবে, তার হ'য়ে একটা ঘোড়ার নামে ধরে দিক। হারবে তো নির্ঘাৎ। ল্যাঠা চুকে যাবে।

বরদার মুখোমুখি এসে কিন্তু মত বদলে ফেলে। রেস খেলছে? প্রথম দিনেই দেড়শো টাকা? কালই অফিসে জানাজানি হয়ে যাবে। বাড়িতেও খবর পৌঁছে যাবে। ওই বরদাই বৌদি বৌদি করে বউকে গিয়ে জানিয়ে আসবে।

অত হিসেবী মানুষ সংসারী মানুষ আনন্দ দেড়শো টাকা রেসে উড়িয়ে দিল।

শাশুড়ীর চিকিৎসা হচ্ছে না, তার একখানা আস্ত শাড়ি নেই, সকালের জলখাবারের পাট তুলে দিতে হয়েছে—আর আনন্দ কিনা দেড়-দেড় শো টাকা—অলকা হাউ হাউ করে কাঁদা সুরু করে দেবে। আশপাশের ভাড়াটেদের কাছে কেঁদে কেঁদে নালিশ জানাবে।

মুখ বুজে সেই নালিশের কান্না সয়ে যেতে হবে! কিছুতেই বলা চলবে না যে এই টাকা তার মাইনের টাকা নয়, বরদার মত টাকা ধার করে সে রেস খেলেনি—একটি মৃত্যু আর অনেক দীর্ঘশ্বাস ও অভিশাপের বিনিময়ে এই টাকা। বন্ধুর রক্ত আর সহকর্মীদের চোখের জলে মাখা এই টাকা। এই টাকা দিয়ে মার চিকিৎসার কথা ভাবলেই মার মৃত্যু অবধারিত। অনিবার্য মার মৃত্যুর পরে নরকবাস।

বরদা বলে, 'কী খবর আনন্দদা?'

'পরশু দারোয়ানের সাথে তোমার কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল? তাড়াতাড়ি ছিল বলে দাঁড়াতে পারলাম না—'

'আর কেন বলেন, ধার নিয়েছিলাম—'

'দারোয়ানের কাছে ধার! কেন, অফিসের কো-অপারেটিভ—'

'ওখানে ম্যাক্সিমাম হয়ে গেছে।'

'তাই বলে দারোয়ান—উঁহু, ভালো না। ভেরি ব্যাড। আমি তোমায় টাকা দিচ্ছি—আজই ওর ধার শুধে দাও।'

'তা হয় না আনন্দদা। ওর ধার শুধতে গিয়েই তো কথা কাটাকাটি। মাঠে ক'টা টাকা পেয়েছিলাম—ভাবলাম ওরটা শুধেদি। থার্টি পার্সেণ্ট ইনটারেস্ট। তা ব্যাটা আসল নিতেই চায় না। কেবলি বলে, পনের দিনেই দেনা শোধ করে দিলে কারবার চালিয়ে ওর ফয়দা?'

বরদার কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়।

বড় মুশকিলে পড়ে টাকাগুলি নিয়ে।

দু চার আনা হলে ভাবনা ছিল না—কোন ভিখিরিকে দান করে দেওয়া যেত এক টাকা অব্দি। ভাঙানি নেই, অথচ ভিখিরির দুঃখে প্রাণ কেঁদে উঠেছে—এক টাকাই দাতব্য!

কিন্তু দেড়শ টাকা? আচমকা দেড়শো টাকা দান পেয়ে গেলে অন্ধ

ভিখিরিরও চোখ ফুটে বেরোবে, খোঁড়া ভিখিরির পা গজিয়ে উঠবে। সে এক হই হই কাণ্ড রই রই ব্যাপার। পুলিশ দাবড়ে আসবে, রিপোর্টাররা হামলে আসবে। কাগজে কাগজে কাল ফলাও হয়ে—ভাবা যায় না। ওই পরিণাম ভাবা যায় না।

কোন সেবা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেবে ?

ছি ! একটি মৃত্যু আর অনেক দীর্ঘশ্বাস, ও অভিশাপের এই টাকা। বন্ধুর রক্ত আর সহকর্মীদের চোখের জলে মাখা এই টাকা ! কোন সেবা প্রতিষ্ঠানকে এই টাকা পাঠান—মানুষের সেবার জন্যে এই টাকা—ছি ছি ছি !

এই টাকায় কোন মানুষকে সাহায্যের কথা আনন্দ ভাবে কী করে ?

ইন্দ্রজিৎ রেললাইনে গলা দিয়ে মরতে ওর বউ ছেলে মেয়ে অকূলে পড়েছিল।

কিন্তু অফিসের সবাই দেখা করতে গেলেও সে গিয়েছিল ? ওদের জন্যে চাঁদা তুলে একটা কাণ্ড করার প্রস্তাব শুনেও সে না-শোনার ভান করে থাকে নি ? তারই জন্যে না শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাব উবে যায় ? ইন্দ্রজিতের বউ ছেলেমেয়ের জন্যে চাঁদা তুললে পাছে দত্তসাহেব চটে যায়—সেই ভয়ে যে সবাই পেছিয়ে পড়ে তাতে কি তার কোন হাত ছিল না ?

অথচ প্রাণের বন্ধু ছিল ইন্দ্রজিৎ। ওর বউ তাকে ঠাকুরপো বলে ডাকত, ছেলেমেয়েরা কাকু বলে। ওর বউয়ের কাছে সে কত আব্দার করেছে, ছেলেমেয়েদের কত আব্দার সয়েছে।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর জন্যে তারা সবাই দায়ী। সে-ও দায়ী।

শেষ মুহূর্তে কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট ফ্যাকরা তুলে সে বেঁকে না দাঁড়ালে স্ট্রাইক সাকসেসফুল হত। স্ট্রাইক সাকসেসফুল হলে ইন্দ্রজিৎ আত্মহত্যা—

আত্মহত্যা ? কে বলে আত্মহত্যা ! এ হত্যা। আত্মহত্যায় মানুষকে বাধ্য করা হত্যা ছাড়া কী ? এ হত্যা ! খুন ! ইন্দ্রজিৎকে তারা—

পুরোন কথা মনে পড়ে গিয়ে মাথা আনন্দর ঝিমঝিম করে।

বেশ তো সব চাপা পড়ে গিয়েছিল। ইন্দ্রজিৎকে ভুলে গিয়েছিল। ইউনিয়নের সেক্রেটারী ভেতরে ভেতরে এমন দুর্বল ! ছাঁটাই হওয়ার খবর পেয়েই রেলের লাইনে গিয়ে শুয়ে থাকে !

মনের সাথে অনেক লড়াই করে মনকে বুঝিয়েছিল, ইন্দ্রজিৎ দুর্বল বলেই আত্মঘাতী হয়েছে। ওর মৃত্যুর জন্যে ওর দুর্বলতাই দায়ী। মন তা বুঝেও ছিল। পোষ-মানা মন তার।

ভুলে গিয়েছিল প্রশান্তদেরও। কেরানির এত মান! বণ্ড লিখে দিতে মান যায়! বণ্ড না লিখে দিলে চাকরি থাকবে না জেনেও মান যায়!

সব চুকে বুকে গিয়েছিল। সব ভুলে গিয়েছিল। এই দেড়শো টাকাই—

আনন্দ বুক-পকেট খামচে ধরে। খাম সমেত বুকের এক গোছা লোম! লোমের গোছা উপড়ে আনতে চায়।

আস্ত আহাম্মক। আনন্দ একটি আস্ত উজবুক! কী দরকার ছিল তার দত্তসাহেবের ফুসলানিতে কান দেবার? কী দরকার ছিল কংগ্রেস—কমুনিস্ট নিয়ে মাথা ঘামাবার? রাতারাতি কংগ্রেসী বনে যাবার কী দরকার ছিল?

কংগ্রেস তাকে রাজা করেছে না কমুনিস্টরা তাকে বাদশা বানাবে?

এর চেয়ে যদি প্রিয়নাথের পথটা বেছে নিত! স্ট্রাইকের দিন কয়েক আগে থেকে সীক লীভ। ছুটিতে থেকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

যদি বোঝ স্ট্রাইক সাকসেসফুল হবেই—ছুটি ক্যানসেল করে দিয়ে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে স্ট্রাইকার বনে যাও। আর যদি দেখ কোন চান্স নেই—হাঙ্গামা না চুকেবুকে যাওয়া পর্যন্ত ছুটি বাড়িয়ে চলো। বাড়িতে কেউ দেখা করতে গেলে কাঁথা মুড়ি দিয়ে কঁকাও।

হায় হায় কী আহাম্মকি করা হয়ে গেছে! কী আহাম্মকি! অপমানে আনন্দ হাহাকার করে ওঠে। নিজের আহাম্মকির জন্যে দত্তসাহেবের ফাঁদে পড়ে গেছে।

হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা দত্তসাহেব!

'দেড়শো টাকাই আপনাকে খাওয়াব।'

'দেড়শো টাকা—!' মুচকি হেসে জিতেন বলে, 'আমি কী ঘটোৎকচ!'

আনন্দ বলে, 'কেন, আপনি তো ইয়ে খান? এখানে পাওয়া যায় না? তবে? তাই খান।'

'খাসা বিলিতিও আমি দেড়শো টাকার টানতে পারব না। তার ওপর এই ভর দুপুরে।'

দমে যায় আনন্দ। তবে কেন মাথা ধরার অজুহাতে অফিস থেকে ছুটি নিল? জিতেনকে নিয়ে রেস্তরাঁয় এল? টাকাগুলিই যদি না খরচ করে ফেলতে পারবে?

জিতেন বলে, 'বারে বসে দুচারটে পেগ টানা চলে। কিংবা বিয়ার। কিন্তু দেড় শো টাকার মাল, তাও একা, বারে বসে—'

'বেশ তো! তবে যেখানে চলে সেখানেই চলুন।'

'বলছেন কী আনন্দ বাবু!'

আনন্দ মরিয়া হয়ে ওঠে। এই দেড়শো টাকা খরচ তাকে করতেই হবে। যে করেই হোক। সব ফুঁকে দিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে বাড়ি যাবে।

'চলুন। তাড়াতাড়ি এটা সেরে নিন।'

'আপনি কি খেপেছেন!'

'কথা যখন দিয়েছি—'

'তাই বলে—'

'প্লিজ, আমায় কথা রাখতে দিন জিতেন বাবু!' আনন্দ অনুনয় করে। 'দোহাই আপনার—'

'কিন্তু আমি যে টালিগঞ্জ যাব বলে—'

'কাল যাবেন।'

'বোনের ভাসুর মারা গেছে—'

'একদিন বেঁচে উঠবে না। চলুন। প্লিজ! ওদিকে আমারও কোন অভিজ্ঞতা নেই। মুফতে যখন কিছু পাওয়া গেছে—' আনন্দ হাসে। খুবই কষ্ট হয় হাসতে যদিও।

'এই দুপুরে—'

'দুপুরবেলা কি যাওয়া যায় না? শুনেছি তো—'

'তা যাবে না কেন!' ওখানকার দরজা সব সময়েই খোলা।'

জিতেন মদের গেলাসে চুমুক দেয়। সইয়ে সইয়ে। গরম চা খাচ্ছে যেন।

অধীর আনন্দ। কী আস্তে আস্তে খাচ্ছে! দুটাকা পঁচাত্তর নয়া

শেষ করতে যদি আধ ঘণ্টা নেয়, দেড়শো টাকায় কঘণ্টা লাগবে ? এক চুমুকে সে-ই ওর গেলাসটা শেষ করে দিয়ে সময় বাঁচিয়ে দেবে নাকি ?

'এখানকার প্রন কাটলেট ফার্স্ট'ক্লাস। খেয়ে দেখুন না ?'

'থাক।' যদিও অফিসে আজ টিফিন করা হয়নি, কিন্তু কাটলেট ভেজে আনতে দেরি হয়ে যাবে না ?

'একটা কোল্ড ড্রিংক অন্তত—'

'থাক।' যদিও তেষ্টায় গলা শুকিয়ে এসেছে কিন্তু কোল্ড ড্রিংক আনতে যদি দেরি করে ফেলে ?

তাড়া দিয়ে দিয়ে জিতেনকে গেলাস শেষ করিয়ে নিয়ে আনন্দ বেরোয়। পোনে তিন টাকা বিলে পাঁচ সিকে টিপ্‌স্‌ দিয়ে দেয়।

নাঃ এখনও একশো প'য়তাল্লিশ।

ট্যাক্সিতে উঠে বলে, 'সেরা জায়গায় কিন্তু। টাকার জন্যে ভাববেন না। দরকার হলে আমি সব—'

'তরুবালার ফ্ল্যাটে যাওয়া যাক।'

'কেমন ?'

'বেস্ট।'

'দরাদরি করতে হয় ? করবেন না কিন্তু। যা যায়—'

'আপনি যে মশায়—'

'আপনাকে খুশী করব ভাই। কথা যখন দিয়েছি—'

বড় বুদ্ধি করে কথাটা দেওয়া হয়েছে ! দেড়শো টাকা খরচ করে জিতেনকে খুশি করার দুটো সুবিধে—আপাতত অভিশপ্ত টাকাগুলি থেকে রেহাই পাওয়া, আখেরের জন্যে জিতেনকে কৃতজ্ঞ করে রাখা।

জিতেন যদি কৃতজ্ঞ থাকে, যত বদমাসই হোক নতুন মাদ্রাজী সাহেব—কিছুই তার আসে-যাবে না। দত্ত সাহেবের পি-এ মাদ্রাজী সাহেবেরও হয়ে উঠবে।

যা চৌকোস ছেলে ! পাকা ঝানু মাথা ! তিরিশেই পাকা ঝানু !

ট্যাক্সি থেকে জিতেন আগে নামে।

পাঁচ টাকার একটা নোট ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিয়ে আনন্দ বলে, 'চলুন।'

'চেঞ্জ নিলেন না ?'

'বকশিস !'

নিজেকে দস্তুরমত একটা কেউকেটা বলে আনন্দর মনে হয়। গল্পে শোনা গেছে, উপন্যাসেও পড়া গেছে—কাপ্তেনরা নাকি এই রকমই হয়। খুশিমত টাকা ওড়ায়। পাছা ভাক করে মোহর ছুঁড়ে মারে। নোটের মালা গেঁথে কোমরের ঘাগরা বানিয়ে দেয়। নোট জেলে সিগারেট ধরায়। খুচরোর হরির লুট দিয়ে নাচের সাথে সংগত করে।

কাপ্তেনরা সেসব টাকা মেহনত করে রোজগার করে না। সে টাকা প্রজা উচ্ছেদের টাকা। সে টাকা চোরাকারবারের টাকা। সে টাকাও রক্তে চোখের জলে মাখা টাকা।

'দেখুন। দুদিকের ঘরে ঘরে আছে, দেখে পছন্দ করুন। নার্ভাস হবেন না। তাহলে পেয়ে বসবে।'

মাঝখান দিয়ে প্যাসেজ, দুপাশে ঘরের সার। সাড়া পেয়ে দু-তিন দরজায় এসে উঁকি দেয়।

আনন্দ পিছিয়ে পড়ে বলে 'আমি কি দেখব ! আপনিই—।'

'বাঃ, আপনিই হলেন গিয়ে—।'

একটি মেয়ে তাদের দিকে চেয়ে চোখ মটকাল। একজন টাটকা ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙল, একজন ব্লাউজে ফুল তুলতে তুলতে উঠে এসেছে। ঢুলু ঢুলু চোখ একজনের। ঘুমে না নেশায় ?

মোটাসোটা একটি মেয়ে শুধু ব্লাউজ গায়ে আঁচল জড়িয়ে হেলতে দুলতে ডান দিকের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁদিকের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখতে হুবহু দত্তসাহেবের বউয়ের মত। তারই মত টকটকে ফর্সা গায়ের রং। চলার ঢংও অবিকল তেমনি।

'ওই যে—ওই যে—ওই মেয়েটা' আনন্দ চনমনিয়ে ওঠে।

জিতেন বলে, 'ও যে ধুমসী।'

'হোক। ওই—।'

'চলুন তবে।'

মেয়েটি দরজা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। 'কী চাই।'

জিতেন বলে, 'বসব।'

'না।' মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

না! দপ করে ওঠে আনন্দর মাথা। মুখের ওপর না? একটা বেশ্যা তাকে না বলছে? ও কি জানে না যে পকেটে তার দেড়শো—না না—একশো চল্লিশটা টাকা?

'না কেন।'

'আমার লোক আসবে।'

'আমরা খানিকখন থাকব।' আগবাড়িয়ে আনন্দ বলে, 'যত টাকা চান—চাও—'

মেয়েটি হেসে ঘাড় নেড়ে বলে, 'অন্য ঘরে দেখুন। বলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়।

আশপাশের ঘরের মেয়েগুলি খিলখিল করে হেসে ওঠে।

দুই কান আনন্দর ভোঁ ভোঁ করে। একটা বেশ্যা তাকে অপমান করল? টাকার পরোয়া না করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল? আওয়াজ তুলে বন্ধ করে দিল?

জিতেন বলে, 'এ বাঁধা।'

'বাঁধা! বেশ্যা আবার বাঁধা কী? আনন্দ তো খানিকখন মাত্র থাকবে বলেছিল। ওর বাবু আসার আগেই না হয় তুলে দিত? মুফতে মোটা রোজগার করে নিত।'

'বাঁধা বলে—'

সতীত্ব দেখাল! বেশ্যার সতীত্ব! রাগে ক্ষোভে অপমানে আনন্দ গুম হয়ে যায়।

'চলুন তিন তলায়—'

'না। এখানে নয়।'

'এইটেই সবচেয়ে ভালো।'

'হোক। অন্য কোথাও চলুন।'

এক বেশ্যার সতীত্বের জন্যে গোটা বাড়িটার ওপর ঘেন্না ধরে যায়। আর কটা বেশ্যাও সাক্ষী ওর সতীত্বের। কীভাবে ওগুলো চেয়ে আছে!

কে জানে, ওরাও এক একটি সতী কিনা! আনন্দকে অপমান করার জন্যে রূপ যৌবনের ফাঁদ পেতে দাঁড়িয়ে আছে কিনা কে জানে! হয়ত

আনন্দ অ্যাপ্রোচ করা মাত্র ওরাও দড়াম করে দরজা দিয়ে দেবে। আনন্দকে অপমান করার বাহাদুরি দেখাবার এমন মওকা ছাড়বে না। সেজন্যে লোকসান হলেও, না! এক রকম জোর করেই জিতেনকে নিয়ে তরুবালার ফ্ল্যাট থেকে আনন্দ বেরিয়ে পড়ে।

'আপনার চেনাজানা কেউ। আপনি তো শুনেছি—'

'থাকবে না। কিন্তু সে তত সুবিধের নয়।'

'ধেৎ মশাই। ইয়ের আবার সুবিধে-অসুবিধে। শালগ্রাম শিলার সব সমান। চলুন জানা জায়গাই ভালো। পুলিশ টুলিশের হাঙ্গামা থেকেও—'

'চলুন তবে। নন্দরাণীর কাছে—'

'নন্দরাণী!' আনন্দ চমকে ওঠে। 'কী নাম বললেন? নন্দরাণী?

'হ্যাঁ।'

নন্দরাণী! নাম শুনে আনন্দ তাজ্জব বনে যায়।

তাজ্জব বনার কথাও। আনন্দর ডাক নাম নন্দ। বাড়িতে, ইশকুলে, কলেজে সবাই তাকে নন্দ বলে ডাকত। শুধু বড় পিশি বাদে।

বড় পিশি বলত নন্দরাণী।

বালবিধবা বড় পিশি। একটি মেয়ে হয়ে তাও মরে যায়। আনন্দকে বুকে নিয়ে নিজের মেয়ের শোক ভোলে।

আনন্দকে বড় পিশি কাজল পরিয়ে দিত, মেয়েদের মত ঝুঁটি করে টিকলি বেঁধে দিত, আলতায় পা রাঙিয়ে দিত। মনে পড়ে। আনন্দর জন্যে রুপোর মল, রুপোর গোট, সোনার বালা, সোনার হার গড়িয়ে দিয়েছিল। মনে পড়ে। ছেলেবেলায় এই নিয়ে তাকে সবাই খেপাত। মনে পড়ে। বড় পিশিকে বড্ড ভালবাসত। মনে পড়ে। আড়ালে মা বলে ডাকার জন্যে বড় পিশি সাধাসাধি করত। মনে পড়ে।

সেই বড় পিশিকে শেষ বয়সে শ্বশুরবাড়ির লাথিঝাটা খেয়ে বিনা চিকিৎসায় ভুগে ভুগে মরতে হয়েছিল। তাও আনন্দর মনে পড়ে যায় বইকি।

এ গলি-ও গলি পেরিয়ে পুরনো একটি দোতলা বাড়ির সামনে এসে জিতেন বলে, 'আগেই বলে রাখছি আনন্দবাবু, দেখতে কিন্তু সুবিধের নয়।'

'তাতে কি!

'অত সাজানো-গুছনো ঘর নয়।'

'তাতে কি !'

'ঘরে ফ্যান নেই !'

'তাতে কি !'

'তবে মেয়েটা খুব ফূর্তিবাজ।'

'আর কি চাই !'

'খুব নাচতে পারে।'

'আর কি চাই।'

'খুব বাধ্যও।'

'আপনি যদি ল্যাংটো হয়ে নাচতে বলেন—'

'বাবাবাবাবা ! আর কি চাই !'

'আর শুনুন, আমার নাম কিন্তু জিতেন নয়, কৃষ্ণেন্দু। কৃষ্ণেন্দু রায়। ওষুধের সেলসম্যানের কাজ করি—কেমন ? মাসখানেক পরে বাইরে থেকে ফিরলাম—মনে রাখবেন।'

সায় দিয়ে আনন্দ বলে, 'আমার নাম ?'

'আপনার নাম ? আপনার নাম—ধরুন ইন্দ্রজিৎ !'

'জিতেনবাবু !' চাপা গর্জে উঠেই ভক করে আনন্দ হেসে ফেলে। 'মরা মানুষটাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন !' অপ্রস্তুত হয়ে জিতেন বলে, 'আমি কিন্তু কিছু ভেবে—'

'আমার নাম আনন্দই থাক। কেমন ?'

'নিজের নামে—'

'থাক ! থাক, আনন্দই থাক।'

মেয়েটা তাকে মনে করে রাখবে। বাজারের এই বেশ্যা মেয়েটা।

মনে করে রাখবে এক দুপুরে তার কাছে এসে এক কাপ্তেন দেড়শো—না না, একশ চল্লিশ টাকা ফুকে দিয়ে গেছে। সেই কাপ্তেনের নাম আনন্দ।

যে-আনন্দকে ছেলেবেলায় বড় পিশি নন্দরাণী বলে ডাকত।

এক নন্দরাণীর কাছে আরেক নন্দরাণী ! কী যোগাযোগ ! হরপার্বতী মিলন আর কাকে বলে !

ওই নন্দরাণীকে এই নন্দরাণী ভুলবে না। জীবনেও না।

'আসুন।'

'চলুন।'

বাঁধ ভেঙে দাও

[বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে]

কী তাড়িই কবি বানিয়ে রেখে গেছে!

মিনিট কয়েক আগেও যে ঘরময় ছুটপট করেছে, জানালা থেকে বিভা টেনে আনলে ছাদে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছে, পূরবী পথ আটকালে তাকে হঠাতে গিয়ে বুকে তার কনুয়ের গোঁত্তা মেরে 'আহা লাগল!' বলে হাত বুলিয়ে দিতে যাওয়ার আহাম্মকি করেছে—এক ঢোঁক এই তাড়ি গিলেই না সে ধপ করে বসে পড়ে।

এসো আমার ঘরে এসো—। ঘরে বসবার জন্যে তখন ছিল সাধাসাধি।

এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ এসো বুকের পরে—। শেষ অব্দি বুকে তোলার জন্যে ব্যাকুলতা।

ঢোক ঢোঁক তাড়ি গিলতে গিলতে গায়িকাটিকেও তখন কোঁৎ করে গিলে ফেলার সাধ চালিয়েছিল।

'আপনার চা কিন্তু—'

সাধ চাগায় এখন ছুটির গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিতে। 'শুনুন, রাজেনদা শুনুন' বলে তাড়ির ভাঁড় খুলে দিয়ে কেবলি ঝগড়া!

তাড়ির কাছে চা? এমন তাড়ির কাছে!

জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে—। চটপট রাজেন সোজা হয়ে বসে। বসন্তের এই মাতাল সমীরণে—। কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! গলা ফাটিয়ে তারিফ জানাতে গিয়েই কিন্তু বিষম খায়। আবার। আবার শুরু হল!

বুকে ফের হাতুড়ি পড়তে থাকে।

সামনে টিফিন সাজিয়ে তিন-তিনটে যুবতী, জ্যোৎস্না রাতে সবাই বনে যাওয়ার রেডিওর জবর উল্লাস—কপাল তবু ঘামে ডিসেম্বরেও।

প্রেমিকাকে অবাক বানাতে এসে এমন ফ্যাসাদে পড়ে যাবে কে ভেবেছিল।

তাও যদি এসেই 'মা ওকে ডেকেছে' বলে সিনেমায় দুজনে কেটে পড়ত!

সন্ধ্যাটা কাটত খাশা। নির্ভেজাল প্রেমিকাকে পাশে নিয়ে ভাড়াটে প্রেমিক-প্রেমিকার লদকালদকি দেখে সারা দেহ প্রেমে টইটম্বুর হয়ে উঠলে ফেরার পথে ট্যাকসিতে—

ফেরার পথে! এই সময়েই না ফিরতে হত? আঁৎকে ওঠে।

'চা যে ঠান্ডা হয়ে গেল রাজেনদা!

মুখটা বিভার দিকে উঁচিয়ে ধরলেও মনটা রাজেনের ছোটাছুটি করে গলির এ-মোড় ও-মোড়। এ-মোড়ে তাড়া খেয়ে ও-মোড়, ও-মোড়ে তাড়া খেয়ে এ-মোড়।

প্রেমিকাকে বগলদাবা করে ছোটাছুটি!

ভাগ্যেশ যায়নি সিনেমায়! ভাবী শ্বশুরশাশুড়িশালাজশালীর আদরসোহাগের লোভে বাড়িতেই থেকে গেছে ভাগ্যেশ!

রইনু পড়ে ঘরের মাঝে—। কিন্তু ঘরে থেকেও কি পার পাওয়া যাবে?

'আপনার চা—।'

চা! জোরালো মাথা নাড়ে। তাড়িই যখন পানশে হয়ে গেল—চা!

তাছাড়া জীবনে ও আর চা খেতে পারবে? কাপ তোলামাত্র দোতলা-থেকে-ফেলে-দেওয়া-একটা-মানুষের ফুটিফাটা মাথার এক দলা ঘিলু ছিটকে এসে চায়ে পড়ল ভেবে হাত কেঁপে যাবে না?

আর্তনাদের ধাক্কায় আগের কাপটা কোলে না ওল্টালে কী কাণ্ডই যে হত!

তিন যুবতীর সামনে কোঁচা-কোঁচড় ভিজিয়ে বসে থাকা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার সন্দেহ-কি, কিন্তু ওই চা পেটে গেলে তামাম নাড়িভুড়ি এতোক্ষণে নাকমুখ দিয়ে গলগলিয়ে বেরিয়ে আসত না?

'চায়ে তো আপনার অরুচি ছিল না রাজেনবাবু।'

'ট্রেনে অনেকবার'—

'কিন্তু আপনার না এনিটাইম টি-টাইম?' গালে পুরবী টোল খাওয়ায়। দাঁত দুপাটি দেখাতেও ছাড়ে না।

খানিক আগে এই গাল জলে ভাসিয়েছিল? পরেশ না প্রিয়তোষ

সাঁতরার ছেলের জন্যে এই গালই জলে ভেসেছিল ? টাটকা-স্বামী এক ছোকরা গুলিতে ফোত হয়ে যাওয়ায় এই যুবতীরই গলা বুজে এসেছিল খানিক আগে ?

রাজেনের ধাঁধা লাগে। রাজেন মাথা ঝাঁকায়।

ছুটি বলে, 'আগের কাপটা নষ্ট হয়ে গেল—'

বিভা বলে, 'আসলে বড়দির হাতের চা ছাড়া—'

'বড়দিই তো করেছে। আমি শুধু নিয়ে এলাম ?'

'কেন তুই আনতে গেলি ?'

'বারে, বড়দি পোলাও বসিয়েছে বলে—'

'বড়দির পর মেজদি। তুমি কেন ভাই ঘোড়া ডিঙিয়ে—'

'ভালো হচ্ছে না বৌদি !'

'ঠিক বলেছ বৌদি। ঠিক ঠিক ! তুমিই তাহলে রাজেনদাকে কাপটা তুলে দাও।'

'অন্তত ছুঁয়ে দাও।'

'নাকি ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে যাব ?'

'তবে রে মুখপুড়ি !'

দুই বোনে হুটোপুটি শুরু হয়ে যায়।

হুটোপুটি শুরু হয়ে গেছে ওদিকেও। নতুন করে শুরু হয়ে গেছে।

একজনের খোঁপা খসে, অরেকজনের আঁচল।

ওদিকে বুঝি কার মাথা ফাটল।

এদিকে তিন বুলবুলির কলরোল, ওদিকে কোরাস কান্নার সোরগোল।

কী কনট্রাস্ট !

রাজেন মোহিত হওয়ার চেষ্টা চালায়। রেডিও বন্ধ করে দিয়ে চেষ্টা চালায়। এদিকে চোখ আর ওদিকে কান রেখে চেষ্টা চালায়।

লকআপে পায়ে বেড়ি পরিয়ে শূন্যে কাকে ঝুলিয়ে রেখেছ, কার চোখে নস্যি আর ঘাড়ে কার বিড়ির ছ্যাঁকা দিয়েছে, গোঁফে কার দেশলাই জ্বালিয়ে ধরেছে—খানিক আগে এই তিন যুবতীই কি পাল্লা দিয়ে তার ফিরিস্তি দিচ্ছিল ?

যে হাত দিয়ে বিভা ছুটির নাক টিপে দিল নখের ফাঁকে পিন গুঁজে

দেওয়ার কথা বলার সময় ওই হাতের আঙুলগুলিই না থরথরিয়ে উঠেছিল ?

জল চাইলে মুখে পেচ্ছাপ করে দেওয়ার ঘটনাটা খোলাখুলি না জানাতে পারায় 'জানোয়ার জানোয়ার' করে আক্রোশে ছুটি ফেটে পড়ে নি ?

বোমার খোঁজে পোয়াতী বউয়ের শাড়ি খুলে ফেলার খবর দিতে গিয়ে মাই দুলিয়ে শিউরে ওঠে এই বউটিই না ?

'লক্ষণ ভালো নয় রাজেনবাবু।' চোখ ঠেরে পুরবী দুই বোনকে দেখায়।

সত্যিই ভালো নয়। জিনিসপত্র আছড়ে ভাঙার আওয়াজ। অন্ধকার গলিতে অ্যামুনিশন বুটের দাপাদাপি।

'এখনও সময় আছে। বাছাই করুন।' পুরবী মুখ টিপে হাসে।

রুটিন মাফিক ঘটনাবলী। দেড় ঘণ্টায় সাতটি বাড়ি। এই রুটে চললে এ-বাড়ি আর কতক্ষণে ?

তা সত্ত্বেও রঙ্গরসিকতা। রাত নটায় পাড়াটা শ্মশান বনে গেছে, এ-ঘরে অথচ ফুর্তিবাজি। শ্মশানবাসর ?

ভাবী শালাজের মাথাটা মাঝখানে রেখে ভাবী দুই শালীর মাথা দুটি জোরসে বারেক ঠুকে দিয়ে ধাতস্থ করবে তিনজনকে ?

নাকি এটাই বাহাদুরি ? মরা-আধমরাদের জন্যে রেওয়াজমাফিক হায়-আপসোসের শিকনি ঝেড়ে আসন্ন বিপদের মুখে রঙ্গরসিকতা চালিয়ে যাওয়াই বাহাদুরি ?

জলজ্যান্ত একটা মানুষকে দোতলা থেকে ফেলে দেওয়া দেখে গিয়ে পোলাও রাঁধতে বসা বাহাদুরির চরম ?

রাজেন ছটফটিয়ে ওঠে।

ভাবী শালাজশালীরা বাহাদুরি দেখাচ্ছে, বাহাদুরির চরম করে ছাড়ল প্রেমিকা, আর চল্লিশ ছাতি তেত্রিশের তাগড়া জোয়ান হওয়া সত্ত্বেও—

ধাঁ করে কাপটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে। তারপর একটা রাজভোগ মুখে পোরে। আধখানা ওমলেট। দুটো সন্দেশ এক সাথে। ওমলেটের বাকিটা ঠেসে দিয়ে জলের গেলাস টেনে নেয়।

ভালো ভালো খাবারের কী স্বাদ ! দম আটকে এলেও কী স্বাদ !

মা সাধাসাধি করলেও না খেয়ে বেরিয়ে এসেছে। প্রেমিকাকে নিয়ে তো রেস্তরায় খাবেই, বোনটা আর ভাই দুটো আজ লুচি-পায়েস খাক। দাদার দৌলতে একদিন খাক। রুটি-চচ্চড়ির বদলে খাক।

বিভা বলে, 'দেখলি ছুটি, খাবার যে বড়দির হাতের রাজেনদা ঠিক বুঝতে পেরেছে।'

ঠোঁট উল্টে ছুটি বলে, 'মিষ্টি তো বরানগর মিষ্টান্নভাণ্ডারের। ওমলেট করতে রঘুও পারে।'

পূরবী বলে, 'আহা' বড়দি নিজের হাতে সাজিয়ে দেয়নি। শ্রী হাতের স্পর্শ! তা রাজভোগটা প্রসাদ রাখলেন নাকি ?'

বিভা বলে, 'বড়দি কিন্তু মিষ্টি ভালোবাসে না।'

পূরবী বলে, 'তুমি ভালোবাসার কী বোঝ মেজদি ?'

'বোঝে, বৌদি বোঝে। মেজদি আজকাল য়ুনিভার্সিটিতে—'

'কান টেনে ছিঁড়ব ছুটি! তোর মত সবাই ? কলেজের পিকনিকে গিয়ে তুই যা কাণ্ড করেছিস—বলব রাজেনদাকে' ?

'বলোনা—বলো।'

তেড়েমেরে ছুটি পারমিশন দিলেও বলার ফুরসং বিভা পায় না। একেবারে পাশের বাড়ির মেয়েপুরুষ আণ্ডাবাচ্চা জোট বেঁধে আচমকা চিৎকার জুড়ে দিলে মুখ খোলাই মুশকিল বলে পায় না।

চিৎকারকে চাপা দেওয়ার কৌসিসের কসুর অবিশ্যি নেই। লাথিতে লাথিতে চিৎকারের মুখ থেঁতলে দিয়ে অকথ্য অমানুষিক কৌসিসের।

ভড়কে যায় তিন যুবতী। এ ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

ফ্যাসফ্যাসে গলায় পূরবী সুধায়, 'মণ্টুর কথা ঠিক তো মেজদি ?

'বলল তো।'

'মণ্টুদা কখনো—।'

মণ্টু ? কে মণ্টু ? কী বলেছে মণ্টু ? রাজেনের ঠোঁট তিরতির করে, বুক চৌচির করে হৃৎপিণ্ডটা ছরকুটে পড়তে চায়। জিভ ঠেকে গিয়ে আলজিভে। কপালে ঘামে দরদরিয়ে। দুকানে ছোটে আগুন।

'কোনও মানে হয় না—এভাবে বাড়ি বাড়ি ঢুকে—মানে হয় না—মানে

হয় না—' হিস্টিরিয়ার রোগীর মত মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঘর থেকে পূরবী বেরিয়ে যায়।

'আমিও যাই। বড়দি ওদিকে একা একা—।' পড়িমরি করে দৌড় দেয় ছুটি।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় বিভা। রাজেনের সাথে চোখাচোখি হয়ে যাওয়ায় থমকে গিয়ে বসে পড়ে। সেকেণ্ড কয়েক বসেই ফের ওঠে।

'সত্যি, আসল লোক হেঁসেলে পড়ে রইল আর আমরা—' ঠোঁট চিরে হাসি ফোটায়, 'বড়দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—এক্ষুনি।'

কেটে পড়ল ? তিনজনেই কেটে পড়ল ? এতক্ষণ ফষ্টিনষ্টি চালিয়ে এখন কেটে পড়ল ?

এবার এই বাড়ি বলে ?

'কথা বলছ না কেন ?' সোফার কাঁধে এক হাত রেখে আগে সোফায় এক পা তুলে দেয়। 'ওরা বলছিল বটে—'

'কী কী কী ?' রাজেন নার্ভাস হয়ে যায়।

'কিছু না।' সোফার হাতলে বসে 'আমার জন্যে নাকি রাজভোগ রেখেছ ? প্রসাদ ?

তার নার্ভাসনেসকে প্রেমিকা যখন এড়িয়ে গেল, রাজভোগটি এখন নিজের হাতে খাইয়ে দেওয়া কর্তব্য। এক কিস্তি চুমো খাওয়ায়। হাতে-পায়ে বল পেলে তো !

'দাদা কখন ফিরবে ?'

'হঠাৎ দাদার খোঁজ ?'

'ওপরে যাবে ?'

'বাবার কাছে ?'

'ছাদে যাবে, ছাদে ?'

'বুঝেছি !'

জিভ দিয়ে আভা ঠোঁট ভেজায়। লিপস্টিক ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যেই ভেজায়, রাজেনের কিন্তু মনে হয় প্রেমিকা তাকে ভ্যাঙচাচ্ছে।

'কী বুঝেছ, শুনি ?' রাজেন চটে যায়।

'ভয় পেয়েছ। ওদের মত তুমিও—।'

অন্যায় ভয় পাওয়া ? চল্লিশ ছাতি তেত্রিশের তাগড়া বলে ভয় পাওয়া লজ্জা ?

সমানে সমানে হলে অন্যায়। সমানে সমানে হলে লজ্জা। কিন্তু লাঠি-রাইফেল-ব্যাটনধারী বুকে-আইনের-বর্ম-আঁটা একপাল ওই খুনের কাছে খালি হাতে ভয় পাওয়া ?

মুখে ঘুষি হাঁকালে, মাথায় ব্যাটনের বাড়ি মারলে, পেটে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে গোঁত্তা দিলে কিংবা তিনটেই একসাথে চালাতে শুরু করলে আর্টিস্টের মডেল বনে যাওয়াই বীরত্ব ?

আভার দুই কাঁধ খামচে গলা ফাটিয়ে প্রশ্নগুলি করার জন্যে দেহমন রাজেনের নিসপিসিয়ে ওঠে।

'ভয় নেই গো ভয় নেই।' সোফায় নেমে বসে পায়ের ওপর আভা পা তুলে দেয়। 'ওরা জানে কারা ক্রিমিনাল, কারা কালপ্রিট।'

'এই গলির প্রত্যেকটা বাড়ি—'

দমাদ্দম লাথি পড়লে দরজা খোলার জন্যে রাজেনকে বহাল করে গেল ?

ভাবী শ্বশুরশাশুড়িশালাজশালী মায় প্রেমিকা অব্দি এই মতলবে বাড়িতে তাকে মজুত রেখেছে ? বলির পাঁঠা ?

ছেলে কখন ফিরবে ঠিক নেই, পুরুষ বলতে নড়বড়ে এক বুড়ো আর নাবালক একটা চাকর—প্রথম চোটটা সুতরাং রাজেনের ওপর দিয়ে না গেলে বাড়ির মেয়ে তিনটে আর বউটাকে লণ্ডভণ্ড করে ফেলবে বলে মজুত রেখেছে ?

এতক্ষণ হাভাতে বাড়ির ছেলেমেয়েদের ওপর হাত-পা চালিয়েছে। ছিরিছাঁদ দূরের কথা শরীরে ওদের খামচি কাটার মত বাড়তি মাংসও থাকে না। মেসবাড়িতে তো বাহাত্তুরে একটা ঝি-ও জোটেনি। সাধেই চাকরটাকে আধমরা করে দোতলা থেকে গলিতে আছড়েছে।

সাত-আটটা বাড়িতে ঢুঁ মেরেও মেজাজ শরীফ করার মালমশলা না মেলায় সবগুলো হয়ে আছে ভাদুরে কুকুর। খানাতল্লাশি শিকেয় তুলে চারজনকে নিয়ে পড়বে এখানে পঞ্চাশ জন।

পঞ্চাশ, না চল্লিশ ? চল্লিশ, পঁয়ত্রিশ ?

তিরিশ তো বটেই। হাতে হাতে রাইফেল থাকলেও তিরিশের কমে

ঢোকা যায় পাড়ায় ? বেশির ভাগ জোয়ানমদ্দকে আগেভাগে পাকড়াও করে নিয়ে গেলেও ঢোকা যায় !

তিরিশ জনের মোকাবিলা করবে একজন ?

কী লাভ তাকে তবে মজুত রেখে ?

পাঁঠাবলি দেবার শখ ?

বলা যায় না। এ-বাড়ির শখসাধআহ্লাদের কিছুই বলা যায় না। যে-বাড়ির মেয়ে রাজেনের প্রেমে পড়তে পারে, রাজেনের ভাই-বোন-মাকে মানুষ বলে মনে করলেও রাজেনকে হীরের টুকরো ভাবে যে-বাড়ি—সে-বাড়ির শখসাধআহ্লাদের হদিশ পাওয়া দুষ্কর।

টুক করে সদর খুলে ডান দিকে দৌড় দেবে ?

আচমকা উঠে দাঁড়িয়েই ধপ করে বসে পড়ে। গলিতে পা দেওয়ার অপরাধেই জনাচারেককে পিটিয়ে লাশ করেছে, আর ডান দিকে দৌড় দেওয়া ? জাল ছিঁড়ে শিকার পালালো !

'কী, তুমিও ওদের মত ভয় পেলে নাকি ?'

'অ্যাঁ ?' কী হাসি ! ভুবনমনমোহিনী !

প্রত্যেক কেন হবে। বিজয় সেনের বাড়ি, প্রফুল্ল সিনহার বাড়ি, প্রতাপ দাশগুপ্তর বাড়ি তো ওরা ঢোকেনি।'

'কোথায় ঢোকেনি জানিনা, কিন্তু যেসব বাড়িতে ঢুকেছে—'

'পাড়াটাকে তো চেন না। লোফার ! যে যে বাড়িতে গেছে ওর প্রত্যেকটা—' ঘৃণায় কথাটা আভা শেষ করতে পারে না।

আচ্ছা ! যুক্তি অবশ্য আছে এই ঘৃণার। জায়গা বেচার সময় নারান কুণ্ডু বলেছিল বস্তি-মাঠকোঠাগুলো ভেঙে ফ্ল্যাট বানিয়ে দেবে। পাড়াটাকে অভিজাত করে তুলবে।

কিন্তু বস্তি-মাঠকোটার লোকগুলো এমন কাণ্ডই শুরু করে দেয় যে মালিক হয়েও কুণ্ডু মশায় এ-মুখো হওয়া ছাড়ান দিয়েছে।

পাড়াটার ওপর ঘেন্না অতএব স্বাভাবিক। অতীতকে মনে পড়িয়ে দেয় যে ! টিউশনি করে পড়াশুনো চালিয়ে ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট করে ভাবী শ্বশুরের কোলিয়ারিতে চাকরি বাগিয়ে যেমন মানে হয় না মাভাইবোনের সংসারের জোয়ালে নিজেকে জুতে রাখার, তেমনি এই পাড়ায় থাকার।

জীবনভর যদি এমন পাড়াতেই কাটাতে হয় কী লাভ হল তবে যুদ্ধের মওকায় দুহাতে কামানোর, স্বাধীনতার সুবাদে গোছগাছ করে নেওয়ার ?

'বরানগরের মধ্যে এই পাড়াটাই সবচেয়ে নচ্ছার।'

রাজেন মাথা দোলায়। একবার সামনাসামনি, একবার ডাইনে-বাঁয়ে। তোমার দিক দিয়ে তোমার কথা ঠিক, নইলে বেঠিক।

লেখাপড়ার পাট নিজেদের তো নেইই—তার ওপর ইশকুলে ইশকুলে গিয়ে হামলা, বছরের এই সময় ইশকুল-কলেজ বন্ধ। বিভাদের পরীক্ষা কেবলি পিছোচ্ছে, ছুটিদের কলেজ পুজোর পর থেকেই—'

রাজেন চুক চুক শব্দ তোলে। আপসোস-কি বাত! দেশের এক পারসেণ্ট ছেলে মেয়েও কলেজে পড়ে কিনা সন্দেহ, কিন্তু তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেলে দেশটা রসাতলে যাবে না ?

'এসব ছেলেদের ধরে ধরে চাবকানো উচিৎ।'

আলবৎ! ভাই দুটো আর বৌটাকে বাড়ি ফিরেই ধমকে দেবে। চাবকানোর আগে ধমকে দেবে। নিজেদের খাওয়া জোটে না বলে পরের পোলাওয়ে ছাই দেওয়া!

'কোন্ মিনিস্ট্রি গেল আর কোন্ মিনিস্ট্রি এল তা নিয়ে তোদের মাথাব্যাথা কেন ?'

ঠিক ঠিক! কোনও মানে হয় ভাই দুটোর মিছিলে যাওয়ার ? পরের বার বোনটাকেও সাথী করার মতলব ভাঁজার ? মায়েরও তাতে সায় দেওয়ার ?

তোরা এখন স্টুডেণ্ট। দেশের ভবিষ্যৎ। চোখের সামনে যদি দেখিস সেই ভবিষ্যতের কেউ ওকম্ম করছে—ছাত্রানাং তবু অধ্যয়নং তপঃ। নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে পরের বর্তমানকে নয়ছয় করার কোন রাইট নেই। ভবিষ্যৎটা শতকরা পাঁচজনের হলেও নেই।

'অথচ বিভারা—এমন কাণ্ড করছে—যত্ত সব—!'

সত্যি! পূরবী, বিভা, ছুটির অন্ত নেই ন্যাকামির। কখনো গালে টোল খাওয়ায়, গাল কখনো জলে ভাসায়। দরদে গলা বুজিয়ে ফেলার খানিক পরেই খুশিতে শুরু করে পাল খাওয়া। এমন দিদি পেয়ে এমন ননদ পেয়েও ষোলআনা সাচ্চা হতে পারল না।

'কী হল—অমন করে কী দেখছ ?'

ভ্যাগ্যশ মাণ্টারি করতে এসে মেয়েটার প্রেমে পড়ে যায় !

পড়া নয়—ওঠা। প্রেমে পড়ে আছে মাভাইবোনের। ওই প্রেমের গাড্ডায় থেকে এই প্রেমের সিঁড়ি আঁকড়ে আছে। ওই প্রেমকে না তালাক ঠুকলে এই প্রেমের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যাবে না।

অথচ ওঠা দরকার। নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে ভাই দুটোর মিছিলে যাওয়ার মত নিজের ভবিষ্যৎ ভেবেই ওঠা দরকার।

'অ্যাই—!'

চুমো ছুঁড়ে মারতে গিয়ে প্রেমিকার আদুরে হুমকিতে প্রেমিক চমকে ওঠে। গলিতে অ্যামুনিশন বুটের কুচকাওয়াজ ! একেবারে জানালার পাশে ! ক হাত পরেই দরজা !

'ওই—ওই।'

'আসবে না।' মধুর হেসে আভা অভয় দেয়। 'এ বাড়িতে আসবে না। পাশের দুটো বাড়িতেও না। এরপর কেষ্ট দত্তর বাড়ি।'

'তুমি ঠিক জানো ?'

সবজান্তার সায় দিয়ে আভা বলে, 'মণ্টু বলে গেছে। মণ্টু নিজে ওদের লিষ্ট দিয়ে এসেছে।'

'মণ্টু ?'

'পাড়ার ছেলে, ভারি ভালো ছেলে।'

এই তবে সেই ? এরই কথা ভাবী শালাজশালীরা বলছিল ?

'বড্ড তোতলা—নইলে মণ্টু একদিন নেতা হতে পারত।'

এরই সাথে না হেসে কথা বলার অপরাধে ছুটিকে মারতে শুধু বাকি রেখেছিল ?

স্রেফ তোতলামির দরুণ মস্ত বড় নেতৃত্বটা যার ফসকে গেল—এ বাড়িতে ঢোকা না তার বারণ হয়ে গিয়েছিল ?

কেষ্ট দত্ত লোকটা ইনোসেণ্ট কিন্তু ওর এক ভাগনে বি-কম পাশ করেও বেকার,—তবু তার লজ্জা নেই—লাল ঝাণ্ডা করে বেড়ায়।'

কী অন্যায় ! বেকার মানযে কোথায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়বে, তা নয় ঝাণ্ডাবাজি।

'ওর জন্যে কেষ্টবাবুকে—'

'কিন্তু ইনোসেণ্ট হওয়া সত্ত্বেও—'

'দরকার। কিছু টেরোরাইজ করা দরকার। কেষ্টবাবু কেন ভাগনেকে বাড়িতে—'

'কিন্তু—'

'কোন কিন্তু নেই। ইট মারলে পাটকেল খেতে হয় জানা কথা। সবাই এক্সেস এক্সেস করছে—হবেই তো এক্সেস। চিরকাল হয়ে এসেছে। ব্রিটিশ আমলে হয়নি ?'

সেই ট্রাডিশন তবে সমানে চলছে ? গলা বাজিয়ে বলতেও আপত্তি নেই ?

কিন্তু ধরো, এরা যদি রাইফেল হাতে রুখে দাঁড়ায় ? চোখের বদলে চোখ খুবলে নেওয়ার সাথে সাথে জিভও টেনে ছেঁড়ে ? পেটে রাইফেলের কুঁদোর গোঁত্তা খেলে বেয়োনেটে পেট এ-ফোঁড় ওফোঁড় করে উঁচিয়ে ধরে ?

তখন যুদ্ধবিরতি। আয় বাবা বলে তখন শান্তি বৈঠক।

রাজেন উঠে দাঁড়ায়। এখুনি শোনা যাবে কেষ্ট দত্তর দরজায় লাথির শব্দ। ডাকাত-পড়ার মড়াকান্না। জিনিসপত্র আছড়ে আছড়ে ভাঙার আওয়াজ। সব ছাপিয়ে কেষ্ট দত্তর আর্তনাদ। ইনোসেণ্ট কেষ্ট দত্তর !

এক্সেস তো হবেই। ব্রিটিশ আমলে হয়েছে এখন হবে না !

রাজভোগটা তুলে নিয়ে প্রেমিকার পাশে এসে বসে। একহাতে ঘাড় পেঁচিয়ে আরেক হাতে রাজভোগ খাওয়াতে যায়।

'আমি মিষ্টি খাই ?'

তাইত ! সঙ্গে সঙ্গে রাজভোগটা নিজের মুখে পাচার করে দেয়।

'বাঃ বেশ লোক ! তুমি খাইয়ে দিলে খেতাম না ?'

প্রেমিকার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে। কী সুবাস ! পোলাও রাঁধতে গিয়ে ঠোঁটে যেমন লিপস্টিক লেগে গেছে, গালে তেমনি স্নো-পাউডার, শাড়ি-ব্লাউজ আতর-এসেন্স। মধুগন্ধেভরা !

তবু আপসোস হয় রাজভোগটা নিজে খেলেও রসটা যদি প্রেমিকার ঠোঁটে মাখিয়ে নিত ! রাজভোগ নিংড়ে দুগাল যদি রসিয়ে নিত !

'দরজা খোলা—!'

‘ওরা নিচে নামবে না—যা ভীতু !’

‘তা যা বলেছ—অ্যাই—অ্যাই— !’

চটপট ব্লাউজ খুলতে গিয়ে বোতামগুলি ছিঁড়ে ফেলে পটাপট।

‘কী করলে বলো দেখি! তুমি-না—ওঁক! ওঁক! ওঁক!’ দু হাঁটু আঁকড়ে আভা উবু হয়ে পড়ে। ‘কী মতলব বলো দেখি? আজ তোমার কী হয়েছে? এমন তো তুমি—সরো, সরে বসো—’

‘নিজেই তবে খোল।’

‘মানে?’ রাজেনকে ঠেলে ফেলে আভা উঠে দাঁড়ায়।

রাজেনও ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার ধরে।

‘আমি চিৎকার করব। চিৎকার করব কিন্তু। চিৎকার করব।’

চিৎকার! ঘণ্টা দুই ধরে অনেকেই তো করল চিৎকার! পাড়া জাগিয়ে করল! প্রাণপণে আভা ঘুষি চালায় লাথি চালায়।

ঘুষি লাথি! চল্লিশ ছাতি তেত্রিশের তাগড়া এক জোয়ানের সাথে ফুলটুসি এক যুবতীর ঘুষি লাথির পাল্লা! মাঝখান থেকে শাড়ি-শায়া হয় ফালাফালা।

‘ইউ ব্রুট—!’

‘ইউ ডার্লিং!’

গাল কামড়ে ধরে প্রেমিকাকে প্রেমিক মেঝেয় পেড়ে ফেলে।

একসেস হয়ে যাচ্ছে? হবেই তো একসেস।

মুরারির মনোকষ্ট

'টাকাটার কথা তুই ভুলেই গিয়েছিলি, না ?'

'হেঁঃ!' ভুলে গিয়েছিল ? মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলে-রোজগার-করা কড়কড়ে তিরিশটা টাকা গায়েব হয়ে গেলে যায় ভোলা ? মরা ছেলের মতই মাঝে-মাঝে উথলে ওঠে না গায়েব সেই টাকার শোক ?

'আমি কিন্তু ভুলিনিরে।'

'হেঁঃ!' সাধ জাগে না হকের পাওনা আদায়ের জন্যে বেপরোয়া হয়ে যায় ? বেপরোয়া হয়ে গিয়ে দেনাদারের জামাকাপড় খুলে নিয়ে দুহাতে আণ্ডারওয়্যার ফালাফালা করে চৌরঙ্গির মোড়ে ?

'অবিশ্যি ভোলা কিছু অসম্ভব না।'

'হেঁঃ!' হায়! ভুলতে তবু হয়েছিল। ভুলতে হয়েছিল অকথ্য আপসোসের চাপে। আপসোস নিজের আহাম্মুকির জন্যে: হায় হায়, বন্ধুকে ধার দেওয়াটা এড়িয়ে যদি যেত! বন্ধুর ছাঁটাই হওয়ার শোকে তাহলে কেঁদে ভাসিয়ে টেক্কা দিতে পারত সবার ওপর।

'নে।' সুধাময় গুণে গুণে দশ টাকার তিনটে নোট এগিয়ে দেয়।

এবং অতক্ষণ হেঁঃ হেঁঃ করে নাকি-সায় দিয়ে দেখনহাসিটা বজায় রাখলেও সুধাময়ের জলজ্যান্ত মহত্ত্বে এখন মরমে মরে যায় মুরারি। প্রায় চোখ বুজে হাত বাড়ায়। নোট তিনটি কোনমতে পকেটে গুঁজে ফেলে রেহাই পায় যেন।

'আয়।' সিগারেট কেস সুধাময় খুলে ধরে।

হাত বাড়াতে হয় আরেক দফা।

সুধাময় লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে দেয়।

দামী সিগারেট! নাকেমুখে মুরারি ধোঁয়া ছাড়ে, সুধাময় টাকা বের করার সাথে সাথে ভাগ্যেশ বিড়ির কৌটো বের করেনি! হাতেনাতে প্রতিদান দেওয়ার মোহে ফাঁসেনি!

প্রতিদান তবু দেওয়া দরকার। তিরিশটা টাকা

মুরারি দেয় চায়ের অর্ডার। চায়ের সাথে টোস্ট। অর্ডিনারি নয়, মোগলাই।

'না না, দেরি হয়ে যাবে।' সুধাময় বাধা দেয়। 'আমি এক্ষুনি উঠব।'

মুরারি বলে, 'যাবে আর আসবে। বোস না, এ্যাদ্দিন পরে দেখা—তাড়াতাড়ি আসিস হারু।'

'আপনার তরেও—?'

'আনিস।'

পয়সার জন্যে হারু এগিয়ে আসছিল, চোখ টিপে মুরারি ভাগায়।

চোখ-টেপাটা সুধাময়ের নজরে পড়ে গেল? গেলে আর কী করা! পকেটে পড়ে আছে তেরটা নয়া পয়সা।

চা-মোগলাই টোস্টের দাম দিতে হলে সুধাময়েরই একটি নোট এখন বের করে দিতে হয়। সুধাময় টাকা দিয়েছে বলেই সুধাময়কে খাওয়াচ্ছে যদিও, তবু সুধাময়কে দেখিয়ে সুধাময়ের টাকায় সুধাময়কে আপ্যায়ন করার চেয়ে তার ইশারাটা সুধাময়ের নজরে পড়ে যেতে দেওয়া কি কম মানহানিকর নয়?

'তুই রোগা হয়ে গেছিস।'

হেঁ!' মুরারির রোগা হয়ে যাওয়াটা যেন একটা খবর! আজ সকালেই যে দিব্যি করেছে জীবনে আর দাঁতে কুটোটি না কেটে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফৌত হয়ে যাবে তার রোগা হয়ে যাওয়া!

'বাড়ির খবরাখবর ভালো?'

'এই।' নিকুচি করেছে বাড়ির!

কাজের চাপে দিব্যিটা কোণঠাসা হয়ে থাকলেও মোগলাই টোস্টে কামড় দিচ্ছে ভেবেই মুরারির পেটে এখন পাক দেয়। জলে মুখ টইটুম্বুর।

মুরারি তাই মতলব ভাঁজে—বন্ধুকে সী-অফ করতে রাস্তা অবধি তো যেতে হবে, যাওয়া উচিত, ফেরার পথে রেস্তরাঁয় ঢুকবে। চপ-কাটলেট-কোর্মা-কারি যা প্রাণ চায় যত পেট চায় ওড়াবে।

তিরিশটা টাকাই ওড়াবে। পড়ে-পাওয়া এই তিরিশটা টাকা। মুরারি ঘন ঘন থুতু গেলে।

পড়ে-পাওয়া ছাড়া কী ? এ-টাকার আশা না ছেড়েই দিয়েছিল ?

এবং দুটো টাকার জন্যেই না আজ সকালে অমন কাণ্ড হয়ে গেল ? যার জের ওই দিব্যি ?

সুতরাং শুধু পড়ে পাওয়া নয়, এ-টাকা ভগবানের দান। ছপ্পড় ফুঁড়ে দান যাকে বলে।

'বউ ভালো আছে ?'

'আছে !' লীলার মুখখানা মনে হতেই গা মুরারির গুলিয়ে ওঠে : বউ ! স্বামীর জীবন অতিষ্ঠ করতেই না বউরা এসে জোটে !

'ছেলেমেয়ে ?'

'এই !' গা মুরারির রী রী করে : ছেলেমেয়ে ! বাপকে অপদার্থ প্রমাণ করতেই না ছেলেমেয়েরা জন্মায় !

'কতদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই !'

'হেঁঃ ! ভগবান রক্ষে করেছেন ! হাড়গিলে ওই কুঁদুলে মেয়েমানুষটাকে আর বয়ে-যাওয়ার-দাখিল ওই হাভাতেগুলোকে নিজের বিয়ে-করা বউ নিজের তৈরি-করা ছেলেমেয়ে বলে লোকের সামনে যায় বের করা ?

'বছর দশেক হতে চলল, না ?'

'তা—।'

'আমি তোর খবরাখবর রাখি কিন্তু।'

'হেঃ !' কথার শেষে কিন্তু ! সুধাময় নির্ভেজাল মহৎ।

যেচে এসে দশ বছরের ধার শোধ করল, নামী সিগারেট খাওয়াল, বউ-ছেলেমেয়ের কুশল জেনে নিল, দেখাসাক্ষাৎ না হলেও যে খবরাখবর রাখত মুখ ফুটে জানিয়েও দিল—মহত্তের আর কত প্রমাণ চাই ?

আর মুরারি কিনা পাছে টাকার শোকে বন্ধুকে বেইজ্জত করতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে, ছাঁটাই হওয়ার পর বন্ধুর সাথে তাই দেখাই করেনি ! টাকার শোক ভোলার জন্যে মন থেকে বন্ধুকেই খারিজ করে দিয়েছে !

এমনই বেমালুম খারিজ যে টাকা পাওয়ার পরও খেয়াল হয়নি ওর সংসারের ভালোমন্দ জানতে চাওয়াটাও তার কর্তব্য ! ওরও বউ ইত্যাদি

আছে। বন্ধু হিসেবে বন্ধুর বউ ইত্যাদির ভালোমন্দ সম্বন্ধে কৌতুহল জাগানোটা নিতান্তই জরুরী নয়?

'এক সেকেন্ড!' হঠাৎ লেজারে মুরারি ঝুঁকে পড়ে। মুখে বিড়বিড় করে, এদিক-সেদিক মাথা নাড়ে, দাবার চালের হিসেব করার মত ফিগারের ওপর আঙুল বুলোয়, তারপর ফটাশ করে খাতা বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে রেখে মুখ তোলে মিনিট পাঁচেক পরে—সুধাময় উশখুশ করতে শুরু করেছে বুঝে।

'একটা অ্যাকাউন্ট নিয়ে এমন মুশকিলে পড়েছি না!' অর্শরোগীর মতো মুখ করে বন্ধুর দিকে তাকায়: বন্ধু বুঝুক, বন্ধুকৃত্যে ভুলচুক হয়ে গেছে কেন। 'তারপর—তুই এখন কোন্ অপিশে?'

'অপিশ! কোন্ অপিশ আমায় নেবে বল?'

'তা বটে। সুধাময়ের খেদে যুক্তি আছে। কিন্তু যুক্তি তো ওর বেশবাস দেখে বেকার না ভাবার পক্ষে মুরারিরও আছে? 'তাহলে—?

'এই বিজনেসের মত আর কি—।'

'বিজনেস? বাঃ! রোলিং মনে হচ্ছে।'

'তা তোর মা-বাবার আশীর্বাদে—।' সুধাময় হাসে।

হাসিটা সুধাময়ের অবিশ্যি খুবই সলজ্জ, কিন্তু সেই হাসির দোলতে তার সোনা-বাঁধানো দাঁতটি দেখেই বুকটা মুরারির চড়চড় করে: নিজের ছেলের ঘাড়ে সংসারের তাবৎ বোঝা-চাপিয়ে তার মা-বাবা আশীর্বাদ করে গেছে পরের ছেলেকে? চাকরি না করেও এমন হাসিমুখে বেঁচে থাকার আশীর্বাদ?

এত পরোপকারী তার মা-বাবা! এমন বিশ্বাসঘাতক পরোপকারী!

'তুই তো সেই তারক নন্দী লেনেই—?'

'হ্যাঁ। তুই? নারকেলডাঙ্গাতেই—?'

'নারে। ঘরের অভাব—'

'আ!' ঘরের অভাবে লোকে বাড়ি বদলায়? তাও সুধাময়ের ছিল তিন-তিনখানা ঘরের আস্ত বাড়ি। বোমার হিড়িকে ওর বাপের ভাড়া-নেওয়া বাড়ি। আর চার ভাড়াটের বাড়িতে দেড়খানা ঘরের বাসিন্দা মুরারী—না: বাহাদুরি আছে। দরকারমত বাড়িবদল কম বাহাদুরি!

সুধীরের বিয়ে হল কিনা।

'সুধীরের বিয়ে? সেই সুধীর! অ্যাঁ! সে কী!'

'মার শখ।'

'মাসিমার শখ? বেশ বেশ!'

সত্যিই অন্ত নেই বাহাদুরির! কত আর বয়েস হবে সুধীরের? বড়জোর বাইশ। বাইশবছরে ভাইটাকে দাদা বউ জুটিয়ে দিয়েছে। মার শখ যে! আর মুরারির তেইশ বছরের বোনটাকে আজও বরের অভাবে এর ওর সাথে ফাণ্টিনাঁটি করে কাটাতে হচ্ছে!

'তাছাড়া মারও ওই বাড়িটা সহ্য হচ্ছিল না।'

'মাসিমা ভালো আছে?'

'কলকাতার ক্লাইমেটই সহ্য হচ্ছিল না। তাই ডাক্তারের অ্যাডভাইসে কাশীতে পাঠিয়েছি। পুণ্যও হচ্ছে, বাতের ব্যাথাটাও কমেছে! বলতে নেই—

শরীরটাও দিব্যি—!

শুধু মাতৃভক্ত নয়, ডাক্তারবাধ্যও!

সুবোধ বালকের মত কেমন ডাক্তারের অ্যাডভাইস শুনেছে। আর লীলাকে মাসদুয়েক একটা টনিক খাওয়াবার জন্যে বলে-বলে হয়রান হয়ে যদু ডাক্তার শেষ অবধি ধমক দিয়েছে, মুরারি পাত্তাও দেয় নি।

'আমি মাঝে মাঝে কাশী যাই। এই তো অপর্ণা সেদিন—'

'তোর বউয়ের সেই কলিক পেনটা?'

'তোর মনেও থাকে।'

'বাঃ, তোর বউয়ের অমন কলিক পেন—?'

মুচকি হেসে সুধাময় শুধায়, 'কিন্তু কেন ওই পেন হত, মনে নেই?'

প্রাণপণে চোখমুখ কুঁচকেও মুরারি কোনটার হদিস পায় না। মুখখানাকে অগত্যা আহাম্মকের একশেষ করে তোলে।

'পরপর দুবছর জোড়ায় জোড়ায়, তারপর তিন বছরে তিনটি—ওই পেন আর থাকে!'

'সাতটি? সেভেন?'

'বউকে বলেছি, ফের যদি পেন ওঠে—।' মুখ এগিয়ে সুধারাম গুহ্য তথ্য জানায়।

এবার মুরারীর মনে পড়ে বটে, জানে।

ঈস! সময় মত যদি তার মনে পড়ত এই জানাটা! দেখে নিত লীলাকে এক হাত। সুধাময়ের বউয়ের মত গলা-কাটা ছাগল হয়ে দাপাত—চোখ ভরে দেখত!

সেজন্যে তাকে বেজায়গায় যেতে হত। যেত, লীলা তো জব্দ হত?

মুরারির ছেলেমেয়েগুলিকেই সাক্ষী মেনে মুরারী যে একটা অপদার্থের ঢিবি, আর পাঁচটা স্বামীর তুলনায় অকর্মার ধাড়ী—যখন-তখন পাড়া-জাগিয়ে জানান দেওয়ার গোড়া তো মেরে দিতে পারত?

'তোর কটি?'

'জানি না।'

বলেই মুরারি ভুল বোঝে।

সংগে সংগে এও বোঝে যে কথাটা সুধাময়ের কানে যায়নি। কেননা প্রশ্নটা করেই সে নতুন সাহেবের বেয়ারাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে! 'আজ চলিরে। ভীষণ তাড়াতাড়ি আছে! পরে একদিন—বাই বাই!' হাঁটা সুরু করে দিয়েছে।

ভুলটা মুরারি তাই ভেঙে দেয় না।

এবং চা মোগলাই টোস্টের কথা মনে করিয়ে দিতেও ভুলে যায়।

মেজাজ বিগড়ে গেছে।

বস্তুত মেজাজটা মুরারীর আজ সকাল থেকেই বেগড়ানো।

এখন বিগড়ে গেছে বন্ধুকে দেখে। যেচে এসে দশ বছরের বকেয়া শুধলেও এ-বন্ধু যে আর সে-বন্ধু নেই সেটা বুঝতে পারা মাত্র মেজাজ বেগড়াতে শুরু করে। ধাপে ধাপে তার ষোলকলা পূর্ণ হয়।

সকালে বেগড়ানোর কারণ দুটো টাকা। নয়া পয়সার হিসেব কষে যাকে চলতে হয় দুটো টাকা তার কাছে ফ্যালনা?

টাকা পয়সাকে নিশ্চয় লীলা খোলামকুচি ভাবে। তাই বেহিসেবীর মত খরচ করে। যেখানে-সেখানে ফেলে রেখে হারিয়ে যেতে দেয়। আজ ধরা পড়ে গেল।

এমন কত টাকা হারিয়েছে কে জানে! জিনিসপত্রের দাম বাড়ার দোহাই পেড়ে সেই সব হারানো চেপে গেছে নির্ঘাত।

সাধেই চারদিকে ধারদেনা।

গিন্নি এমন উড়নচণ্ডী হলে সংসারের লক্ষ্মী থাকে!

বউ নয়, শত্রু। রাক্ষুসে শত্রু। মুরারির হাড় খেয়েছে মাংস খেয়েছে —চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবার তালে আছে। একা পাছে না সুবিধে করতে পারে, পেট থেকে কয়েকটাকে বার করে নিয়েছে। তালিম দিয়ে দিয়ে শাকরেদ বানিয়ে নিয়েছে।

এটা ভেঙে ওটা ফেলে গলা চিরে ঘরময় দাপাদাপি শুরু করেছিল: আসুক লীলা, আসুক, সামনে এসে একটা কথা বলুক—এক হাতে চুলের মুঠি ধরে আর-এক হাতে চড় হাঁকাবে। কেউ বাধা দিতে এলে দমাদ্দম লাথি।

স্যাকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা! উঠতে-বসতে তাকে না বড্ড কথা শোনায়? কাল রাতেও না এক কাহন শুনিয়েছে? আজ মুরারি মওকা পেয়েছে। হাতেনাতে চোর-ধরার মওকা।

লীলা হেঁসেল থেকে বেরোয়নি।

টুঁ শব্দও করেনি।

একেই চেঁচামেচি-দাপাদাপিতে ক্লান্তি, তার ওপর এমন মোক্ষম সুযোগ পেয়েও বউকে পেটার সাধ না মেটার দারুণ হতাশা—মুরারি ফোঁপানো শুরু করে দিয়েছিল।

লীলার কান্নাটা সকলের গা-সহা হয়ে গেছে, কিন্তু তার কান্নায় যদি যতীন মন্মথরা দরদ দেখাতে গুষ্টিসমেত ছুটে আসে? জামাকাপড় পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল।

পথে পথে কেঁদে-বেড়ানো ভদ্রলোকের সাজে না! মুরারি তাই ভাবছে। দশটায় অপিশে পোঁছতে হলে যতখানি রাস্তা টহল দেওয়া দরকার ভাবতে ভাবতে দিয়েছে।

ভেবে সিদ্ধান্তে পোঁছেছে—বেঁচে থাকা তার পক্ষে নিরর্থক। কার পেন না বাঁচবে? সংসারে তার আপন কে যে মুখে রক্ত তুলে বাঁচবে?

তার সুখ-দুঃখ সুবিধে-অসুবিধে কেউ বোঝে না। কেউ, না কেউ না!

অতএব মরাই ভালো।

সেক্রেটারিয়েট থেকে লাফ মেরে ধাঁ করে মরে গিয়ে খবরের কাগজে নাম ছাপাতে পারে বটে—কিন্তু সে-মরা কাপুরুষের মরা। তারিয়ে তারিয়ে মরার হিম্মৎ যাদের নেই তারাই মরে ওভাবে।

মুরারি মরবে বীরের মত। যতীন দাস-ম্যাকসুইনীর মত। না খেয়ে তিলে তিলে নিজে মরবে, বউছেলেমেয়েকে দগ্ধে দগ্ধে মারবে। ওদের দগ্ধে দগ্ধে মারাটা চাখতে চাখতে মরবে।

কিন্তু প্রাণটা ওদের দগ্ধাবে কি? মুরারির জন্যে প্রাণের টান ওদের আদৌ আছে কি? থাকলে, মুরারিকে মরতে হয় কেন?

না থাকুক প্রাণের টান—লোকান্তরে মুরারি পাড়ি দিলে ওদের যে স্রেফ পথে দাঁড়াতে হবে, ডাস্টবিন হাতড়ে খাওয়া জোটাতে হবে—সেই বোধটাও জাগবে না কি? জাগলে, পায়ে এসে সবাই কি হুমড়ি খেয়ে পড়বে না? মুরারি দয়া করুক, বেঁচে থাকুক, দয়া করে বেঁচে থাকুক, দয়া করে বেঁচে থাকুক—

মুরারির ধাঁধা লেগেছিল। এমন আবেদন ওরা জানাবে কি জানাবে না সেই নিয়ে ধাঁধা।

সুধাময় না-আসা পর্যন্ত লেজার খুলে সেই ধাঁধারই জবাব খুঁজছিল, সুধাময়ের কথাবার্তা শুনে চালচলন দেখে এখন পড়ে যায় আরেক ধাঁধায়।

তালগোল পাকিয়ে যায় দুই ধাঁধায়।

'এর নাম সুধাময়, না মুরারিদা?'

'হুম।'

'সুধাময় মজুমদার?'

'হুম।'

পরিতোষের দিকে ফিরে খগেন বলে, 'কেমন! বলেছিলুম কিনা?'

'সুধাময় মজুমদার আপনার ফ্রেণ্ড, মুরারিদা?' খগেনের ওপাশ থেকে ডিঙ্গি মেরে পরিতোষ জানতে চায়, 'তুই-তোকারির ফ্রেণ্ড?'

হতে পারে সুধা আজ নামজাদা, তাই বলে মুরারির বন্ধু হতে পারে না? মুরারি কি চিরকালই এমনি ছিল? মুরারি দু বছর কলেজে

পড়েনি? মুরারির কলেজের এক ফ্রেণ্ড আজ মন্ত্রী নয়? ভাবে কী ওরা মুরারিকে!

মুরারি চটেছিল, কিন্তু চটলে কথাটা চাপা পড়ে যায় দেখে সহজ ভাবে বলে, 'ছেলেবেলার ফ্রেণ্ড। হেণ্ডারসনে চাকরি করত। স্ট্রাইক করে—'

'স্ট্রাইক করেছিলেন? ইনি?'

'শুধু স্ট্রাইক!' অতীত সুধাময়ের কথা বলতে মুরারি আরাম পায়। ঘুরে বসে। 'স্ট্রাইক ফেল করতে সবাই চটপট বণ্ড লিখে দিল, ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট অব্দি, কিন্তু সেক্রেটারী সুধা—বলিনি তোদের সুধার কথা?' নিজের কোন বন্ধু বড় হয়েছে, বা সে যা করতে পারেনি পারে না পারবেও না তেমন কোন কাজ করেছে—বুক ফুলিয়ে সে-কথা মুরারি পাঁচজনকে বলেনি হতেই পারে না।

'ইনিই সেই—ম্যানেজিং ডিরেক্টার স্ট্রাইকারদের ব্লাডি বলতে ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে ইনি বাস্টার্ড বলেছিলেন?'

'ভীষণ স্পিরিটেড ছিল। গান্ধীফান্দির ধার ধারত না। নো অহিংসা। রেগুলার বিপ্লবী। পড়াশোনাও তেমনি। কার্ল মার্কস মুখস্ত।'

'বটে!'

'আচ্ছা!'

দুজনকেই ভড়কে যাওয়ার মত অবাক করতে পেরে মুরারি জবর উৎসাহ পায়।

'আমি না-হয় মালিকের পা-চাটা—আরে থাম থাম, তোরা না বললেও আড়ালে সবাই কী বলে আমি জানি—কিন্তু আমার ফ্রেণ্ডদের মধ্যে—'

বাধা দিয়ে পরিতোষ বলে, 'সুধাময় মজুমদারের মত ফ্রেণ্ড থাকতে আপনি এখানে পড়ে আছেন!'

'তা সত্যি মুরারিদা,' খগেন সায় দেয়, 'উনি হাত ঝাড়লেই আপনার-আমার পকেট ভর্তি। ভদ্রলোক যেমন রোজগার করেন, খরচও তেমনি। গত ইলেকশেনে শুনেছি সত্তর হাজার—'

'সুধা?' মুরারি আঁৎকে ওঠে।

'ওর অ্যাসিস্টেণ্টগিরি করে কেস্ট হালদার গাড়িবাড়ি করে ফেলল।'

মুরারি হাঁ।

'ওর ভাইয়ের বিয়েতে রাজ্যপাল অব্দি এসেছিলেন—'

'বলিস কি! তুই ঠিক জানিস ?'

'আমাদের পাড়ার লোক আমি জানি না! আর আমি কেন, সুধাময় মজুমদারকে ও-তল্লাটের কে না জানে। কংগ্রেসের চার আনার মেম্বার মাত্র, কিন্তু ওর কথায় ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসে ওঠে বসে।'

'সুধা কংগ্রেসী হয়েছে ?'

'না হলে', খগেন মিটিমিটি হাসে, 'পারমিট-কণ্ট্রাক্টের অমন কারবার—আমাদের নতুন সাহেব তো হর্দম সুধাবাবুর বাড়িতে যায়। এক গেলাশের ইয়ার নাকি।'

সুধা কংগ্রেসী হয়েছে! পারমিট-কণ্ট্রাক্টের কারবার করছে! কেরানীদের মানুষ বলেই ভাবে না যে নতুন সাহেব সুধা তার এক গেলাশের ইয়ার! মুরারি ঢোঁক গেলে।

ইউনিয়ন করে যে ছাঁটাই হয়েছে সে কোথায় পথে পথে ফ্যা ফ্যা করে মুরারিদের কাছে আদর্শের ঝাণ্ডা উঁচা রাখবে, রক্তের জোর থাকলে পুলিশের গুলি খেয়ে মুরারিদের শহীদ-বেদী বানাবার দাঁও দিয়ে যাবে—তা নয় সুধাময়—

সুধাময় একটা—সুধাময় একটা—

চটেই যাচ্ছিল, মোগলাই টোস্টের গন্ধ নাকে লাগায় মুরারির চটা আর হয়ে ওঠা হয় না। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে।

দুটি প্লেটই হারু মুরারির সামনে রাখে।

'চা হয়ে গেছে, আনছি। জল দেব ?'

মুরারি জবাব দেওয়ার ফুরসত পায় না।

দু কামড় খেয়েই খেয়াল হয় ডিমে ভাজা এমন গোটা বিশেক পিস রুটি সে এক্ষুনি পেটে পাচার করে দিতে পারে, দিতে প্রাণটা চাইছেও—কিন্তু একা দু প্লেটের খাবার খাওয়া দু কাপ চা খাওয়া কি বেমানান নয় ? খগেন পরিতোষ দেখছে বলে বেমানান নয় ?

'হারু।'

'আজ্ঞে ?'

'চা আনতে যাচ্ছিস ? তিনকাপ আনিস। আরও একটা মোগলাই টোস্ট। একটা নয়, দুটোই আনিস। এটা আবার ছাই এঁটো হয়ে গেল। ওদের জন্যে, বুঝলি ? তুই তো দরবেশ ভালোবাসিস, না ? খাস একটা। দুটোই খা। চা খাবি ? খাস। এই নে—' মুরারি দশ টাকার নোট বের করে দেয়। 'হিসেব বুঝে নিস কিন্তু। নয়া পয়সায় হিসেব করবি। আনি দুয়ানিতে করেছিস কি ওরা নির্ঘাত কটা পয়সা মেরে দেবে। ভালো কথা, সিগারেটও আনিস এক প্যাকেট। সবচেয়ে ভালো যেটা পাবি। বেস্ট কোয়ালিটি।'

হড়বড়িয়ে কথা বলে। পরিতোষ খগেনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে।

যে-মানুষ ঝালমুড়ি দিয়ে রোজ টিফিন সারে, ওষুধের মত টাইম ধরে বিড়ি খায়, এই বয়সে হাঁটাটা বড়ই স্বাস্থ্যকর অজুহাতে হেঁটে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এক পিঠের ভাড়া বাঁচায়—সে আজ সহকর্মীদের খাওয়াচ্ছে চা মোগলাই টোস্ট ! বেয়ারাকে দরবেশ ! আনতে দিয়েছে সবচেয়ে ভালো সিগারেট। বেস্ট কোয়ালিটি !

না তাকিয়েও মুরারি বোঝে খগেন-পরিতোষের দুজোড়া চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছে।

অবাক মুরারি নিজেও বড় কম না।

কেন এমন হল ? চক্ষুলজ্জা ?

ধরা গেল তাই। কিন্তু চোখ লজ্জা পেলেই তার মান রাখা যায় ? প্রেজেণ্ট দেওয়াটা এড়ানোর জন্যে বাইরে খাওয়া সহ্য হয় না বলে খগেনের বিয়েতে না গেলেও দিন সাতেক পরেই পরিতোষের বাপের শ্রাদ্ধে গোগ্রাসে গিলে আসেনি ?

তিরিশ টাকা ছপ্পর ফুঁড়ে না এলে এই চক্ষুলজ্জাকেই আজ দিত পাত্তা ?

সুধার জন্যেই কি চা-মোগলাই টোস্ট আনতে দিত ?

আসলে টাকা। চক্ষুলজ্জাকে লাই দেওয়ার মত টাকা।

সুধা একদিন বলত—টাকার অভাবই সবচেয়ে বড় অভাব। আর যত অশান্তির মূলে সেই অভাব। সে-অভাবে মানুষ নাকি অমানুষ হয়ে ওঠে। ঠিকই বলত।

টাকার অভাবে সুধাময়কে তো কম ঝামেলা পোয়াতে হয়নি।

মা মনে করত—নিজের মায়ের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। বলেই ছেলে তার দেশ-মাকে নিয়ে মেতেছে। বউয়ের নালিশ—সংসারে যদি মন না থাকে কী দরকার ছিল তার বিয়ে করার।

দুজনেরই অন্ত ছিল না অভিযোগের। উঠতে বসতে গঞ্জনা।

আর আজ? মাকে কাশীতে রেখে মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। বউকে সাতসাতটা ছেলেমেয়ের মা বানিয়ে তার কলিক পেন থামিয়ে দিয়েছে।

দশ বছর পরে যেচে এসে দেনা শোধ করে পুরনো বন্ধুত্বকে ঝালিয়ে তুলেছে।

টাকা আছে বলেই না?

টাকা রোজগারের উপায়টা বৈধ নয়? কী যায় আসে! মাতৃভক্তি পত্নীপ্রীতি বন্ধুবাৎসল্য তো তাই বলে মিথ্যে হয়ে যায়নি। এগুলির মধ্যে তো কোন খাদ নেই।

আড়ালে লোকে নিন্দে করে? বয়ে গেল! সংসারের সুখ শান্তিটা বজায় আছে। মায়ের স্নেহ বউয়ের ভালোবাসা ছেলেমেয়ের শ্রদ্ধাভক্তি পাচ্ছে। আড়ালে যারা নিন্দা করে সামনে তারাও পা চাটছে!

পাড়ায় সৎ লোক বলে বড়ই সুনাম মুরারির—আড়ালে সবাই নাকি তারিফ করে, কিন্তু সামনাসামনি চলে এড়িয়ে। কেন, তা কি আর মুরারি বোঝে না: পাছে ধারটার চেয়ে বসে। তার বউছেলেমেয়ে—

না, এখন আর বউছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ায় রক্ত মাথায় চড়ে যায় না, টাকার অভাবেই যে যত অশান্তির মূল। টাকার অভাবেই যে মানুষ অমানুষ হয়ে ওঠে। সুধার কথার এমন চৌকোশ প্রমাণের পর আর সন্দেহ কী যে লীলাকে যদি অভাব-অনটনের মধ্যে না থাকতে হত, লীলাও স্বামী-অন্ত প্রাণ হত।

চিরকাল তো লীলা এমন ছিল না।

পুরনো লীলার কথা ভাবো দেখি। মুরারির সামান্য সর্দিজ্বর হলে চোখে অন্ধকার দেখত। আফিস থেকে ফিরতে দেরি করলে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত। দুদিনের বেশি বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারত না।

লীলাকে জড়িয়ে না শ্বলে মুরারিরই কি ঘুম আসত !

আর এখন ? লীলা ফের পোয়াতী হয়েছে শুনে ভীষণ তাজ্জব হয়ে মুরারি ভাবতে বসে বউয়ের সাথে কবে শুয়েছিল !

অভাব ! অভাব ! অভাবের আগুনেই পারিবারিক সম্পর্কের সব রসকস শুকিয়ে গেছে ।

সুধার কথাগুলো কানে বাজে ।

অভাব মানুষকে ইতর করে । তাই না সকালে মুরারি অমন তুলকালাম কাণ্ড করে এল ! মাত্র দুটো টাকা হারিয়ে ফেলেছে বলে লীলাকে কী না বলেছে ! এক হাতে চুলের মুঠি ধরে আরেক হাতে চড় হাঁকাবার মহড়াও মনে মনে দিয়েছে । আর ঠাকুর দেখতে গিয়ে আড়াই ভরির হার খুইয়ে এলেও বউকে বকা দূরে থাক, প্রাণপণে সান্ত্বনা দিয়েও মন না মানায় পরের দিনই গুরুপদ তিন ভরির এক হার কিনে এনে বউয়ের মুখে হাসি ফোটায় ।

মুরারির কাছে দু টাকার দামই কয়েক ভরি সোনার চেয়ে দামী বলেই তো ?

সাতসকালে রাগারাগি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে যাতে রান্নার পাট এ-বেলা না হয় । মতলবটা দু টাকা উশুল করার, না খেয়ে মরার দিব্যিটা আসলে অজুহাত ।

খাবারের গন্ধেই যে হন্যে হয়ে ওঠে সে মরবে না খেয়ে !

নিজে তো খাসা ডবল মোগলাই টোস্ট সাবড়াল, ওদিকে সবাই হয়ত হরিমটর মেরে আছে । হয়ত কেন, আছেই । চাল ডাল বাড়ন্ত । মুদি আর ধার দেবে না । আনাজপাতিও নেই । ওই দু টাকায় এবেলা চালিয়ে অফিস থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ।

ভরা পেটে বউছেলেমেয়ের শুকনো মুখগুলি ভেবে মুরারির এখন অকথ্য গ্লানি জাগে ঃ এমন স্বার্থপর ! মতলববাজ এমন স্বার্থপর !

ইচ্ছে করে রাস্তার ধারে বসে গলায় আঙুল দিয়ে মোগলাই টোস্ট উগরে ফেলে নিজেকে বউছেলেমেয়েদের শামিল করে তোলে ।

কিন্তু বারোটায় খাওয়া টোস্ট বিকেল সাড়ে চারটেয় পেট থেকে বের করাটা সম্ভব নয় বলে মুরারি ভাঁজে অন্য মতলব । ত্রিশ টাকার মধ্যে

সাতাশ টাকা দু আনা আছে। সারা জীবনের অভাব এতে ঘোচে না, কিন্তু দুটো দিনের ? খুশীমত খরচ করে দুটো দিনের জন্যে তো সোনার সংসার কায়েম করা যায় ? সুধার মত ত্রিশ-চল্লিশ ক্যারেটের না হলেও তিন-চার ক্যারেটের সোনার সংসার ?

প্রথমে মুরারি ঠিক করে : এক হাতে আস্ত ইলিশ ঝুলিয়ে আরেক হাতে ভীম নাগের প্যাকেট পাকড়ে 'কইরে সবাই ! কোথায় গেলে গো !' বলতে বলতে এক গাল হেসে বাড়ি ঢুকবে। সকালের ব্যাপারটা কাউকে মনে করার ফুরসতই দেবে না।

আস্ত ইলিশ দেখতে বোন ও ছেলেমেয়েরা বাইরে যখন ব্যস্ত থাকবে, লীলাকে ইশারায় ঘরে ডেকে নিয়ে জড়িয়ে ধরবে, চুমোটুমো খাবে, মাপ চাইবে। দরকার হলে পায়ে ধরার পোজও করবে।

কিন্তু আস্ত ইলিশ আর ভীম নাগের সন্দেশ কি সকলের পছন্দ ? নান্তুটা জীবনে আস্ত ইলিশ দেখেনি বলে ও খুশী হবে, সন্দেশ পেলে গীতা—কিন্তু লীলা না মুড়িঘণ্ট ভালবাসে ? মণ্টু মাংস ? নীতা গলদা চিংড়ি ? ছোটকার বড় শখ একদিন রাবড়ি খায় ? বিয়ে না হওয়ার অপরাধে মাধুটা চোরের মত থাকে, দাদা-বৌদির কাছে মুখ ফুটে কখনো কিছু চায় না—দই-কই না ওর কাছে অমৃত ?

মুরারি তাই সিদ্ধান্ত নেয় : বাড়ি গিয়ে বউ ও বোনকে মশলা বাটতে বসিয়ে দিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাজার করতে বেরোবে—আস্ত ইলিশ, গলদা চিংড়ি, রুইয়ের মুড়ো, পাঁঠার সিনা, দই, রাবড়ি, চমচম, সন্দেশ—যার যা পছন্দ।

কিংবা ওরা যদি বলে—আজ সবাই মিলে রেস্তোরাঁয় খাব—তাই সই।

সেটা বরং একদিক দিয়ে ভালোই। লীলার হাঙ্গামা বাঁচবে। বিছানায় শুয়েই নাক ডাকাবে না। রেস্তোরাঁয় খেতে গেলে লীলাকে খানিক সাজগোজ করতে হবে। অনেকদিন পরে বউকে ফর্সা শাড়ি-ব্লাউজে দেখা যাবে। নতুন লাগবে।

তারপর, ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে, নিজের হাতে বউকে ফের সাজাবে, শুধু বডিজের ওপর প্যাঁচালো শাড়ি, মাধুর সেই বারো টাকার সিল্কের শাড়ি, গলায় গীতার হার, কানে মিতার ইয়ারিং, হাতে নীতার কাঁচের চুড়িগুলি।

কিন্তু লীলার বডিজটা কি খুঁজে পাওয়া যাবে ? মাধুর বডিজ হবে কি ? গীতার হার না হয় ট্রাংকে তোলা আছে, তাকে নীতার কাঁচের চুড়ি, কিন্তু কান থেকে ইয়ারিং খুলতে গেলে মিতা যদি জেগে যায় ?

তাছাড়া ওই তো একরত্তি ঘর। আলোও জ্বালা চলবে না। অন্ধকারে বউকে সাজিয়েই বা লাভ কি যদি না—

মুরারি ভোঁস করে শ্বাস ছাড়ে।

দরকার নেই রাতদুপুরে বউকে সাজানোর অত ভজকটর। আসলে মন, মনের জোর থাকলে এই লীলাকেই ফুলশয্যার রাতের লীলা কল্পনা করতে পার। মনের জোর আরও জোরালো করলে সুচিত্রা সেনও ভাবতে পার। মনের অসাধ্য কী! যে-মন অভাবে বিষিয়ে যায়, অভাবের অভাবে চাঁতিয়ে ওঠে।

পেচ্ছাব করতে করতে মুরারির যেন আর তর সয় না। কতক্ষণে কতক্ষণে বাড়িতে গিয়ে পোঁছবে। দুহাতে গীতা-নীতাদের জড়িয়ে ধরে আছে—সামনে দাঁড়ানো লীলা আর মাধুর দিকে চেয়ে হাসছে, আর-আর ভাড়াটেরা মুগ্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখছে—কতক্ষণে কতক্ষণে কতক্ষণে।

দরকারের সময়ে পেচ্ছাবটা ছাই এত দেরি হয় শেষ হতে!

হায় মুরারি!

সদর থেকে সে 'কইরে সবাই! কোথায় গেলে গো!' বলে হাঁক দেবে কি, দেখে রাস্তায় তার ছেলেমেয়েগুলি আগেভাগে এসে দাঁড়িয়ে আছে। মুরারিকে দেখা-মাত্র সবাই 'বাবা বাবা' করে দুড়দাড় ছুটে আসে।

'পাওয়া গেছে!'

'পাওয়া গেছে।'

'পাওয়া গেছে।'

'কী ?'

'নোটটা।'

'সেই নোটটা বাবা।'

'সেই দু টাকার নোটটা বাবা।'

'মা সেটা তাকে—'

'তাকে কাগজের তলায় রেখেছিল '

'আমি খুঁজে পেয়েছি বাবা।'

'না বাবা আমি—'

'সেই টাকা দিয়ে আমি বাজার করেছি। বাবা।'

'খিচুড়ি আর আলুভাজা—'

'তোমারটা মা আলাদা করে রেখে দিয়েছে বাবা।'

একে একে মুরারি তাকায় সকলের মুখের দিকে।

সাড়া পেয়ে লীলাও এসে দরজায় দাঁড়ায়। মুখে তার ঠোঁট-টেপা হাসি।

তড়াক করে মুরারির মাথায় রক্ত উঠে যায়, জমাট বাঁধে দুই চোয়াল : এমন জব্দ করল! নিজের বিয়ে-করা বউ নিজের পয়দা-করা ছেলেমেয়ে সাধআহ্লাদকে এভাবে বেইজ্জত করল!

দুটো দিনের জন্যেও তাকে সোনার সংসার গড়তে দিল না!

অমানুষিক আক্রোশে মুরারি দাঁতে দাঁত শানু দেয়। প্রাণ চায় টপাটপ ঘাড় থেকে ছেলেমেয়েদের মুণ্ডুগুলো টেনে ছিঁড়ে নেয়, নিয়ে দুহাতে লোফালুফি করে।

মুণ্ডু-লোফালুফি দেখতে ভিড় জমে গেলে চুলের মুঠো ধরে দরজা থেকে ওই মাগীটাকে রাস্তায় নামিয়ে আনে, এনে সকালের বকেয়া সাধটা মেটায়।

তারপর যায় সুধার বাড়ি। গিয়ে তার পশ্চাৎদেশে একটি চল্লিশ কিলোর একখানা লাথি হাঁকিয়ে আসে।

কিন্তু বাস্তবে এর একটাও সম্ভব নয় বলে মুরারি কেবল দাঁত ক্যালায়।

অর্থাৎ হাসে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত

—কী দেখলাম? চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শওকত বলে, দেখলাম, ঘরগুলি সব খাঁ খাঁ করছে, আর, একটি ঘরে—

কী একটি ঘরে কী?

চাপ চাপ রক্তের দাগ।

প্রাণপণে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে লীলা।

অথচ আগের দিনও অভয় দিয়েছিলাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চা জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁ কাকু, মোছলমানে আমাগো কাইটা ফ্যালাইব?' তার গাল টিপে দিয়ে বলেছিলাম, 'দূর পাগল! আমিও তো মোছলমান রে!'

সিগারেটটা শওকত চোখের সামনে তুলে ধরে। অপলক চেয়ে থাকে। সিগারেটের অবিরাম পুড়ে যাওয়া দেখে।

বারেক তাই দেখে লীলা চোখ নামিয়ে নেয়। ঘাসের শিস দাঁতে কাটে।

আর ভাবে, কেন একথা তুলতে গেলাম?

কেন! খুনখারাপীর গল্প শোনার জন্যেই কি ঢাকা থেকে ওকে আসতে বলেছিল?

মিছে তুমি কষ্ট পাচ্ছ। দেশসুদ্ধ মানুষ যখন ক্ষেপে যায়—

কথা বলতে বলতে লীলার খেয়াল হয়, গলা দিয়ে তার আওয়াজ বেরোচ্ছে না। দুই ঠোঁট শুধু থরথর করছে।

লীলা গা ঝাড়া দিয়ে বসে। সশব্দে কেশে নিজের অস্তিত্বটা যাচাই করে নেয়।

তারপর বলে, এতো শুধু ওখানে নয়, এখানেও হয়েছে। আমাদের পাড়ার পাণ্ডা ছিলেন এক সায়েন্সের প্রফেসার। নিজের হাতে তিনি পাড়ার ছেলেদের বোমা তৈরি শিখিয়েছেন। পাড়ার আট-দশটা মুসলমান ফ্যামিলি—

কথাটা ঠিক নয়। আসলে লীলাদের পাড়ায় কোনও গোলমাল হয়নি। পাড়ার মুসলমান বলতে ছিল এক শালওয়ালা। বিপদের সময় লীলাদের বাড়িতেই সে আশ্রয় নেয়। পাড়ার ছেলেরা তাতে আপত্তি করা দূরে থাক—দল বেঁধে তারা গিয়েছিল বস্তি-এলাকায় দাঙ্গা রুখতে।

কিন্তু, লীলাদের পাড়ায় না হলেও দাঙ্গা তো হয়েছে কলকাতায়? কোথায় যেন এক সায়েন্সের প্রফেসার ছেলেদের বোমা তৈরি করাও শিখিয়েছে?

সুতরাং ওখানকার কথা ভেবে মন খারাপ করা কেন? দাঙ্গা দুপক্ষই করেছে। দুপক্ষরই সমান দোষ। শোধবোধ হয়ে গেছে। ব্যস!

সে যে কী ভীষণ অবস্থা—

বাধা দিয়ে শওকত বলে, বর্বরতা এখানেও কম হয়নি, জানি—

তবে?

তবে কেন আমি হিন্দুদের গাল দিতে পারিনে? কেন আমার কেবলি মনে হয়—ওখানে যারা আগুন জ্বালিয়েছে, মানুষ খুন করেছে, আমি তাদেরই একজন? আমি মুসলমান!

শওকত!

লীলা, জীবনে কোনদিন আমি নামাজ পড়িনি। রোজা রাখিনি। ধর্মের ধার ধারিনে। তবু কেন—

করুণ জিজ্ঞাসায় চোখজোড়া শওকতের টলমল করে।

লীলা এর কী জবাব দেবে? এ এক অস্বস্তিকর জিজ্ঞাসা। কেননা তারও যে এখন এখানকার হিন্দুদের কথাই কেবল মনে পড়ছে। এখানে যারা আগুন জ্বালিয়েছে, মানুষ খুন করেছে—সে তাদেরই একজন। সে হিন্দু—এই বোধটাই অকথ্য গ্লানির বোঝা হয়ে মনের ওপর চেপে বসেছে। কেন?

শওকত পাশে বসে আছে বলে?

তাই।

নইলে আজ সকালেও খবরের কাগজ খুলে চমকে উঠেছিল। অবিকল রোজকার মতই।

কী শুরু হয়েছে মিলিটারি অপারেশনের নামে ! পড়লেও গা শিউরে ওঠে। ওরা কি মানুষ !—

ঃ ভুল করছিস দিদি। লোচ্চা গুণ্ডা বদমাসের মত মিলিটারিরও কোন জাত নেই—

ঃ তাই বলে শুধু হিন্দু বাড়ি দেখে দেখে—

ঃ কে বললে শুধু হিন্দু বাড়ি দেখে দেখে ? খবরের কাগজ ? তাহলে পাকিস্তানী কাগজও পড়ে দেখ, দেখবি, অত্যাচার যা হবার হচ্ছে মুসলমানদের ওপর। হিন্দুরা আছে তোফা আরামে।

ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক করেনি। তর্কে ললিতের সঙ্গে পারবে না। কিন্তু তর্কে হেরে গেলেও কি মন মানে ? আপন মনে তাই গজগজ করছিল।

গজগজ করছিল ললিতও ; খবরের কাগজ—ন্যাশন্যালিস্ট পেপার ! পাকিস্তানের হিন্দুদের জন্যে দরদ ব্যাটাদের উথলে ওঠে ! কিন্তু এদেশে হিন্দুদের হাতে হিন্দু যখন মার খায় ? হারামজাদা !

হয়ত কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে ললিতের। দিন সাতেক হাসপাতাল এবং মাসখানেক হাজতে কাটিয়ে যে ছাঁটাই হয়ে ওকে আসতে হয়েছে—এর জন্যে অনেকখানি দায়ী ওই খবরের কাগজ। মালিক পক্ষের স্টেটমেণ্ট ওরা ফলাও করে ছাপে। লাঠিচার্জের খবর বেমালুম চেপে যায়। খবরের কাগজের ওপর ললিতের তাই বড় রাগ। ললিতের ধারণা—কাগজগুলো পিছে না লাগলে স্ট্রাইকে ওরা জিতে যেত।

তবু লীলা সায় দিতে পারেনি। ধরা যাক—ললিতের কথা ঠিক—কাগজগুলো সত্যিই একপেশে। অত্যাচার মুসলমান মেয়েদের ওপরেও হচ্ছে। ঢাকায় দিনদুপুরে সদর রাস্তা থেকে মুসলমান ছাত্রীকে জোর করে ট্রাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। করাচীতে গুণ্ডারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রকাশ্য রাজপথে মুসলমান মেয়েদের বেইজ্জত করে চলেছে।

ভাবো দেখি কী ভয়নক কাণ্ড ! অপিসেও আজ ওই নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।

ঃ আসলে জাতের দোষ। ওই জাতটাই—

ঃ যা বলেছিস। দীপ্তির কথায় সায় দেয় সুলেখা, মেয়েদের সম্মান দিতে ওরা জানে না।

ঃ মেয়েদের ওরা শুধু এক ভাবেই দেখে।

ঃ মেয়ে দেখলেই ওদের জিভে লালা ঝরে।

ঃ ওদের এই প্রাইম মিনিস্টারই যা কাণ্ড করল—

ওদের কি করতে হয় জানিস—? অশ্লীল মন্তব্য করেছিল নিভা।

সবাই তারিফ করেছিল নিভাকে। সবচেয়ে বেশী লীলা।

অথচ তখনও লীলা জানত—আজই ছুটির সময় অপিসের গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে শওকত।

শওকতের দিকে আড় চোখে তাকায় লীলা ঃ হ্যাঁ, তাই— ও পাশে আছে বলেই এখন সে মুসলমানদের গাল দিতে পারছেনা।

তবে কি সে পাশে আছে বলেই শওকতও—

অতলান্ত অন্ধকারের সমুদ্র থেকে দমকা হাওয়ার ঢেউ উঠে আসে হঠাৎ। শাড়ির আঁচল খসে পড়ে হঠাৎ। অকথ্য আতঙ্কে লীলা থরথরিয়ে ওঠে হঠাৎ। দুহাতে বুক চেপে ধরে।

চারপাশে তাকিয়ে তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

ঘণ্টা খানেক আগে মখমলের মত নরম মনে হয়েছিল যে ঘাসের গালিচাকে, এখন তা কণ্টকাসন হয়ে উঠেছে। যেন ভয়ংকর এক ভয়ের মুখোমুখি হয়ে রোমাঞ্চ জাগছে গড়ের মাঠের সর্বশরীরে। ভুতুড়ে গাছগুলো ওত পেতে আছে চারপাশে, ধীরে ধীরে সম্মোহিত করে ফেলছে আলোর প্রহরীদের। ক্রমেই ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে চোকো চোকো মুখগুলি তাদের। ঝিমিয়ে আসছে চোখের জ্যোতি।

এরপর একসময় হার মেনে নেবে হঠাৎ। দপ করে নিভে যাবে হঠাৎ।

আর, তখন, আদিম সেই অথৈ অন্ধকারে গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে ভুতুড়ে গাছেরা। হঠাৎ চারপাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আদিম আততায়ীর মত।

কেন বার বার মনে পড়ে যায় নির্মলদার স্ত্রীর কথা?

কে নির্মলদা, সে জানে না। তার স্ত্রীকেও না। তবু যেন স্পষ্ট দেখতে পায়—রাস্তার কিনারে জবাই-করা সন্তান আর স্বামীর লাশের পাশে পড়ে আছে এক মা ও স্ত্রী। এক ফোঁটা জলের হাহাকারে বিধ্বস্ত শরীরটা তার পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে!

সিগারেট ধরাবার জন্যে শওকত দেশলাই জ্বালায়।

চমক ছোটে লীলার।

কটা বাজল বলো তো ?

দেশলাইয়ের আগ্নে ঘড়ি দেখে শওকত।

সাড়ে সাতটা।

সাড়ে সাত ! ঈশ—অনেক রাত হয়ে গেল !

কিন্তু টিউশানি থেকে ফিরতে তোমার তো নটা বাজত ?

অস্বীকার করার জো নেই। নটা কেন, একেকদিন আরও দেরি হয়ে যায়। নিজেই বলেছে। বলেছে, তোমার জন্যে টিউশানি আজ বাতিল করে দিল্ম। বলে একফালি হেসেওছে।

অফিসের গেটে শওকতকে দেখে কী-যে হয়ে গিয়েছিল।

তাহলে সত্যি-সত্যিই এল ? তার চিঠিতে নির্ভর করে ? তার গান শোনার লোভে ? এত বাহাদ্রির তার গানের ? তার ?

রীতিমত তাজ্জব বনে গিয়েছিল। এমন একটা অভাবিত ব্যাপারে হবে না তাজ্জব ?

ব্যাপারটা অভাবিত অবশ্য আগাগোড়া গার্স্টটিন প্লেস থেকে রি-ডাইরেকটেড হয়ে আসা সেই চিঠি। লেখকের নাম নেই। ঠিকানা নেই।

প্রথমে অতটা খেয়াল করেনি। এক শ্রোতা তার গানের তারিফ করেছে—খ্শিতে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।

খটকা লেগেছিল প্নশ্চ পড়েঃ পরের সিটিংয়ের জন্যে কয়েকটি গানের সবিনয় ফরমাস। বিশেষ কয়েকটি গানের।

তাড়াতাড়ি গীতবিতানখানা খ্ঁজে-পেতে বের করে। নাম কোথাও নেই—না চিঠিতে, না গীতবিতান-এর উপহার-পাতায়।

না থাক নাম, কিন্তু স্চীপত্রের দিকে তাকিয়ে আর সন্দেহ থাকে ?

ঃ কী দরকার নাম লিখে ? এ বই হাতে নিলেই আমায় মনে পড়বে। মনে পড়াই কী সব নয় লীলা ?

এই গানগ্লি ও-ই চিহ্নিত করে দিয়েছিল। লীলা, এ তো গান নয়, মন্ত্র। এ গানে—কত কী বলেছিল।

এক হাতে গীতবিতান, এক হাতে চিঠি—অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে লীলা।

তার গানের প্রশংসা !

কবে গেয়েছিল এই গান দুটি ? ছ মাস আগে।

যে-গান গেয়ে ছ মাসেও আর নতুন প্রোগ্রাম পেল না, দু-দুটো চিঠির জবাব পর্যন্ত না—প্রশংসা সেই গানের !

হাসি পায়। গলা বুজে আসা হাসি।

কী সমঝদার ! মনে পড়ে: পাতলা ছিপছিপে চেহারা ! মাজা কালো রঙ। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা।

চশমা খুললে যে-চোখ জোড়াকে অদ্ভুত দেখায়। অদ্ভুত আর অপরিচিত যে-চোখের মণিতে বারেক আঙুল ছোঁয়াবার জোরালো ইচ্ছা বারবার মনে ঘাই দিয়ে ওঠে।

এখনও বেঁচে আছে ? অবিকল তেমনি ভাবেই বেঁচে আছে ? তেমনি অবুঝ, আহাম্মক, ছেলেমানুষ হয়ে বেঁচে আছে ?

কৌতুহলের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। এবং অস্থির হয়ে এক কাণ্ড করে বসেছিল।

প্রায় এক যুগ পরে টিকাটুলির ঠিকানায় ধাঁ করে অমন চিঠি লিখে ফেলা নয় কাণ্ড করা লীলা সরকারের পক্ষে ?

'স্মৃতির বিবর্ণ ঝাঁপি ভরে রাখি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে।'

দ্বিতীয় চিঠিতে ছিল একটিমাত্র লাইন।

এক লাইনের সেই চিঠি পেয়ে লীলার, লীলা সরকারের—বয়েস যার উত্তর-তিরিশ, দশটা-পাঁচটা চাকরির শেষেও টিউশনি করে যাকে সংসার চালাতে হয়, সংসারে যার বেকার এক ভাই, পড়ুয়া চার ভাইবোন এবং যক্ষ্মারোগী মা—বুকেও দোলা লেগেছিল।

স্মৃতির বিবর্ণ ঝাঁপি ভরে রাখি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে।

গানের কলির মত কেবলি ওটা ঘুরে-ফিরে আসে কেন ? তবে কি লীলা যা ভাবে, হুবহু সত্যি নয় ? নিজেকে পুরোপুরি চেনে না লীলা ? বাইরের চাপে যত বদলই হয়ে থাক, সে-বদল শুধুই বাইরের ?

কেরানি ও গানের মাস্টারনি লীলা সরকারও—

বড় দোটানায় পড়ে গিয়েছিল : এখন কী করবে ? এখন কী করা কর্তব্য ? সঙ্গত ?

এখানেই ইতি টেনে দেবে ?—তাই।

অসম্ভবের পিছনে ছুটে লাভ ?—অসংগতকে আঁকড়ে ধরা অকর্তব্য।

যা পারত বেপরোয়া সেই উনিশ বছর, তা কি পারে উত্তর-তিরিশ ?

পারা উচিত ? তোমার মুখের দিকে কতকগুলি প্রাণী চেয়ে আছে জানো না ?

'আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক'—লীলাও ফেঁদেছিল। এক লাইনের একটা জবাব।

বারবার দাগা বুলিয়েছিল লাইনটার ওপর। শেষে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে উঠেছিল লেখাটা।

তাই দেখে মন রী রী করে ওঠে: কী ন্যাকামি! কী জঘন্য ন্যাকামিতে ভরা এই কবিতাটা!

কবিতাটার বাকি লাইনগুলি মনে পড়ে যেতে বমি ঠেলে এসেছিল।

এর চেয়ে স্পষ্ট হুকুম দেওয়া ভালো: তুমি আর আমায় চিঠি দিও না। তোমার সাথে কোন সম্পর্ক আর আমি রাখতে চাই না।

আমি চাই না! কী নির্মম স্বীকারোক্তি! চিৎকার করে এটা বলতে পারে লীলা ? যদিও লীলা সরকার জানে এ-জীবনে তার কিছুই চাওয়ার উপায় নেই।

সংসারের ফাঁদে একবার যখন পড়ে গেছে, সাধ্য কী আর বেরিয়ে আসে!

নর-রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ হয়ে ওঠে নরখাদক, এ-সংসারও অবিকল তেমনি।

মেয়ের রোজগারে বোনের রোজগারে খাওয়ার মত সুখ কোথায়!

প্রচণ্ড একটা আক্রোশে মন বিষিয়ে যায়।

আক্রোশ মার ওপর—দেড় বছর শয্যাশায়ী থেকেও যে মা মরে না, আক্রোশ ললিতের ওপর—বেকারির জ্বালা যে শুধু আপশোস করে মেটায় বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার বদলে।

সন্তু ও লতু, লাবু আর ছোটকার ওপর জাগে মায়া। কিন্তু তাদের পাওনা আক্রোশটা গিয়ে পড়ে দিবানাথের ওপর মোটা মাইনের চাকরির মোহে ঢালাও সংসার পেতে বসেছিল যে দিবানাথ।

অসময়ে যে মরবেই, বার বার বাপ হওয়ার আগেই কেন সে ফৌত হয়ে যায়নি ?

না, আমি চাই না—মুখ ফুটে একথা লীলা জানাতে পারবে না। জানাবে না।

তাছাড়া মানুষের চাওয়া-না চাওয়ায় এ দুনিয়ায় কিছু এসে যায় কি ?

দেখছে তো দীপ্তিকে, সুলেখাকে, নিভাকে।

সুলেখার কথা ছেড়ে দাও, নিভার কথাও না হয় বাদ দাও—কিন্তু দীপ্তি ? সে তো ওদের মত প্রজাপতি-মার্কা মেয়ে নয়।

বছরের পর বছর বিয়েটা ওদের পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবারই একটা-না-একটা বাধা দেখা দেয়—কখনও সরোজের তরফ থেকে, কখনও দীপ্তির।

তবু কত সহজে দীপ্তি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।

কী চমৎকার ভাবে সরোজকে সামাল দিয়ে চলেছে—পুরুষ বলে মাঝে মাঝে দিশেহারা হাওয়ার, বেহিসেবী হওয়ার রোখ চেপে যায় যে-সরোজের।

নইলে উপায় কী ? বিয়ে করা ওদের হয়ে উঠবে না। মুখে যাই বলুক এতদিনে দীপ্তিও সেটা জেনে-বুঝে গেছে : সংসারের সব বাধা কখনো দূর হয় ?

বাধাকে একবার লাই দিলে রক্ষে আছে ?

তবু, সময় যদি কখনো আসেও, শোভনাদির মত দীপ্তিও হয়ত সেদিন ফিস ফিস করে বলবে : ভয় করে ! এই বয়েসে এই শরীরে কনে হতে বড় ভয় করে !

করবে বৈকি ভয়। ভয় যে বয়সের ভার। ভয় যে বার্ধক্যের ধর্ম।

ভয় তখন শুধু নিজের জন্যে নয়, ভয় করবে আরেকজনের কথা ভেবেও।

ভয়ের থেকে দেখা দেবে অবিশ্বাস। অবিশ্বাস না ভয়েরই দোসর।

দু লাইনের হুকুমনামা কুটি-কুটি করে ফেলেছিল। রাত জেগে চিঠি লিখেছিল। ঠাসবুনন চারপাতা চিঠি।

রাত জেগে কত চিঠি লিখেছে তারপর ! কত চিঠি ! এক বছর ধরে !

রাত জেগে জেগে নতুন নতুন গান তুলেছে। পুরনোগুলির মহড়া দিয়েছে।

কাতর স্বরে ললিত বলে, মাঝ রাতে ওভাবে তুই গান গাসনি দিদি!

কেনরে? আমার গান শুনলে বুঝি মাথায় খুন চেপে যায়?

কান্না পায়।

কান্না পায়?

হ্যাঁ কান্নাই পায় ললিতের। নিজের অক্ষমতার কথা বেশি করে মনে পড়ে যায় বলে।

তোর গান শুনলে আমার সুইসাইড করতে ইচ্ছে করে দিদি।

দুচোখ ছলছলিয়ে আসে আটাশ বছরের জোয়ান গ্র্যাজুয়েট বেকারটার: সে মরলে অন্তত একজনের খাওয়াপরা কমবে। দুটো গানের টিউশনি লীলা ছেড়ে দিতে পারবে। সেই সময়টুকু নিজে রেওয়াজ করতে পারবে।

ললিত কি জানে না কত সাধ ছিল লীলার গায়িকা হবার? কলেজে তার কী নামডাক ছিল? সবাই কীরকম তারিফ করত লাবণ্যমাখা গলার।

এবং আরও কিছু কিছু জানে ললিত। জানা স্বাভাবিক। বয়েসটা তো আটাশ তার।

কিন্তু উদয়াস্ত চাকরি করে, চাকরির শেষেও যাকে-তাকে সরগম সাধিয়ে যায় গায়িকা হওয়া? সাধনা ছাড়া কিছু হয়? প্রতিভা মানেই সাধনা নয়?

চোখ ললিতের ফেটে পড়ে।

ভাইয়ের মাথাটা কাছে টেনে নেয় লীলা। মায়ের মত মাথায় তার হাত বুলোয়।

বলে, খোকা, আমি ভালো গাইতে পারিনে জানি—

তুই যদি সাধনা করতে পারতিস দিদি—

ললিতের কথা কানে যায় না, আচ্ছন্ন স্বরে লীলা বলে চলে, তবু একজন আমার গান শুনে কী বলত জানিস? বলত—

জানি দিদি—আমি জানি! জানি! হঠাৎ ললিত যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

ললিতও জানে—একে: শওকত কাত হয়ে বসেছে। মুখে সিগারেট। সিগারেটের আভায় ঝকমক করছে চশমার কাঁচ।

হয়ত ভাবছে, নিজে থেকেই গান ধরবে লীলা। গান শোনাবে বলেই

যখন তাড়াতাড়ি রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসেছে। নিজেই বেছে নিয়েছে প্যারেড গ্রাউণ্ডের এই নির্জন।

গান মানে রবীন্দ্র-সংগীত।

"তুমি জানো, আমি ভীরু, আমি কাপুরুষ। রক্ত দেখলে আমি ভয় পাই। ইনজেকশন নিতেও আঁৎকে উঠি।

তবু আমি, হ্যাঁ লীলা এই আমিই ঝাণ্ডা নিয়ে মাঠে নেমেছি, মিছিলে শামিল হয়েছি, লাঠিগুলির মোকাবেলা করেছি। চারপাশে রক্তের ফিনকি ছুটলেও বুক টান করে শ্লোগান দিয়েছি—যতক্ষণ জ্ঞান ছিল।

অরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া লইতে চায়!

লীলা, দেশের মাটিকে ওরা ভাগ করেছে। ওদের ভাগাভাগির বলি হয়েছেন আমার মা, দাদি ভাই। আমি সয়ে গেছি। সয়ে আছি। আমি কী করব! কী আমি করতে পারি! আমি যে ভীরু, কাপুরুষ, লীলা।

কিন্তু—আমার মন। আমার সে-মনকে ওরা ছিনিয়ে নিতে পারেনি, ভাগ করতে পারেনি।

সেই মনের হাত ধরে আমি বেঁচে আছি, লীলা।

আমার সেই মনের আছে এক পরম আশ্রয়ঃ রবীন্দ্র-সংগীত।

ও যে কী জিনিস! এই গান পৃথিবীর সমস্ত গ্লানি ও কুশ্রিতা ধুয়ে মুছে দেয়। এ-গানে জগৎ আনন্দময় হয়ে ওঠে। এ-গান মানুষের হৃদয়-মনকে ঈশ্বরের মত পবিত্র করে।

যার কেউ নেই, যার কিছু নেই—তারও কাছে অগাধ ঐশ্বর্যের খনি, অশেষ সান্ত্বনার সম্বল। রবীন্দ্র-সংগীত।

লীলা, বাংলা তো শুধু আমার মুখের ভাষা নয়, বাংলা মানে রবীন্দ্রনাথ। বাংলা ভাষাকে পর করে দেওয়া মানে রবীন্দ্রনাথকে পর করে দেওয়া।

আর রবীন্দ্রনাথ মানে রবীন্দ্র-সংগীত। আমার কাছে অন্তত। রবীন্দ্র-সংগীতকে হারিয়ে কী নিয়ে বেঁচে থাকব? আজকের পৃথিবীতে? বিশ্বব্যাপী এই জানোয়ারের রাজত্বে?"

গান মানে রবীন্দ্র সঙ্গীত।

এই গানই একদিন সেতু রচনা করেছিল। কালের স্রোতে সে-সেতু ভেসে গেলেও নতুন করে সেতু গড়েছে এই গান।

তার গান শোনার লোভে ও ঢাকা থেকে ছুটে এসেছে। ছুটি ফুরিয়ে গেলে ফিরে যাবে।

আবার আসবে। আবার যাবে।

আজকের লক্ষ্য একদিন উপলক্ষ হয়ে উঠবে। গানের সুর সেদিন জীবনের সুরে মিশে যাবে।

গানের সুর জীবনের সুরে মিশে গেলেও দুটি জীবন কখনও মিলবে না—লীলা জানে।

তবু কৃপণ-দস্যু জীবনের মুঠো থেকে যেটুকু যায় ছিনিয়ে নেওয়া।

কিন্তু ভুল হয়ে গেছে প্রথমেই। কেন যে গতানুগতিক কুশল প্রশ্নগুলি করতে গিয়েছিল! পাকিস্তানের হালচালের খবর নিতে গিয়েছিল! ওর মা দাদি-ভাইয়ের জন্যে সহানুভূতি জানাতে গিয়ে কলকাতার দাঙ্গার গল্প শুরু করেছিল!

খুনখারাপীর গল্প করতেই কি ঢাকা থেকে ওকে আনিয়েছে?

অসহায়ের মত চারপাশে তাকায় লীলা। ডান পাশে না তাকিয়েও টের পায় একজোড়া চশমার কাঁচ তার দিকে উঁচিয়ে আছে—ঝকঝক করছে। এই ঝকঝকানি কি সিগারেটের আগুনের—না আড়ালের দুই চোখের মণির? যে চোখের মণিতে বারেক আঙুল ছোঁয়াবার জোরালো ইচ্ছা মনের মধ্যে ঘাই দিয়ে উঠত একদিন।

একদিন!

এখন এই পরিবেশে ওর চোখে চোখে চাইতেও বুক ঢিপ ঢিপ করে। গান গাইবে কি, সুর ধরলেই গলা চিরে যাবে!

আতঙ্কে লীলা চোখ বোজে। মনে মনে প্রার্থনা করে—চোখ খুললেই দেখবে—এসব অলীক স্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল লীলা সরকার।

কিন্তু চোখ বুজেও কি রেহাই আছে। অন্ধকার ফিকে হয়ে গিয়ে ফুটে ওঠে এক বীভৎস দৃশ্য—নির্মল বলে কোনো এক ভদ্রলোকের স্ত্রী—

আঁ-আঁ-আঁ! ভয়ার্ত চীৎকার ক'রে ওঠে লীলা।

সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দেয় শওকত।

কী হল? কী হল?

ঠক ঠক করে কাঁপছে লীলা। নিঃশ্বাস দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। নিজের আর্তনাদের শব্দে নিজেরই কানে তালা লেগে গেছে।

কী হল—শওকত সোজা হয়ে বসে। হঠাৎ ভয় পেলে কেন—এ্যাই? উদভ্রান্তের মত লীলা চেয়ে থাকে: তাই তো, সে ভয় পেল কেন? হঠাৎ চমকে উঠল কেন? এ তো শওকত।

শওকত। যাকে গান শোনাবে বলে ঢাকা থেকে আনিয়েছে। এখানে নিয়ে এসেছে।

শওকত আলগোছে হাত ধরে না থাকলে কি গান গাইতে পারে লীলা? পারত?

ক্যা ভৈল্ বা?

কোথায় যেন ঘাপটি মেরে ছিল, ভুতুড়ে গাছগুলিরই একটার আড়ালে বোধ হয়, সামনে এসে হামলে পড়ে তিনটে ছায়াশরীর।

ঘুরে দেখেই বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে লীলার।

ক্যা মেমসাব—?

ঢোঁক গিলে লীলা বলে, সাপ। বলতে বলতে শওকতের একটা হাত টেনে নেয়।

সাপ, কী সর্বনাশ! সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে শওকত।

কৌন্ তরফ গিয়া সালে? বলতে বলতে এগোয় ছায়াগুলো।

সত্যি, কোন দিকে গেল বলো তো? তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াচ্ছিল শওকত, হাত চেপে ধরে—জোর করে তাকে বসিয়ে রাখে লীলা।

ভয় নেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, চলে গেছে। বলে শওকতের গা ঘেঁষে আসে।

ভয় নেই? কে বলে ভয় নেই? প্যারেড গ্রাউণ্ডের ভয়ংকর নির্জনে, পাশবিক অন্ধকারে, তিন-তিনটে ছায়াশরীরের দিকে তাকিয়ে, তাদের বিজাতীয় আওয়াজ শুনে হাত-পা যে লীলার সিঁটিয়ে আসছে।

শওকতকে তাই সে আঁকড়ে ধরতে চায়।

পরমপুরুষ

চশমা সমেত পেট থেকে পড়েনি।

চোখ একদিন নিখুঁত ছিল। পটল-চেরা বা যশোদার কোলে গোপালমাফিক না হলেও দস্তুরমত তেজী ছিল।

চোখে কাজল পরিয়ে মা যথারীতি বর্তে যেত। নয়নের কাজল বয়ানে লাগতও যথারীতি।

বিনা চশমাতেই সাধুসাপুড়েজোড়াকুকুর যাত্রাথিয়েটারসিনেমাম্যাজিক আকাশের চাঁদন্যাংটোমেয়েছেলে উকিলজোচ্চোরদারোগামেথর প্রফেসার-বন্ধুসাহিত্যিকবেশ্যা ইত্যাদি যখন যা দ্রষ্টব্য দেখে এসেছে। উচ্চকিত-উৎসাহিতবিচলিত ইত্যাদি যখন যা হওয়া দরকার হয়েওছে।

আর-পাঁচটি বালককিশোরযুবকের মতই যথারীতি।

এবং চশমা সম্পর্কে কোনও দিন কোন মোহ চাগায়নি।

চার পয়সার চশমা সেঁটে না-বুরু বয়েসেও বাহাদুর সাজেনি।

ভেবেছিল বিনা চশমাতে দুনিয়া দেখে যাবে।

বংশে কেউ চশমা নেয়নি—ঐতিহ্যটা বজায় রাখবে।

বাপকা ব্যাটা!

॥ ২ ॥

জমিজিরেত লোপাট হয়ে যাওয়ায় বাপের মত ষোলআনা সংসার বাঁচিয়ে মেয়েমানুষ পোষার সাধ্যি নেই বটে কিন্তু সকাল-সন্ধে অফিসের ঘানি টেনেও বিশ বছর বউকে ভালোবেসে চলেছে। মা হয়ে হয়ে দেহটা বউয়ের ধসে গেলেও।

হাটেবাজারে জবর খাতির।

নিপাট ভালোমানুষ যে!

বাড়িওয়ালা অব্দি দেখা হওয়া মাত্র দাঁত কেলিয়ে নমস্কার ঠোকে।

দিনে দশবার দেখা হলেও।

এমতাবস্থায় পরমসুখে কালাতিপাত করাই রেওয়াজ।   করছিলও।

ফোকলা হয়ে গেলে মাংস ছাড়ার মত শেষ বয়েসে মন্ত্র নেওয়ার মতলবও ভাঁজছিল।

কিন্তু জগতে কিনা আলোর পরেই অন্ধকার, জেন্টলম্যানের পাশেই জার্নালিস্ট—অনর্গল সুখ সইল না।

॥ ৩ ॥

গোড়ায় গা করেনি। কখনো ভেবেছে কোষ্ঠকাঠিন্য, ভিটামিনের অভাব কখনো। কিন্তু কোনো ভাবনাই যখন ধোপে টিকল না, কিলোটাক ইসবগুলের ভুষি আর ডজন দুয়েক ভিটামিনের বড়ি গিলেও ফল হল না, এমন কি পর পর তিন রাত্তির বউ-বর্জন ইস্তক মাঠে মারা গেল—খাঁজ পড়ল কপালের চামড়ায়।

'ডাক্তারবাবুকে ডাকি, হ্যাঁগা ?'

যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব। কিন্তু নিজের জন্যে দুম করে যায় ডাকা ডাক্তার ?

সংসারের কর্তা না ? বউছেলেমেয়ের প্রতি কর্তব্য আছে না ? নিজের সুখসুবিধে আরামআয়েস যত কম দেখবে কর্তব্যটা তত বেশি নির্ভেজাল হয়ে উঠবে না ?

দাবনার ফোঁড়ায় ইনজেকশন নিতে যে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে খোলাডাঙা পাড়ি দিত সে-না এই কর্তব্যেরই চোটে ?

ভিজিট বাবদ চার আট্টে বত্রিশ থেকে ইনজেকশনের দরুন আট একে বাদ দিয়ে নীট চব্বিশটি টাকা না বাঁচালে সংসারের প্রতি কর্তব্যে খামতি পড়ে যেত না ?

'কী গো—?'

বউ তখন গাঁইগুঁই করলেও জোর করে কিন্তু ডাক্তারকে তলব করেনি।

তবে হ্যাঁ, দুহাতে পুঁজ রক্ত ছেনেছে ?

সেও কর্তব্য। পতিব্রতার কর্তব্য।

চাব্বিশটা টাকা হাতে তুলে দিলে পুঁজ-রক্ত গালে ঘষত ? চেটে দেখত ? সরেজমিনে কর্তব্যের প্রমাণ দিতে ?

ঈশ ! আপসোস ঘাই দিয়ে ওঠে। টাকাটা যদি না বাইরে খরচ করত ? ভরা মাসে স্রাব হচ্ছে বলে ঘাবড়ে গিয়ে যদি না বাইরে খরচ করত ?

'হ্যাঁ গা ?'

মাথা দোলায় ?

'এভাবে কষ্ট পাবে ? কদিন হয়ে গেল' !

'আজ কম আছে।'

'সকালে তো তাই বলো। পরে আবার—'

মুখ ভ্যাংচায়, না নার্ভাসনেসে মুখটা বউয়ের বিদঘুটে হয়ে যায় বোঝা মুশকিল।

অবিশ্যি নার্ভাস হওয়াই স্বাভাবিক। বউ বলে কথা !

সংসারের মুখ চেয়ে বছর বছর পাওনা ছুটিগুলো যে অফিসকে বেচে দেয়, কখনো লেট হয় না, স্ট্রাইকের আগের রাতে দফতরে গিয়ে মোতায়েন থাকে—সাড়ে আটটায় স্নান খাওয়া সেরেও সে এখনো অন্ধকার ঘরে ভাম ঘোর ? কপালে পটি বেঁধে ? হবে না নার্ভাস !

নেপাল সরকারের বড় ছেলে খানিক আগেই বাপের শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন করে গেল না ? অফিস যাওয়ার মুখে আচমকা আঁ-আঁ-আঁ করতে করতে উল্টে পড়ে ফৌত হয়েছে যে নেপাল সরকার।

স্বামীভরসাটির জন্যে মায়া উথলায়। মমতা কুরকুরি কাটে। পাইলসে দিনভর কাটাছাগলের মত দাপালেও স্বামীর পাওনা কালও স্বামীকে বুঝিয়ে দিয়েছে। বে নিয়মে পাছে ঘুম ছরকুটে যায় স্বামীর।

এই গরমে হেঁসেলে ছেলেমেয়েদের আটকে রেখেছে পাছে বিশ্রামে ঘাটতি পড়ে মাথার যন্ত্রণা বাড়ে বাপের।

অন্যায় দারুণ অন্যায়। নিজের স্বার্থে বউছেলে মেয়েকে কষ্ট দেওয়া নিদারুণ স্বার্থপরতা।

পবিত্র পারিবারিক কাঠামোটা বহাল রাখার জন্য ওদেরও মাঝে মাঝে কর্তব্য পালনের মওকা করে দেওয়া দরকার হলেও অন্যায় এবং স্বার্থপরতা।

উঠলে যে ?

'যাই—'

'অফিস ?'

'ডাক্তারের কাছে।'

'রিকশা ডাকতে পাঠাই ?'

'যন্ত্রণা পায়ে তো নয়।'

'পল্টু সঙ্গে যাবে ?'

'ইশকুল কামাই করে! একাই যেতে পারব।' বুক চিতিয়ে বলে।

বলে এমনই জোরালো গলায় যে যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়লেও ঘোলা-ডাঙ্গা কোন ছাড় ফরাসডাঙ্গা তক হেঁটে চলে যাবে—মুণ্ডুটা বাড়িতে মজুত রেখে। বউয়ের বুকে।

॥ ৪ ॥

ফিক করে হাসির পিক ফেলে ডাক্তার সামাল নেয়।

'আরে আসুন আসুন—এই সরে যা—সরে যা সব—'

ডাক্তার চেয়ার ঠেলে দিলেও সেকেণ্ড পনের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কাঁচা খিস্তি করছিল ? নবকার্তিক ডাক্তার ? নার্সের সামনে ?

'তারপর—?'

'—!'

'গীতা, তুমি বরং এঁকে আমার চেম্বার—'

'ঠিক আছে।' ধপ করে বসে পড়ে।

অসম্ভব। সিরিঞ্জ বাগিয়ে একজন, পাছার কাপড় তুলে আরেকজন —এ-দৃশ্য ছেড়ে যাওয়া ইমপসিবল

'জাস্ট এ মিনিট।'

'ঠিক আছে।'

ইনজেকশন নিজেও নিয়েছে। ওই বেড়েই নিয়েছে। কিন্তু শরীরে সুচ ফোটানোর দৃশ্য এত রোমাঞ্চকর! এমন অকথ্য রোমাঞ্চকর!

ওষুধ ঠাসার সময় ডাক্তারের চোয়াল আক্রোশে জমাট বাঁধে ? দুই চোখ ঝিকিয়ে ওঠে ?

রোগীর মুখ এ্যায়সা ক্যাডাভারাস দেখায় ?

স্ট্রাইকের আগের রাতে মিসেস মজুমদার অফিসে যে ছিল। কমিউনিস্টদের ভড়কিতে না ভোলার মত মেয়ে তো ওই সুবোধন নীলমণি।

প্রথম প্রহরে রাতে তার কুশল নিতে যায় আয়ার। বড় সাহেব। দ্বিতীয় প্রহরে সেনগুপ্ত। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। শেষ কিস্তি প্রফুল্ল নেতা।

সে-ও বড় রোমাঞ্চকর দৃশ্যাবলী।

রাশভারী রকবাজি কান্ডকারখানা! সাত ছেলেমেয়ের বাপ সেনগুপ্তর শিশুয়ালী আদেখলাপনা! পরনে পৈতে-সম্বল সুতো-কাটা প্রফুল্লর লাল-গড়ানো হালুমহুলুম!

বাহাদুর বটে মিসেস মজুমদারও। সাচ্চা ইস্পাত!

অত দোমড়ানিমোচড়ানি খাজুরাহো-কোনারকের ধকল সওয়া চাট্টিখানি কথা! হাসিমুখে সওয়া!

বিয়ের ড্রেসিংটেবিলটা ভাগ্যিস পায়ের দিকে!

রাত দশটাতেই বাড়িওলা মেইন অফ করে নেয় ভাগ্যিস!

সংসারধর্ম নইলে রগে উঠে যেত। নিজেকে মাগীবাজ আর বউকে গাছখানকি বনে যেতে দেখে ঘেন্নায় গ্লানিতে অধীর হয়ে নষ্টের গোড়াটাকে দুহাত পাকড়ে মাঝরাতেই কোন আশ্রমে গিয়ে শামিল হওয়ার জন্যে প্রাণটা ছটফটিয়ে উঠত।

ঠিক হয়নি ঠিক হয়নি। তৃতীয়বার বাথরুম থেকে টলতে টলতে বেরোবার সময় লুচি-মাংসের ঢেঁকুর তুলে মনে হয়েছে বটুকের পাল্লায় পড়ে মিসেস মজুমদারের কামরার ফোকরে চোখ পাতা ঠিক হয়নি।

ডাক্তার বলা সত্বেও এ ঘরে থেকে যাওয়া ঠিক হয়নি।

'এদের ট্রিটমেণ্ট এক ঝকমারি।'

আপসোসের জিম্মায় নিজেকে সঁপে দিয়ে মনকে বুঝ দিতে চাইছিল, ডাক্তারের বুকনিকে বাধা পেয়ে চটে যায়। বানচোৎ! এদের ট্রিটমেণ্ট করার জন্যে কে তোকে মাথার দিব্য দিয়েছেরে শালা? শিবপুরে অমন বাড়ি থাকতে এপাড়ায় কেন এসেছিস রে হারামজাদা?

'লোকলজ্জার পরোয়া নেই—'

লোকলজ্জার পরোয়া থাকলে তোর কী গতি হত রে শুয়োরকি বাচ্চা?

'কুষ্ঠ হয়ে শরীর পচে-গলে যাবে ভয় না দেখালে—'

'কুষ্ঠ?'

'লাস্ট স্টেজ।'

না, কুষ্ঠ হওয়াটা লোকসান। কুষ্ঠে শরীর পচে-গলে গেলে কোন ডাক্তার ভিড়বে না। একটা রোগীর জন্যে বাকিদের খোয়াবে ?

পোষা কুকুরের মত দু'বেলা জলখাবারের সময় হররোজ হাজির থাকলেও শেষ দিকে কোবরেজ মশায় চরণামৃতের বিধান দিয়ে কেটে পড়েছিল সাধে !

'তাছাড়া ডালহেড—'

ডালহেড হলেও মেজ ভাইটা কিন্তু কাজ করেছিল বুদ্ধিমানের। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়া নয় বুদ্ধিমানের কাজ ?

'অন্ধও—'

'অন্ধ !' আঁতকে ওঠে। 'অন্ধ হয়ে যায় ?'

'অন্ধ হয়েই জন্মায়।'

'— !'

'আঁতুড়েই, অনেক সময়—'

টেঁসে যায়। চারটে গিয়েছিল। সারা গায়ে দগদগে ঘা নিয়ে বেঁচে থাকা দুষ্কর।

শেষেরটার সঙ্গে গর্ভধারিণীও না টেঁসে গেলে আরও কটার জন্মিলে মরিতে হত কে জানে !

বাপকা ব্যাটা বাপের এই ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে ? হয়েছে তো সত্যি সত্যিই ? বড় ছেলে বলে ? ডাকসাইটে সুন্দরী ডানাকাটা পরীর বড় ছেলে বলে ?

কুঁচকি টনটনিয়ে ওঠে ঘন ঘন পড়ে চোখের পাতা।

'হেরিডিটি—'

থাম বোকাচোদা ! লেকচার ! 'অন্ধ হওয়া—চোখের গোলমাল হওয়া মানেই কি—?'

'তা কেন। চোখের গোলমাল নানা কারণে হতে পারে। আই-স্পেশালিস্টরাই এ ব্যাপারে —'

'অ !'

'অবশ্য রক্তের দোষে হচ্ছে কিনা ব্লাড একজামিন করে আমিও—'

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোয় যদি ?

রক্ত দারুণ দামী। আঙুল কেটে সঙ্গে সঙ্গে তাই মুখে পুরে দিয়ে চুষতে হয়। এক ফোঁটাও যাতে না বরবাদ হয়ে যায়।

আচারে আঙুল চুবিয়েও চোষা অবশ্য যায়। আঙুল সেখানে নিমিত্ত মাত্র। আচারে চুষিকাঠি চুবিয়ে চুষলেও একই স্বাদ।

কিন্তু কাটা আঙুলের স্বাদ আলাদা। রক্তের স্বাদ।

রক্তের স্বাদে জবর নেশা। সে-নেশায় বুঁদ বেখেয়াল হতে পারলে কাটা-আঙুলের ফুটো দিয়ে দেহের তাবৎ রক্ত গিলে ফেলা অসম্ভব কি!

প্রাণপণে তাই আঙুল চোষে।

অ্যাটোরিনের দরুন অফিস যখন কামাই দুদিন করতেই হল—হর্দম চলুক আঙুল চোষা।

দেহের রক্ত আঙুলের ডগা দিয়ে মুখ মারফত পেটে যাক। লিভার তা পিউরিফাই করুক। শিরাউপশিরাকে যোগান দিক হার্ট।

এক সাথে চলুক রক্ত চোষা গেলা পিউরিফাই করা যোগান দেওয়া।

নিজেই প্রডিউসার নিজেই কনজিউমার। স্বয়ম্ভরতার চরম!

আহা, রক্তের অভাবে কত জওয়ান চিঁ চিঁ করছে! সাধেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালিয়েও এক লপ্তে পাঁচ-সাতটার বেশি খতম করতে পারে না!

'দেখি—দাও—ডেটল লাগিয়ে দি।'

'ডেটল?'

'বাঃ—তুমিই না বললে—'

বলেছিল। পুরনো ব্লেডে নখ কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলায় ঘাবড়ে গিয়ে বলে ফেলেছিল।

কিন্তু তখন তো রক্তের স্বাদ পায়নি। নিজের রক্ত চোষা গেলা পিউরি-ফাই করা যোগান দেওয়ার স্বয়ম্ভরতার প্ল্যানটা গজায়নি।

'দরকার নেই।'

'মাসিমার কাছ থেকে চেয়ে আনলাম—'

'ফেরত দিয়ে এসো।'

আঙুল চোষা বজায় রেখেই ধমক হাঁকায়। এখন কথা বলানোর মানে হয়!

ধমক দিয়েই আপসোস জাগে। বেচারা! ও কী করে জানবে দারুণ কাজে স্বামী এখন ব্যস্ত।

'— !' এক চোখ বোজে।

'কী ?'

'— !!' দরজার দিকে তাকায়।

'ঢং !'

'—!!!'

'এক হাঁড়ি সেদ্ধ-কাচা পড়ে আছে—'

তাহলে অবশ্য কথা নেই। ঝুটমুট বউকে ধমক হাঁকানোর প্রায়শ্চিত্ত করতে ধোপার কড়ি গোনার মানে হয় না।

'এসেও লাভ হত না।'

আঙুল চোষা শিকেয় রেখে 'কেন ?' 'কেন ?' বলে হামলে উঠছিল, বউয়ের চোখমুখ দেখেই জবাব পেয়ে যায়।

ছুটির দিন দুটো স্রেফ আঙুল চুষে কাটাতে হবে ? আমার খিদে না থাকে আমি বুঝব, কিন্তু ভাত কেন বেড়ে দেবে না !

'এবার বড্ড বেশি হচ্ছে—'

তার মানে তিনচার দিনেও জের মিটবে না ? হপ্তা ভর লে-অফ ?

'তখনি বলেছিলাম লুপফুপ—'

ধেৎ শালী! দেশের কথা ভাব। দেশকে ভালোবাসতে শেখ।

দেশকে ভালোবাসার ডিভিডেণ্ট যে কত্ত তা যদি বুঝতিস !

দরকার হলে সোনার লুপ গড়িয়ে দেব, কিন্তু দেশের বোঝা আর বাড়াব না।

'খুউব !'

'দিনে দু-তিন লিটার ?'

'জানি নে বাপু!' ঘর থেকে ছিটকে বউ বেরিয়ে যায়।

বড়ই ক্ষুণ্ণ হয়। সিরীয়াস ব্যাপারে বাজে লজ্জা! অশিক্ষিত বউ নিয়ে এই মুশকিল।

দিনে দু'তিন লিটার রক্ত লোকসান সোজা ব্যাপার!

এবার না হয় বেশি হচ্ছে, কিন্তু মাসে দৈনিক গড়ে আধ লিটার—সিকি লিটার করে ধরলেও চারদিনে এক লিটার—বছরে বারো লিটার!

বছরে বারো লিটার করে রক্ত বরবাদ? কী সর্বনাশ!

এর ওপর আছে পাইলস। তাতেও কম রক্ত যায় না।

বোতল বাঁধার অ্যাডভাইস দেবে? খেজুর গাছে কলসীর মত? তারপর দু বগলে দুই বোতল নিয়ে —

সব শুনে প্রফুল্ল নির্ঘাত খুশিতে পাল খাবে।

দেশের জন্যে মানুষটার অন্ত নেই দরদের। চীনে হামলার সময় ব্লাড ব্যাংকে কী কামান কামিয়েছে।

বোঝ তাহলে কী পরিমাণ রক্ত ঢেলেছে দেশের জন্যে।

॥ ৬ ॥

'বাঃ, দারুণ দেখাচ্ছে কিন্তু।'

প্রতিদানে দেখন হাসি হাসতে হয়।

'এই ফ্রেম নিলেন কেন! হাল ফ্যাসানের—'

'না না এই ভালো। বেশ সোবার।'

'বাইফোকাল? তাইত।'

'পাওয়ার?'

'মোট কত পড়ল?'

দেখন-হাসি বজায় রেখেই কথার জবাব দেয়।

কখনো মুখ উঁচিয়ে, নামিয়ে কখনো—

মাঝে মাঝে গোলমাল হয়ে যায়। ঝাপসা লাগে, অস্বস্তি জাগে। কানের পাশের দুই শিরার টনটনানি অসহ্য হয়ে ওঠে।

চশমা খুলে শিরা ম্যাসেজ করে।

'প্রথম প্রথম এমন হবে। অভ্যেস হয়ে গেলে—'

'আমি তো গোড়ায় এক নাগাড়ে পাঁচ মিনিটের বেশি—'

'সব সময় ব্যবহার করবে। চশমা ইজ ফর কনসট্যান্ট ইউজ। নইলে হু হু করে পাওয়ার বাড়বে।'

'তিন বার হোঁচট খেয়েছি—'

'ওই যে বললাম প্রথম প্রথম—'

'ভাতের গেরাস নাকে গ‍ুঁজে দিয়েছিলাম—'

'ওপরের কড়িকাঠে তাকিয়ে খাচ্ছিলেন ?'

'ট্রামে উঠতে গিয়ে—'

'মোদ্দা কথা কাছের জিনিস আধ চোখে দেখবি, দ‍ূরেরটা চোখ ফাটিয়ে —আসছে !' বটুকের হ‍ুঁশিয়ারিতে চটপট যে যার চেয়ারে চলে যায়। টেবিলে হ‍ুমড়ি খেয়ে পড়ে।

তাড়াতাড়ি চশমা পরে নেয়।

কিন্তু একি—সেনগ‍ুপ্তর ম‍ুখটা অমন ভোঁদাই হয়ে গেল কী করে ? মাত্র দ‍ুদিন ছ‍ুটি নিয়েছিল, রোববার ধরে তিন দিন—তিন দিনেই বিলকুল বদলে গেল বাইশ বছরের জানাশোনা ম‍ুখটা ?

'চশমা নিতে হল ?'

'আজ্ঞে।' উঠে দাঁড়ায়। পরিচিত ম‍ুখটা বারেক ঝলক দিয়েই হারিয়ে যায়।

'বেশ পাওয়ার মনে হচ্ছে। বাইফোকাল ? সিলেণ্ড্রিকাল ?'

'আজ্ঞে।'

'কত—প্লাস অ্যান্ড মাইনাস ?'

'আড়াই, সাড়েতিন।'

'মাই গ‍ুডনেস ! তা সত্ত্বেও এ্যাদ্দিন—' সেনগ‍ুপ্ত পেছন ফেরে।

এখন দিব্যি দেখাচ্ছে। অতি পরিচিতি পাছা। পায়ে ধরেও কোন ফল না হওয়ায় ওই পাছাতেই লাথি হাঁকিয়ে দারোয়ান-বেয়ারার হাতে হাসতে হাসতে সাত চোরের মার খেয়েছিল প‍ুলকেশ।

পরিচিত পাছাটা ঝাপসা হতে শ‍ুর‍ু করলে ম‍ুখ নামায়। বটুকের পরামর্শ মত চোখ ফাটানো শ‍ুর‍ু করে। গাঁথা মাছের জন্যে সুতো ছাড়ার মত সইয়ে সইয়ে।

এই তো রপ্ত হয়ে গেছে দ‍ুম‍ুখো চশমা ব্যবহারের কায়দা !

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সেনগ‍ুপ্তর ইশারাটা হ‍ুবহ‍ু দেখতে পায়।

অবিকল আগেকার মত। তার চেয়ে জোরালো বরং।

সঙ্গে সঙ্গে সহকর্মীদের দিকে চোখ ফেরায়। ঝাপসা! সব ঝাপসা!

আধ চোখে দেখবে

কী দরকার!

॥ ৭ ॥

গেট থেকে বেরিয়ে বটুক বলে, খাওয়াবি চল।

'খাওয়াব?'

'আরে বাবা এ শর্মা সব জানে। প্রফুল্লদাকে দিয়ে আমিই গ্রাউন্ড তৈরি করে রেখেছিলাম।'

'— ?'

'ন্যাকামি করিস না।' বটুক কনুয়ের গোঁত্তা দেয়।

লাভ নেই। এক হাত দূরের বটুকের দিকে চোখ ফাটিয়ে তাকানো নিরর্থক।

'মবলগ তিরিশটা টাকা পাচ্ছিস—প্রফুল্লদাকে আমি উসকে দিয়েছিলাম বলেই পাচ্ছিস মনে রাখিস। কমিশন হিসেবেও অন্তত—'

তিরিশ নয়, পঞ্চাশ। সেনগুপ্ত প্রথমে তিরিশই বলেছিল, পরে ডাক্তারের ভিজিটও যোগ করে পঞ্চাশের জন্যে দরখাস্ত করিয়ে নিয়েছে। আড়াই-সাড়ে তিন পাওয়ার নিয়েও কামাই না করার লেট না হওয়ার বকশিস!

ওদিকে চশমার দরুন বাড়তি খরচ উসুল না হওয়া অব্দি মাছ আনতে বউ মানা করে দিয়েছে, এদিকে বটুক ধরে নিয়েছে তিরিশ—হাতে আসছে পঞ্চাশ।

অথচ খরচা হয়েছে এগারো। পনেরো থেকে এগারো। আরও খানিক ধস্তাধস্তি করতে পারলে হয়ত দশ হত।

হাওড়া ময়দানের ফুটপাতে নির্ঘাত আট।

বউ জানে বিশ, অফিস তিরিশ, পাচ্ছে পঞ্চাশ।

'আমার চশমার জন্যে তোমরা কেন মাছ খাওয়া বন্ধ করবে! আমি হেঁটে যাতায়াত করব, ঝালমুড়ি দিয়ে টিফিন খাব' বলে বউয়ের পতিভক্তি,

ছেলে মেয়েদের পিতৃভক্তি চাগিয়ে দিয়ে নন্দরাণীর ফ্লাটে বেকসুর একটা ক্ষেপ মেরে আসা যায়।

'বেমক্কা-পাওয়া টাকা কখনো জমাতে নেই'।

'বেমক্কা' ?

'নয় ? জগদীশদা ছমাস ভুগে মরল, একটা আধলা অফিস দেয়নি। আর চশমার জন্যে—'

জগদীশদার সঙ্গে তুলনা ! চ্যেরা একটা কমিউনিস্টের সঙ্গে তার মত ওয়ার্কারের তুলনা করল বটুক ! নেমকহারাম কাঁহাকা !

'আগে রেস্তরাঁয় চল। শুধু—চা মাইরি ! চা খেতে খেতে—'

'কিন্তু টাকা তো এখনও পাইনি।'

'কালই পেয়ে যাবি।'

'আমার কাছে ট্রামভাড়া ছাড়া—দ্যাখ তুই।'

'জানি জানি।' বটুক সবজান্তা হাসি হাসে। 'পকেটে পয়সা থাকলে পাছে ঝোঁকের মাথায় খরচ হয়ে যায়—ট্রামভাড়ার বেশি নিয়ে তুই বেরোস না জানি।' সিগারেটে দমভর টান দিয়ে নাকেমুখে ধোঁয়া ছাড়ে। 'আবার আচমকা দরকার পড়ে গেলে খরচ করার জন্যে কাছার খুঁটে দশ টাকার নোট গুঁজে রাখিস তাও জানি। না না, কাছা খুলে মাঝ রাস্তায় সুরৎ দেখাতে হবে না। আমি অ্যাডভান্স করছি। তোকে চিনি বলেই পনেরোটা টাকা কেষ্টর কাছ থেকে হাওলাত করে এনেছি। নে।'

বটুককে একটা থাপ্পড় কষানোর জন্যে হাতটা নিসপিস করে ওঠে। কিন্তু কার্যত তা অসম্ভব বলে ডান হাতের সঙ্গে বাঁ জুড়ে ফিরিঙ্গি কালীকে একটা নমস্কার ঠুকে দেয়।

'টাকাটা ধর—'

'রাখনা।'

'তা রাখছি। কিন্তু চায়ের দামও কিন্তু এর থেকে। ওখানে শালার তিরিশ নয়া চা—ছুঁড়িটা আবার টিপস না পেলে—'

'কী দরকার ওখানে যাওয়ার ?'

'যা বাবাবা ! গাঁটের পয়সায় ভাঁড়ে চা। কিন্তু ছপ্পর ফুঁড়ে পাওয়া পয়সাতেই যদি না ওখানে যাই যমরাজকে কী কৈফিয়ত দেব ?'

তিরিশ তিরিশ ষাট চা—টিপস সমেত আস্ত টাকা। দশ নয়া দিলে 'রেখে দিন—ভিখিরিকে দেবেন' বলে মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়।

তার ওপর মান্ধাতার আমলের এক প্লেট কেক নিয়ে সাধাসাধি! মরা কুকুর বেড়ালের নাড়িভুঁড়ি দিয়ে তৈরি চপ কাটলেট গছানোর চেষ্টা!

তবু যদি পড়তায় আসত! হাত ধরলেই দু টাকা।

'আমার আজ একটু তাড়াতাড়ি যাওয়ার দরকার ছিল—বউকে বলে এসেছি—'

'বলবি অফিসে আটকে গেলাম। তালে আর ট্যা-ফো করবে না। চাকরির যা দিনকাল।'

মাথা আছে বটুকের! চশমার বাড়তি খরচা উসুলের জন্যে সংসারকে বঞ্চিত না করে স্বামী ওভারটাইম খেটে এল—নিজের হাতে বউ পা ধুইয়ে দেবে? এলোচুল দিয়ে মুছেও দেবে?

বয়সের দরুন মুরোদ কমে যাওয়ায় শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লে 'আহা মানুষটা কী খাটনিই অফিসে খেটেছে' ভেবে রাতভোর দরদে খাবি খাবে?

'আমি বলি কি অনর্থক এখানে খরচা না করে—ওখানেই বরং চাটা—'

'এখনও যে সন্ধে হয়নি—'

'যেতে যেতে—'

'এই গরমে হাঁটা—চল!'

॥ ৮ ॥

দূর থেকে চোখ ফাটিয়ে এবং দরদস্তুর করার সময় হালকা অন্ধকারে আধ চোখ বুজে দেখে পছন্দসই মনে হয়েছিল।

রঙ ময়লা, শাড়ি ব্লাউজ সস্তা আর পাড়াটায় বস্তি বস্তি ভাব থাকলেও মালে ভেজাল নেই।

আলো নেভালে রাণী এলিজাবেথ আর রাধারাণীতে কী তফাত।

কিন্তু কে জানত ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েই স্পষ্ট আলোয় মেয়েটার মুখ দেখা মাত্র আঁতকে উঠে পিট্টান দেবে বটুক! বন্ধুকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে।

'আসুন—ভেতরে আসুন

'আমার ফেণ্ড—'

মেয়েটা কাতর হাসে। 'উনি আর আসবেন না।'

'তোমার চেনা?'

জবাব না দিয়ে মেয়েটা দরজায় পাট দেয়।

'চেনা, না?'

'থাক না সেকথা। বসো।' দু'হাত ধরে তক্তাপোষে বসায়।

না, আগে আমার কথার জবাব দাও। সংগে সংগে দাঁড়িয়ে পড়ে। 'চেনা?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়ে।

'আগে এসেছে?'

জিভ কাটে। 'আমার বাবা হয়?'

'অ্যাঁ!'

'ওদের বাড়ি কদিন কাজ করেছিলুম—আমি বাবু ডাকতুম—উনি মা ডাকতেন—মাল খাবেন তো?'

'আমি ওসব খাইনা।'

'চা, চা আনাই আর চিংড়ির কাটলেট—?'

আধ চোখ বুজে তাকিয়ে থাবা তুলছিল—চা-কাটলেটের প্রস্তাব শোনা মাত্র চমকে ওঠে। সর্বনাশ!

পনেরোটা টাকা যে বটুকের কাছেই থেকে গেছে! সত্যিই যে পকেটে আজ চার-ছ আনার বেশি নেই!

হায় হায় হায়! টাকাটা যদি বটুকের কাছ থেকে নিয়ে নিত।

কাছায় যদি পাঁচটা টাকা গুঁজে আসত!

এত সস্তায় এমন জিনিস! জলের দরে গঙ্গার ইলিশ!

স্রেফ দেখে যেতে হবে? চোখ দিয়ে শুধু চেখে যেতে হবে?

'চাও খাবেন না? তবে তাড়াতাড়ি নিন—'

হাতের নাগালে মেয়েটা আঁচল খসাতেই চোখ ফাটিয়ে তাকায়। ঝাপসা! সব ঝাপসা! ভানুমতির খেল!

সব ঝাপসা না করে হাত দুটোকে সামলানো মুশকিল!

'কই—'

'ছিঃ!' উপরের কাঁচে তাকিয়ে স্বগীয় গলায় বলে, বটুক যখন তোমায় মা ডাকত তুমি আমারও মা। আমি আসি মা।

সঙ্গে সঙ্গে চশমা খুলে ফেলে।

চশমা না খুললে ছোটা সম্ভব নয়।

না ছুটলে বটুককে পাকড়াও করা অসম্ভব।

অপ্রকাশিত খবর

ভারতের উন্নতিতে চীনের গাত্রদাহ—বাম কম্যুনিস্টদের গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি—সত্যজিৎ রায়ের নূতন সম্মান—

হাঁফাতে হাঁফাতে হাবু ঘরে ঢোকে। পেলাম না মা।

পেলি না? কাগজ থেকে মলিনা মুখ তোলে। কমলাদির সাথে দেখা হয়েছিল?

মাসিমাকেই তো বললাম বড়দিকে বিকেলে দেখতে আসবে—

কী বললি! শুক্রবারের কাগজগুলি আলাদা করে বাছছিল, রেণু ফোঁস করে ওঠে, কে তোকে মাতব্বরী করতে বলেছিল?

তাহলে কী বলব শুনি? ছোড়দি বড়দি মা দিব্যি ঘরে বসে কাগজ পড়ছে, পিণ্টু মিণ্টু তক্তাপোষে লুডো খেলছে, আর ঠা ঠা রোদ্দুরে এতদূর সে দাবড়ে এল! দেখেই মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল, রেণুর ধমকের জবাবে হাবুও গলা চড়ায়, আমরা লুচি খাব, পোটাক ময়দা দাও—এই বললেই ভালো হত, না?

তাই বলে তুই মিছে কথা—

মিছে কথা! হাবু মুখ ভেঙায়। তুই কখনো মিছে কথা বলিস না? আজই সকালে বাবাকে—

আমার নামে কেন মিথ্যে বললি?

বেশ করেছি!

ছেলেমেয়েকে থামিয়ে দিয়ে মলিনা বলে, নন্দদের বাড়িতে একবার গেলি না কেন? ফেরার পথে—

ওদের বাড়ি আমি যাব না। নন্দটা—

আহা, গরজ যখন আমাদের—

সে আমি পারব না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করব, তবু—

কী বাহাদুর! ভিক্ষে করবেন, তবু—

ভালো হচ্ছে না কিন্তু বড়দি !

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করবেন, তবু বন্ধুর কাছে হাত পাতবেন না—মরে যাই !

তবেরে রাক্ষুসী—!

হাবু হামলে আসে। খপ করে তাকে ধরে ফেলে মলিনা বলে, কেন ওকে রাগাচ্ছিস। তুই বোস বাবা বোস। জিরো।

ও কেন আমার নামে—

থাম না বাপু !

থামনা বাপু ! ছেলে কি না, তাই ওর কোন দোষ তুমি দেখ না। মেয়ে কি না—গলার কাঁটা, আপদবালাই ! শুক্রবারের কাগজগুলো নিয়ে রেণু জানালায় গিয়ে বসে।

তার কথাই তাকে ছুঁড়ে মারল। তা গলার কাঁটা আপদবালাই ছাড়া কী ? বাইশ বছরের মেয়ে না হয়ে ছেলে হত যদি ! হাবু যদি রেণু হত ! একটা মানুষের ওপর এত বড় সংসারের চাপ—। দীর্ঘশ্বাস গিলে ফেলে মলিনা বলে, তাহলে তো ভারি মুশকিল হল ! তোদের বাপকে বলেছি আমি ঠিক জোগাড় করে নেব—

রেবা বলে, আমি আনতে পারি মা।

তুই ? না বাপু, জ্বর গায়ে তোমার আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই।

বাইরে না, ইশারায় রেবা জানিয়ে দেয়, পাশের ঘরে। গলা নামিয়ে বলে, কাল রাঙা পিশি ময়দার মাড় করেছে, আমি দেখেছি, ওদের পেতলের পুরনো হাঁড়িটায়—

চাইলে দেবে না। যা ছোটলোক।

চাইব কেন। সবাই নাক ডাকাচ্ছে, ভাঁড়ার ঘরের শেকল তোলা—

রেবা ! মাথাটা মলিনার দপ করে ওঠে। মেয়ে তার চুরি করতে চাইছে ? আধপেটা হোক সিকিপেটা হোক, এখনও দুবেলা খাওয়া জুটছে—তবু কিনা চুরির কথা মনে জেগেছে ? এর পর যদি দুদিন উপোস দিতে হয়—। ছি ছি ছি ! কী করে তুই—

কেন, ওরা আমাদের কয়লা নেয়নি ?

এক জায়গায় ইট-ঘেরা দিয়ে তিন ভাড়াটের কয়লা থাকে। সেখান

থেকে এ ওর দু-চার টুকরো কয়লা নেয়। নিজের কয়লা মজুত থাকলে না বলে নেয়। বোঝা গেলেও ধরার যো নেই। বাড়ন্ত হলে বলেকয়ে নেয়। না করা যায় না। দু-চার টুকরো কয়লাই তো!

তাই বলে ঘরের শেকল খুলে—। সোমত্থ মেয়ের গালে চটাস করে এক চড় কষিয়ে দিতে প্রাণ চায় মলিনার।

রেবা বলে, তাহলে নীলিমাদিকে বলি? আমরা চাইলে দেবে না, কিন্তু নীলিমাদি যদি চায়—

জানালা থেকে রেণু বলে, খবর্দার!

কেন? নীলিমাদি নিশ্চয়—

নীলিমাদির কাছ থেকে কাঁচি চেয়ে এনেছি, এরপর ময়দা চাইলে—

তা বটে! রেবা নিজের ভুল বোঝে। যা চালাক, ঠিক বুঝে যাবে।

হাবু বলে, আমি যাই মা?

কোথায়?

নাড়ুদারা মাছ ধরছে—

না। রোদে ঘুরে ঘুরে তুমিও বিছানা নাও—এক গুষ্টি—

বাঃরে, আর এতক্ষণ যে—

বাজে বকিস না!

কাগজে মলিনা উবুর হয়ে পড়ে—উত্তর ভিয়েতনামে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ—ভারতের নিরপেক্ষ নীতি পুনর্ঘোষণা—পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়—কী, ধাক্কাচ্ছিস কেন?

রববারের কাগজগুলো আমায় দাও।

কোথায় তোর রববারের কাগজ?

গাদার মধ্যে আছে। ডুবোজাহাজের গুপ্তধন বলে একটা গল্প বেরিয়েছে—আমি দেখেছি—

মলিনা সরে বসে। কাগজের স্তূপ হাঁটকে হাঁটকে সব কাগজ ছড়িয়ে ফেলে ডুবোজাহাজের গুপ্তধন বের করে নিয়ে হাবু তক্তাপোষে উঠে যায়। পিণ্টু মিন্টুর লুড়োর ছক উল্টে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে।

হাউমাউ করে ওঠে পিণ্টু মিণ্টু।

কানের কাছে চেঁচাবি তো মারব গাট্টা! দিনরাত লুডো। তাও যদি নিজেদের লুডো হত। ভাগ!

মলিনা ধমকায়, হাবু!

কাগজে ঝুঁকে পড়ে হাবু বলে, কেউ যেন আমায় ডিসটার্ব না করে। আমি এখন পড়ব। সাধন স্যার বলেছে আউট নলেজ না হলে 'এসে' লেখা যায় না। গেলি তোরা।

রেবা ডাকে, তোরা এখানে আয়রে! আমরা বরং কাগজগুলো কেটে কাজ এগিয়ে রাখি!

রেণু বলে, বিকেলেই কাঁচি ফেরত দিতে হবে, নীলিমাদি বলে দিয়েছে।

মলিনা বলে, কোথায় আঠা তার ঠিক নেই, কাগজ কেটে রাখি! কাগজের টুকরো সারা ঘরময়—। কী স্বার্থপর ছেলেমেয়েরা! সারাটা সকাল নিজেরা গোগ্রাসে খবর গিলেছে। কত ধরনের খবর! কত বাহারের খবর! ক্ষণে ক্ষণে মলিনাকে সে কথা জানিয়েওছে। মলিনা অবাক হলে ডবল অবাক হয়ে গিয়ে খোঁচা দিয়েছে—তুমি যেন কী! কোনও খবর রাখ না? তুমি না ক্লাস এইট অব্দি পড়েছিলে?

অবসর পেয়ে মলিনা যখন খবরে চোখ বুলনো শুরু করেছে—এক ছেলে এক মেয়ে দু গাদা কাগজ নিয়ে সরে গেল, আরেক মেয়ে চাইছে বাকিগুলি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে।

কাগজ কাটবি না ছোড়দি?

না। মলিনা গর্জে ওঠে।

কাগজ কাটার ভরসায় পিণ্টু মিণ্টু তক্তাপোষ ছেড়ে এসেছে। হাত পা ছড়িয়ে চিৎপটাং হয়ে তক্তাপোষে কাগজ পড়ছে হাবু। সেখানে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। জানালায় বড়দি। মেঝেয় কাগজের স্তূপ, মা, ছোড়দি। বারান্দায় আগুনের হল্লা। লুডো নিয়ে এখন ওরা বসে কোথায়?

কাঁদো কাঁদো মুখে দু-ভাই এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

ছোড়দি!

অ ছোড়দি!

আয়, তোদের একটা ধাঁধা দেখাই। কি দারুণ একটা ধাঁধা বেরিয়েছে দ্যাখসে।

ধাঁধা ?

বোস না।

পাছে ভাইদের ধাঁধা দেখানোর ছলে এই কাগজেও এক মেয়ে ভাগ বসায়, কাগজের স্তূপটা তাড়াতাড়ি কাছে টেনে নিয়ে মলিনা সরে বসে।

কাশ্মীরে পাকিস্তানী হানাদারদের নৃশংসতা—পৃথিবীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসন্ন—

বুকটা মলিনার ছ্যাঁৎ করে ওঠে। পৃথিবীতে ভীষণ দুভিক্ষ আসছে ? হ্যাঁরে ? বলে একবার বড় ছেলে একবার বড় মেয়ের দিকে তাকায়।

কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না।

ঝটপট কাগজের স্তূপটা উল্টে দেয় মলিনা—চতুর্থ যোজনায় বাইশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়—

বাইশ হাজার কোটি ! সতীশ অবিশ্যি মাইনে এখনো পায়নি। স্ট্রাইক না মিটলে পাবেও না। কবে স্ট্রাইক মিটবে কে জানে।

সতীশের মাইনে সাকুল্যে একশো পঁয়ষট্টি। দশ শোয় হাজার। এক শো হাজারে লাখ। একশো লাখে কোটি। এক কোটি। দশ কোটি। একশো কোটি। হাজার কোটি। বাইশ হাজার কোটি !

মাথা মলিনার ঝিমঝিম করে। দেশের জন্যে বাইশ হাজার কোটি টাকা খরচ ? দেশের উন্নতির জন্যে ? বেশ তো, চল্লিশ কোটি লোক আছে দেশে, খরচ না করে ওই টাকাটা তাদের দিক না। প্রত্যেকের ভাগে তাহলে তোমার পড়বে গিয়ে—

কিছু বুঝছি না ছোড়দি।

অত ছটফট করলে হয়। আবার দেখ। এই ছককাটা গোলকধাঁধায় লোকটা আটক পড়েছে, অনেকগুলি রাস্তা, কিন্তু একটি ছাড়া সবগুলিই খানিক দূর গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে কোনখান দিয়ে তবে বেরোবে ? পেন্সিল দিয়ে দাগা। চেষ্টা কর।

—বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা—এ রাম ! এই নাকি সুন্দরী ! তায় পৃথিবীর সেরা সুন্দরী ! ম্যাগো !—জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া বাঁচার উপায়

নেই—কে বলেছে ? শ্রীমতী—মেয়েছেলে ! মিটিং-এ দাঁড়িয়ে ! এক গাদা ব্যাটাছেলের সামনে ও কথা বলতে বাধল না ? ঘেন্না ! নিজে বাঁজা না তো ? নাকি বর জোটেনি ? তাই ক্ষেপে গিয়ে বেহায়ার বেহদ্দ হয়ে—ভারত পারমানবিক বোমা তৈরী করবে না—কী দরকার বাপু ! বোমা খেয়ে তো পেট ভরবে না। বোমার বদলে আরও চাল ডাল তেল তৈরী কর।——বোম্বাই বন্দরে এক হাজার ভরি সোনা উদ্ধার—তবে যে বলল সোনা আসা বন্ধ হয়ে গেছে ? সোনার দর একশো ষাট ? এখনই বেচে দেওয়া মওকা ? এই বলে তার শেষ সম্বল হারছড়া নিয়ে গেল ? সতীশ তাকে ধাপ্পা দিয়েছে ?—মণিপুরে পুলিশের গুলিতে ছয়জন নিহত—কেন ? মণিপুরেও এই অবস্থা ? ওরা না খালি নাচগান নিয়ে থাকে ? ওদেরও তাহলে পেটে টান পড়েছে ? মিছিল করে বেরোতে হয়েছে ? পুলিশের ওপর ইটপাটকেল—

মা দুই মেয়ে তিন ছেলে খবরের কাগজে মশগুল হয়েছিল। কখন যে সতীশ ঘরে ঢুকেছে টেরও পায়নি।

এ কী ! সতীশের গর্জন শুনে সবাই হকচকিয়ে যায়। তোমাদের না পই পই করে বলে গেলুম—

পাওয়া গেল না। কোথাও ময়দা—

পাওয়া গেল না ? ময়দা পাওয়া গেল না বলে ঘরে বসে দিব্যি সবাই মৌজ করে কাগজ পড়ছে ? নাকি মৌজ করে কাগজ পড়বে বলেই ময়দা না পাওয়ার অজুহাত দিচ্ছে ?

দেওয়া আশ্চর্য না। সকালে কাগজগুলি সে নিয়ে আসা মাত্র যেভাবে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ! কেউ সিনেমার পাতা, কেউ ছোটদের পাতা, কেউ রববারের পাতা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছিল !

ঘরে আস্ত ইনট্যাক্ট কাগজ আর 'এক্ষুণি মাঝারি এক হাজার দিয়ে যাচ্ছি' বলে সে নটবরের কাছ থেকে এক কিলো চাল আগাম নিয়ে এল ?

সারাদিন পরে কী ভাবে আজ রাতে আলু সেদ্ধ দিয়ে গরম গরম ভাত খাবে সারাটা পথ তাই ভাবতে ভাবতে এল !

সতীশের সাধ জাগে, চালের ঠোঙাটা ধরে ছুঁড়ে মারে। বউয়ের মাথায়। কিম্বা দুই মেয়ের মাথায়। কিম্বা তিন ছেলের মাথায়!

কিন্তু চাল বলে কথা!

সতীশ তাই করে কি, বাঁ হাতে বুকের সাথে ঠোঙাটা জাপ্টে ধরে প্রচণ্ড চিৎকারে ফেটে পড়ে। কাগজ পড়ছেন সবাই! কাগজ পড়ছেন! কাগজ! কাগজ। নিকুচি করি—। ডান হাতে রেণুর হাত থেকে রেবার হাত থেকে হাবুর হাত থেকে কাগজ টেনে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে। কাগজ পড়লে পেট ভরবে, অ্যাঁ? বলি কাগজ পড়লেই পেট ভরবে? গদাম করে বউকে একটা লাথি হাঁকাতেই প্রাণ চায়।

কিন্তু বাস্তবে সেটা সম্ভব নয় বলে সতীশ এক লাথিতে বউয়ের সামনের কাগজের স্তুপটাকে দেয় ছরকুটে।

দিনেশের দয়া-মায়া

অফিসে লেট হবার ভয় সকলেরই আছে। কাজকর্মের তাড়া আছে। মিনিট দশেকের মধ্যে ভিড়টা তাই ছরকুটে যায়।

কিন্তু দশ মিনিটেই কী হাল! কপালে আঁব, গালে কালশিরা, ঠোঁটে রক্ত, জামা ফালিফালি।

বুকটা দিনেশের টনটন করে।

তবু কি রেহাই আছে! ফরিয়াদী এখনও তড়পাচ্ছে। পুলিশ পাশে, ছুবনি ধরে দাঁড়িয়ে।

দশ মিনিটে পাঁচটি সিগারেট খতম করেছে, ছ' নম্বর ধরিয়ে দিনেশ এবার এগিয়ে যায়।

'কেন আর মিথ্যে—'

'মিথ্যে!' দিনেশের মুখোমুখি ফরিয়াদী গর্জে ওঠে। কমসে-কম পঞ্চাশ ছিল। দশ টাকার নোটই চারখানা, দু টাকার দুটো, এক টাকার তিনটে। তার ওপর খুচরো। তার ওপর মান্থলী। তার ওপর লটারীর টিকিট। লটারীর টিকিট ধরলে তো—। গলা ফরিয়াদীর বুজে আসে।

অমন দামী ব্যাগের শোকে গলার বুজে-আসাটা স্বাভাবিক। একই কথা বারবার বলার ক্লান্তিতে বুজে-আসাও স্বাভাবিক। দিনেশ সায় দেয়।

দরদী গলায় বলে, 'কিন্তু এই ভদ্রলোক—'

'ভদ্রলোক!' ফের গর্জায় ফরিয়াদী। যে পকেট মারে সে ভদ্রলোক? ভদ্রলোক পকেট মারে না। সুতরাং এ-গর্জনও স্বাভাবিক। দিনেশকে সায় দিতে হয়।

ফরিয়াদীর কথায় সায় দিয়ে আসামীর দিকে তাকায়। ফোঁপাচ্ছে। দু হাতে চোখ রগড়াচ্ছে।

দিনেশ তখন হাত ধরা মাত্র এই লোকটাই রুখে উঠেছিল কে বলবে! কেঁচোর মত কাঁচুমাচু এখন এই লোকটা!

দিনেশকে এখন চিনতে পারছে কি ?

'একে আপনি ভদ্রলোক বলছেন ?'

দিনেশ কেন বলবে। এমন হাভাতে চেহারা। তায় পকেটমারার দায়ে ধরা পড়েছে। কিন্তু এইমাত্র একজন বলে গেল না ? এক পাড়ার লোক বলে জানিয়ে গেল না ? অফিসের তাড়া আছে বলে থাকতে পারল না, কিন্তু দরকার হলে থানা থেকে ফোন করার জন্যে নাম ঠিকানা দিয়ে গেল না ?

তার কথা শুনেই না ভিড় ফাঁকা হল ?

'কিন্তু তাতে ব্যাগওলা ওই ভদ্রলোক—'

'অমন চোরের সাক্ষী—'

যথাসম্ভব নরম গলাতেই কথা শুরু করেছিল, ফরিয়াদীর ধমকে দিনেশ যায় চটে। চোরের সাক্ষী মানে ? কী বলতে চায় ?

'বেশ। ভালো। থানাতেই তবে নিয়ে যান। কিন্তু শেষে না নিজেই মুশকিলে পড়েন।'

'মুশকিল ? মুশকিল আবার কিসের মশায় ? হাতে নাতে ধরেছি—'

ধরেছি ! কার বাহাদুরি কে নেয় ? চিবিয়ে হেসে দিনেশ সুধায়, 'ধরেছেন ? বামাল ধরেছেন কি ?'

'পাচার করে দিয়েছে। কে না জানে এরা দল বেঁধে—'

'সাক্ষীসাবুদ আছে ?' চোখমুখ দিনেশ গম্ভীর করে। 'ট্রামের সব প্যাসেঞ্জার চলে গেছে। শুধু আমি আছি। ওকে মারধোর করতেই আমি শুধু দেখেছি, তার বেশি জানি না। আর আছেন ও ভদ্রলোক ফোন করার জন্যে যিনি নাম ঠিকানা দিয়ে গেলেন। কিন্তু ওঁকে সাক্ষী মানলে কি আপনার সুবিধে হবে ?' সিগারেটে লম্বা টান দেয়। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ে। 'সাক্ষী-সাবুদ ছাড়া কোন মামলা টেকে না জানেন নিশ্চয় !'

ফরিয়াদীর চোখমুখ এবার মুষড়ে পড়ে। এদিক ওদিক তাকায়। সাক্ষী-সাবুদ খোঁজে। ফলে ভিড়ের ঝড়তি পড়তি যে-দুচারজন ছিল, ঝটপট সরে পড়ে।

'বামাল ধরা পড়েনি, সাক্ষীসাবুদ নেই,'—গলা চড়ায় দিনেশ, 'ব্যাপারটা উল্টো দাঁড়িয়ে যেতেও পারে। গায়ের জ্বালায় নিরীহ ভদ্রলোককে

মিথ্যেমিথ্যি—' আসামীর দিকে তাকিয়ে দিনেশের বুকে মোচড় দেয় এরই পাশে সেই লোকটা ছিল—তাগড়াই চেহারা। অবাঙালীও। ঈশ! এর বদলে তার হাতটা যদি চেপে ধরত! দশ ঘার বদলে দু ঘা অন্তত ফিরিয়ে দিত। একপেশে মার খেয়ে এভাবে ধুঁকত না।

'তাই বলে—' ফরিয়াদী প্রায় হাহাকার করে ওঠে, 'তাই বলে এর কোন কিনারা হবে না? আজকালকার দিনে একটা নয় দুটো নয়—পঞ্চাশ-পঞ্চাশটা টাকা!'

হাহাকার স্বাভাবিক। সায়-দেওয়া দিনেশ বজায় রাখে। বামাল ধরা পড়েনি, সাক্ষীসাবুদ নেই, তার ওপর ব্যাপারটা উল্টো দাঁড়িয়ে যেতেও পারে।

আবার আজকালকার দিনে পঞ্চাশ-পঞ্চাশটা টাকা! দুটোই ভাবি দুঃখের ব্যাপার।

চু চু চু চু শব্দে দিনেশ সহানুভূতি জানায়।

'একটা আধলাও নেই। এখন হেঁটে যেতে হবে—বাড়িই ফিরি আর অফিসেই যাই! ফরিয়াদীর গলা ধরে আসে।

'যদি কিছু মনে না করেন—বাসভাড়াটা আমি—'

'কেন দেবেন আপনি? আমাকে চেনেন না-শোনেন না—'

'বিপন্ন মানুষকে মানুষ সাহায্য করে না? সে জন্যে চেনা-শোনার দরকার হয়?' দিনেশ দু'পা এগোয়। খপ করে এক হাতে ফরিয়াদীর হাত ধরে, আরেক হাত নিজের পকেটে গোঁজে। তিনটি দশ নয়া পয়সা বের করে তার হাতে গুঁজে দেয়। দু'হাতে সেই পয়সাওলা হাতটা মুঠো করে ধরে কাতরভাবে বলে, 'মনে করুন ধার নিলেন, ধার সুবিধে মত শোধ করে দেবেন। প্লিজ! আপত্তি করিবেন না! মানুষ যদি মানুষের জন্যে এটুকুও না করে—ওই যে বাস এসে গেছে—।' ফরিয়াদীকে প্রায় ধরে নিয়ে গিয়ে বাসে তুলে দেয়।

'আপনাকে কী বলে যে থ্যাংকস দেব—।'

মাত্র তিরিশ পয়সা দিয়ে ফরিয়াদীকে যে এত সহজে ও এমন তাড়াহুড়ো সরিয়ে দিতে পারবে, দিনেশ ভাবতেও পারেনি।

থ্যাঙ্কস দিয়ে গেল, কিন্তু ধার শোধ দিতে নাম-ঠিকানা জেনে নেওয়ার দরকারটা তো খেয়াল করল না? ইচ্ছে করেই করল না?

তা ত্রিশটা নয়া পয়সায় যদি পঞ্চাশটা টাকার শোকে সান্ত্বনা পায়. পাক আহা, পাক পাক। ফরিয়াদী যে বিদায় হয়েছে, ফরিয়াদীর অভাবে পুলিশটা আসামীর কাছ থেকে পিছন ফিরেছে—এই যথেষ্ট।

দিনেশ এসে লোকটার হাত ধরে। সঙ্গে সঙ্গে সে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

'কেঁদে আর কী করবেন বলুন।' দিনেশ সান্ত্বনা দেয়। 'দিনকে দিন মানুষ অমানুষ হয়ে উঠছে। দয়া মায়া বলে কিছু নেই। আইনকানুনের ধার ধারে না। জানে না যে পকেটমার কেন, খুনীর গায়েও হাত তোলার রাইট কারো নেই—তবু—'

'আমি পকেট মেরেছি ? ভগবান !'

পকেট-মারা না-মারার কথা নয়, দিনেশের প্রতিবাদ পকেটমারকে মারধোর করার বিরুদ্ধে। এমন অমানুষিক মারধোর।

কিন্তু তার কথায় লোকটা নতুন করে ফুঁপিয়ে ওঠায় দিনেশ অপ্রস্তুত হয়। বলে, 'না না, আপনি পকেট মেরেছেন—ছি ছি—। আপনি নির্দোষ আমি জানি। আমি জানি বলেই না—আমি বলছিলাম কি—'

ফোঁপানির টানে ফের দু'চার জন লোক জমে যায়। পুলিশটাও গুটি গুটি ফিরে আসে।

বক্তব্য দিনেশ মুলতুবি রাখে। এখনই এ-তল্লাট ছাড়া দরকার। তখন লোকটা ডাক ছেড়ে কাঁদলেও পকেটমারের-মার-খাওয়া কান্না বলে কেউ বুঝবে না। পকেটমারের-মার-খাওয়া মানুষের সান্ত্বনা-দাতা হিসেবে দিনেশকেও কেউ দেখবে না।

দিনেশ তখন আজকালকার মানুষের দয়াহীনতার মায়াহীনতার আইন-কানুনের পরোয়াহীনতার স্বপক্ষে যত বড় ইচ্ছে, যতক্ষণ পারে লেকচার দিয়ে যেতে পারবে।

'চলুন—।' দিনেশ হাত ধরে টানে।

কিন্তু পা বাড়াতেই পড়ে যেতে হয় দরদের ডোবায় :

'ঝুট মুট সবাই একে—'

'এমন মানুষ কখনো পকেট মারতে পারে। দেখেই বোঝা যায়—'

'দেখতে যে গরীবের মত।'

'হুঁ! বড়লোকরা সব ধোয়া তুলসীপাতা! চুরি-জোচ্চুরি কি তাঁরা করেন ?'

'তারা মারে তো গন্ডার, লোটে তো ভান্ডার—'

'আরে থামুন মশায়—কত শালার বড়লোক ছুঁচো মেরেও চার্টীন খায়।'

'একদল লোক আছে, বুঝলেন স্যার, পকেটমারকে পেটবার জন্যেই ট্রাম-বাসে ঘুরে বেড়ায়—হন্যে হয়ে থাকে—'

'আহা! জামাটা একেবারে—'

'উঃ! ঠোঁটটা—'

'এক্ষুনি আইডিন দেওয়া দরকার। নইলে সেপটিক হয়ে—'

'ডেটল ফেটল হলেও—'

দিনেশের মত ধোপদুরস্ত তরুণ যুবা দরদ দেখাতে এগিয়ে এসেছে, এরা না এসে পারে। সদর রাস্তায় দরদ-দেখানোর এমন সুযোগ সহজে মেলে!

অথচ, দিনেশ স্পষ্ট দেখেছে, ট্রাম থেমে পড়া মাত্র নেমে পড়ে সে যখন ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ায়—গেঞ্জি-পরা ওই লোকটা তখন মারমার শব্দে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। 'নামাও শালাকে' বলে ট্রাম থেকে এক হেঁচকায় নিজেই টেনে নামিয়েছিল।

কাটা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে 'উঃ'। বলে এখন শিউরে উঠল, কে বলতে পারে ঠোঁটের ওই কাটা-টা ওরই অবদান নয় ?

যাক, যাই করুক তখন উত্তেজনার বশে, এখন তো মায়ায় প্রাণ কাঁদছে। অনুতাপে সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়।

সবচেয়ে বেশি মাতব্বর মনে হয় বলে গেঞ্জি-পরাকে দিনেশ শুধায়, 'কাছাকাছি কোথাও ডাক্তারখানা আছে ?'

'আমাদের পাড়ায় ডাক্তারখানা থাকবে না! আসুন আসুন। ওই তো গলির মোড়ে নন্দী ডিসপেনসারি।'

'ডাক্তারবাবু এই মাত্তর বেরিয়ে গেল, সন্তাদা।'

'যাক, রাম আছে! আসুন স্যার, রামকে আমি বলে দিচ্ছি—ফিক্স হয়ে যাবে!' বলে গেঞ্জি-পরা আগে আগে এগোয়।

পিছনে লোকটার হাত ধরে দিনেশ। আশেপাশে জনাকয়েক। দস্তুরমত মিছিল একটা।

'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমায়। সেপটিক হয়ে মরি মরব। এরপর আমার মরণই ভালো।' লোকটি হুর্দম ফোঁপায়। হাত টানাটানি করে। করলেও ছাড়িয়ে নেবার মত জোরে করে না।

'একেই বলে দুর্দৈব। ভগবান যখন—'

'ভগবান!' যাদব চাটুয্যে শেষে কিনা পকেটমারের মার খেল! বেলেঘাটার সুরি লেনের যাদব চাটুয্যে!

তা ভগবান যখন তাই চান—জলজ্যান্ত জোয়ান ছেলেটাকে তিন দিনের জ্বরে ফুসলে নিয়ে, জামাইয়ের মাথা বিগড়িয়ে তিনটি কাচ্চাবাচ্চা সমেত বড় মেয়েটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, এই বয়সে দু'দুটো চাকরি করবার জন্যে জিনিষ-পত্রের দাম হু-হু বাড়িয়ে দিয়েও সাধ যখন ভগবানের মেটেনি, প্রকাশ্যে চোরের মার খাওয়ালেন—তখন ঠোঁট সেপটিক হয়ে মরে যাক যাদব! মরে যাওয়াই ভালো যাদবের!

গরীব হলেও, ডাল-ভাত খেয়ে একবেলা খেয়ে আধপেটা খেয়ে দিন কাটালেও পাড়ায় একটা মান-সম্মান ছিল। পাড়ায় ছিল, আফিসে ছিল। সর্বত্র ছিল।

এরপর? নিজের বউ ছেলেমেয়ের কাছেই মুখ দেখাতে পারবে? বিশ্বাস কেউ করবে না ঠিক, কিন্তু চুরি না করলেও চোরের মার-খাওয়াটা দরকার বুঝলে ভবিষ্যতে বিশ্বাস করবে? তখন খোঁটা দেবে?

তার ওপর আস্ত জামাটা কুটি কুটি হয়েছে, সস্তায় আজ হাওড়ার ব্রীজ থেকে বাজার করে নিয়ে যাবে বলে পরশু থেকে বাজার বন্ধ রেখে যে টাকাটা এনেছিল—

আইডিন ছোঁয়াতেই আঁ-আঁ করে শিউরে শিউরে উঠছিল, জামা ও টাকার কথা বলতে বলতে কম্পাউণ্ডারকে ঠেলে সরিয়ে দু'হাতে যাদব একবার বুক চাপড়াতে শুরু করে।

পিঠে হাত বুলোয় দিনেশ।

'একটা এ্যাণ্টি টিটেনাস দেবেন নাকি কম্পাউণ্ডারবাবু।'

'দরকার নেই।'

'আমাকে বিষ দিন কম্পাউন্ডারবাবু একদলা বিষ দাও ভাই আমাকে। এ-মুখ আর আমি— ' দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্না জুড়ে দেয়।

দিনেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কম্পাউন্ডার বলে, 'একটু গরম দুধ খাওয়াতে পারলে ভালো হয়। উইক হার্ট, তার ওপর শকটা—'

'দুধ ? গরম দুধ খাওয়াতে বলছিস রাম ? আমাকে বলবি তো। উনি এ পাড়ার কী জানেন ? গেঞ্জি-পরার গলা গমগমিয়ে ওঠে। 'চলুন স্যার, মহামায়া মিষ্টান্ন ভান্ডারে—ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। অ দাদু, উঠুন, উঠুন দাদু।' বগলের তলায় হাত দিয়ে যাদবকে দাঁড় করায়। কাঁধে বয়ে নিয়ে যেতে পারলে বর্তে যেত।

'ওষুধের দামটা—'

'দিতে হবে না স্যার। হ্যাঁরে রাম, দিতে হবে ?'

কম্পাউন্ডার প্রথমেই মাথা নেড়েছিল, প্রশ্নের চোটে থতমত খেয়ে এখন ভীষণ ভাবে নাড়ে।

এক পাশে গেঞ্জি-পরা, আরেক পাশে দিনেশ—মাঝখানে যাদব চাটুজ্জে। মিছিল এবার আরও ভারী।

গরীব হলেও ভদ্রলোক। জাতে বামুন। বামুন ভদ্রলোক বিনা দোষে সাত চোরের মার খেয়েছে। দিনেশ নামে ধোপদুরস্ত এক তরুণ যুবা তাকে কোর্ট-আদালতের ঝামেলা থেকে উদ্ধার করেছে। ফার্স্ট এড দেওয়া হয়েছে, গরম দুধ খাইয়ে চাঙ্গা করতে তাকে এখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পাড়ার সন্তা দত্ত এই ব্যাপারে পুরো সহযোগিতা করছে। নেতাও বলা যায়। মিছিল ভারী হওয়া কিছু বিচিত্র না।

চারপাশে তাকিয়ে দিনেশ বড় তৃপ্ত বোধ করে। দিনকে-দিন যত নাজেহালই হোক মানুষ, দয়ামায়া তার বুক থেকে আজও উবে যায়নি, কখনো যাবে না।

সাময়িকভাবে কোণঠাসা হতে পারে, কিন্তু তেমন মওকা পেলে ঠিক বেরিয়ে আসবে। যুগ-যুগান্তের ট্র্যাডিশন আছে না দয়ামায়ার।

যাদবের জন্যে সবাই যেভাবে দরদে সশব্দে খাবি খাচ্ছে, চাঁদা তোলার প্রস্তাব করলে দ্যাখ-দ্যাখ করতে করতে কোন না পাঁচশো হাজার উঠে যাবে। ওই সন্তা দত্তই—

গেঞ্জি-পরার দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকায় দিনেশ। পাকানো চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ—কিন্তু দিনেশের চেয়ে হিম্মৎ ধরে বেশি। সারাটা পাড়া ওর কথায় ওঠ্-বস্ করে। পাঁচশো হাজার টাকা চাঁদা তুলতে পারে, পাঁচশো হাজার চড়-চাপড় চাঁদা তুলে দিতেও পারে।

আর দিনেশ!

গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস দিনেশ গিলে ফেলে।

ভাবে, যাবে নাকি এক্ষুনি শাকরেদ বনে সন্তা দত্তর? ধড়াচুড়া ছেড়ে ফেলে গেঞ্জি গায়ে সন্তার পরণে যেহেতু পায়জামা, সে শুধু আণ্ডার প্যাণ্ট পরে?

দয়ামায়া দেখানোর ব্যাপারে যেভাবে সন্তা টেক্কা মেরে দিলে—দিনেশের কি এবার উস্তাদ বলে ওর কাছেই নাড়া বাঁধা উচিত নয়?

'আসুন।'

দোকানে যাদব ঢুকবে না।

হাত ধরে টানায় যদিও বা ঢুকল, দুধ কিছুতেই খাবে না।

কিন্তু প্রথমে দিনেশ, দিনেশকে ছাপিয়ে সন্তা, সন্তাকে ছাপিয়ে বাকি সবাই এবং সব্বাইকে ছাপিয়ে মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের খোদ মালিক কেষ্ট ঘোষ এসে এমনই অনুরোধ উপরোধ মিনতি জানায় যে ভাঁড়ে যাদবকে চুমুক অগত্যা দিতেই হয়। চোখের জল মেশানো ঘন-করে-জ্বাল-দেওয়া দুধের ভাঁড়ে।

'একটা মিষ্টি খেলে—'

'সন্দেশ—'

'উঁহু, সন্দেশ শুকনো, রসগোল্লা—'

'রসগোল্লা নয়, রাজভোগ—'

পাঁচ জনের পরামর্শ শুনে নিয়ে সন্তা শুধায় দিনেশকে, 'কী স্যার? রাজভোগই ভালো—সকালের তৈরি। কেষ্টদাও, ভেরি গুড ম্যান, কাইণ্ড ম্যান, দাম নেবে না। নেবে কেষ্ট দা?'

প্রশ্নের চোটে কম্পাউণ্ডারের মত কেষ্ট ঘোষও থতমত খেয়ে ঝটপট মাথা নাড়ছিল, কিন্তু তার আগেই দিনেশ বুক পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে।

সন্তা হাঁ-হাঁ করে ওঠে। হাত জোড় করে দিনেশ বলে, 'দামটা আমায় দিতে দিন, সন্তাবাবু। আমারও তো প্রাণ চায় ওঁর জন্যে কিছু করি। চোখের সামনে অতবড় অন্যায়টা দেখেও প্রতিবাদ করতে পারিনি, সন্তাবাবু! সাহসের অভাবে পারিনি। অথচ আমিও ওই ট্রামে ছিলাম।' বলতে বলতে সকলের দিকে ফিরে ফিরে চায়। শুনুক সকলে—দুর্বল হলেও নিজের দুর্বলতার কথা মুখ ফুটে জানাবার সাহস দিনেশের আছে। মায়াদয়া আছে। 'ওষুধের দাম দিতে দিলেন না, কিন্তু দুধের দামটাও না দিতে পারলে আমার মন মানবে না, সন্তাবাবু।'

'দিন তবে।' সন্তা বলে, 'তাহলে তুমি এক কাজ করো কেষ্টদা, গোটা বারো রাজভোগ একটা ভাঁড়ে দিয়ে দাও। গোলাপ জল দিও কিন্তু।'

'তা ভালো।' দিনেশ বলে, 'কিন্তু তার দামও আমি দেব।'

'তার দামও আপনি দেবেন! তাহলে—?' হঠাৎ অসহায়ের মত তাকায় সন্তা।

পাশ থেকে একজন বলে, 'ওঁর একটা জামাটামা দরকার। এই জামা গায়ে—'

'আমি একটা জামা নিয়ে আসব সন্তাদা? ছুটে গিয়ে বাড়ি থেকে—'

'বাড়ি থেকে—'

'আমার বাবার একটা জামা-—'

'না, বাড়ি থেকে আনতে হবে না। জামা যদি দিতেই হয় পুরনো কেন? আসুন স্যার। আসুন দাদু!'

মিছিলে এবার আরও ভারী।

নিউ জয়হিন্দ বস্ত্রালয়ে গিয়ে মিছিল থামে!

'গগনা, এ ভদ্রলোকের গায়ের মাপে একটা জামা বের কর দেখি। ভালো জিনিস দিবি, বুঝলি।'

কান্না ভুলে যাদব এতক্ষণে হকচকিয়ে গেছে। ফোলাফোলা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে ইতিউতি তাকায়। সন্তা যখন ঝুলি ঝুলি তার জামাটা খুলতে যায়, ছোট ছেলের মত দু'হাত তুলে স্পীকটি-নট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্তা অবশ্য জামা খোলায় মেহনত করে না, টেনেটুনে ছিঁড়ে ছুঁড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দেয়।

'ওকি—শার্ট দিচ্ছিস কেন ?

'তলায় পাঞ্জাবি আছে।'

'উঁহু, পাঞ্জাবীর বাক্‌স বের কর! এসব রদ্দি মাল। বেস্ট কোয়ালিটি দেখা। বেপাড়ার খদ্দের। পাড়ার প্রেস্টিজ—'

'আদ্দি দেব, চলবে ?'

'কেন চলবে না। আদ্দি ইনি পরতে পারেন না ?'

যাদবের আধময়লা ধুতির দিকে তাকিয়েই টুইলের শার্ট—লংক্লথের পাঞ্জাবীর বাক্স, গগন বের করেছিল, সন্তার প্রশ্নের চোটে ঘাবড়ে গিয়ে বলে 'কেন পারবেন না। বাঃ! আদ্দি ছাড়া এই গরমে—'

গগন পাঞ্জাবীর বাক্‌স বের করে। সন্তা বাক্‌স খুলে একটা পাঞ্জাবী বেছে নিয়ে যাদবকে পরিয়ে দেয়।

আধময়লা ধুতির উপর নতুন আদ্দির পাঞ্জাবী—যাদবের দিক থেকে দিনেশ খানিকক্ষণ চোখ ফেরাতে পারে না। দোকানের বাইরে রাস্তার আলোয় পোশাকটা আরও কত খোলতাই হবে কল্পনা করে হাসি পাব-পাব হয়। কিন্তু হাসা অন্যায়। জনগণ যখন এই চায়, জন-প্রতিনিধি হিসেবে সন্তা দত্ত যখন এই প্রেসক্রুপসনই করেছে,—দিনেশের বাধা দেওয়ার কোন রাইট নেই।

দয়ামায়া কি দিনেশের একচেটে ?

'এবার ঠিক আছে তো, স্যার।'

'চমৎকার!'

'গগনা, তোর বাবাকে বলিস—ওকি, আপনি দাম দিচ্ছেন কেন ? না না,—'

সমস্বরে প্রতিধ্বনি ওঠে, 'না না।'

দিনেশ হাত জোড় করে বলে, 'আমাকে দিতে দিন সন্তাবাবু। নইলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। আপনারা তো কম করলেন না। দোহাই আপনাদের।' ঘুরে-ফিরে সকলকে জোড় হাত দেখায়।

'এমন করে যদি বলেন—'

অমন করে বলা ! দরকার হলে দিনেশ সকলের হাতে পায়েও ধরত। যাদবের জন্যে দয়ামায়া না দেখিয়ে সে পারে। যদিও তাকে কেউ দয়ামায়া দেখায় না, সব জায়গায় দূর দূর ছাই ছাই শুনতে শুনতে বি-এ ডিগ্রীওলা তিরিশ বছরের স্বাস্থ্যবান জীবনের ওপরে তার ঘেন্না ধরে গেছে—কিন্তু চোখের সামনে দেখা সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে বুকটা এখনও কি থেকে থেকে মোচড় দিয়ে উঠেছে না ?

'তবে হাফ দাম দেবেন কিন্তু।'

'হাফ দাম ?'

'পুরো দিলে ও নেবে না। কিরে গগনা নিবি ?'

প্রশ্নের চোটে ধড়ের ওপর গগনের মুন্ডুটা নড়বড়িয়ে ওঠে।

নিউ জয়হিন্দ বস্ত্রালয় থেকে নেমে দিনেশ রিকশা ডাকে।

কোথায় যেতে হবে জেনে-নেওয়ার পর কত ভাড়া দেবে জানতে চাইলে রিকশাওয়ালাকে জোরসে এক ধমক হাঁকিয়ে সন্তা বলে, 'ভাড়া ? পাড়ামে ভাড়াকে লিয়ে হুজ্জোত করতা হ্যায়, রঘু ?'

'ভাড়া ফিরে এসে আমার কাছে নিস। হাম দেগা—বুঝলি ?'

'সন্তাবাবু—' ফের দিনেশ হাত জোড় করে।

'আপনি জানেন না স্যার, এই মেড়োগুলো বাংলা দেশের রক্ত চুষে—'

দিনেশ সায় দেয়। রক্ত চোষার দিকে তাকিয়েই দেয়।

'আইয়ে বাবু। যো আপকো মর্জি চাহে দিজিয়ে গা।' রাস্তায় রিক্সা পেতে গামছায় ঘাড়-গলা রগড়ে নিয়ে পরম সমাদরে রঘু দিনেশকে ডাকে।

আগে যাদবকে তুলে দেয়, তারপর সমবেত জনতাকে থ্যাঙ্কস—ধন্যবাদ মোবারকবাদ দিয়ে দিনেশ ওঠে।

হাত নেড়ে নেড়ে সন্তা দত্ত সী-অফ জানায়।

বেলেঘাটা পর্যন্ত দীনেশ অবশ্য যায় না।

রিকশাওয়ালা ভাড়া বাবদ দু'টাকা, যাদবের সেই বাজারের টাকা,—মোট তিনটি টাকা যাদবের নূতন পাঞ্জাবীর পকেটে গুঁজে দিয়ে সিকি মাইল পরেই নেমে যায়।

'আপনি যে আমায় আজ কী করলেন—'

'আমায় আপনি বলবেন না। আমি আপনার ছেলের বয়সী।'

'আমার ছেলে। আমার বড় ছেলেটা বেঁচে থাকলে—' যাদব হিক্কা তোলে। 'আবার দেখা হবে। আসি, কেমন ?'

'আসুন। ভগবান আপনার—তোমার নামটা বাবা ?'

'আমার নাম ? ঢোক গিলে দিনেশ বলে, 'শশাঙ্ক, শশাঙ্ক হালদার। জনসন কোম্পানী আছে না ? ম্যাঙ্গো লেনে ? আমি সেখানে কাজ করি। আচ্ছা ? নমস্কার ঠুকে হনহন পা চালায়।

যেমন শশাঙ্ক হালদার তেমনি জনসন কোম্পানি! দুই যাক জাহান্নামে।

একুনে কত খরচ হল ? ফরিয়াদিকে বাস-ভাড়া বাবদ তিরিশ নয়া, দুধের দাম পঞ্চাশ নয়া, বারোটা রাজভোগ তিনশো নয়া, কিন্তু দয়া দেখিয়ে কনসেশন দেওয়ায় মোট আড়াইশো নয়া, হাফ প্রাইসে পাঞ্জাবী তিনশো নব্বুই নয়া, রিকশা ভাড়া দু'শো নয়া, বাজারের লোপাট হওয়া টাকা বাবদ একশো নয়া—সাকুল্যে তোমার হল গিয়ে—

যতই হোক পাঁচ হাজার নয়া-র অনেক কমই হবে। অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকার মূলধনে দয়ামায়ার বনেদী কারবারে নীট মুনাফা ভালোই থাকবে।

রেস্তরাঁর কেবিনে ঢুকে দিনেশ স্রেফ এক কাপ চায়ের অর্ডার দেয়।

চায়ের অর্ডার দিয়ে সিগারেট ধরায়।

তারপর বাঁ দিকের পকেট থেকে রুমাল চাপা ব্যাগটা বের করে।

খোলে।

ট্রামের মান্থলী। লটারীর টিকিট। কয়েক আনা খুচরো। দু'টাকার নোট দুটো। এক টাকার তিনটে। কিন্তু—

কিন্তু দশ টাকার সেই চারটে নোট ? দশ টাকার সেই চারটে নোট ? দশ টাকার সেই চারটে নোট ?

জড়িয়েই ধরত। কিন্তু বেলা এই সওয়া দশটায়, হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে সেটা তো আর সম্ভব নয়—দুজনে দুজনের তাই হাত চেপে ধরে প্রাণপণে।

'ঈস্‌, কদ্দিন পরে দেখারে!'

'সত্যি!'

'মনে হয় যেন কত যুগ, না?'

'সত্যি!'

'যেন আরেক জন্মের কথা!'

'তাই!'

অর্থে আবেগে কলকলিয়ে ওঠে মহিম, কেদার শুধুই সায় দিয়ে যায়। মহিমের মত সে গুছিয়ে কথা বলতে কোনদিনই পারে না, তাই এখন এই চমকের ঘোর।

এ চমকে কেবল দীর্ঘকাল পরে বাল্যবন্ধুর সাথে আচমকা দেখা হয়ে যাওয়ার নয়, বাল্যবন্ধুর দিকে তাকিয়েও। ওঃ, কী লম্বা হয়ে গেছে মহিমটা! লম্বা কিন্তু মানানসই। ফ্যাকাশে? উঁহুঃ, গায়ের রঙ আরও ফর্সা হয়েছে। চমৎকার চুলের বাহার। পরনে ধোপদুরস্ত শার্ট-ট্রাউজার।

কে বলবে এই সেই মহিম—সাধনবাবুর ভয়ে যে টেরি কাটত না, মালকোচা দিত না, শার্টের হাতা গুটোতো না, বোতাম না থাকলে সেফ্‌টিফিন দিয়ে গলা আটকাত!

তারপর আছিস কেমন? কাকাবাবু কাকিমা ভালো আছেন? বড়দি ভালো আছে? বুঁচির বিয়ে হয়ে গেছে? মিনু এখন পাক্কা লেডী হয়ে উঠেছে, না? পিশিমার ছুঁচিবাই তেমনি আছে?'

জিজ্ঞাসার ঝড় বইয়ে দেয় মহিম।

এবং একটানা সায় দিয়ে যায় কেদার। ঘাড় নাড়ে আর ভাবে—তারও জিজ্ঞেস করা উচিত কেমন আছেন জ্যাঠামশাই-জ্যেঠিমা, মানিকদা, মালতীদি, মনো বিয়ে হয়ে গেছে কিনা।

কিন্তু মহিম তাকে মুখ খোলার সুযোগ দিলে তো!

অবশ্য সুযোগ না পাওয়ায় ভালোই হয়েছে। কেননা মহিমকে দেখে সে-ও যথারীতি খুশি হয়ে উঠলেও মহিমের মত উচ্ছ্বসিত ভাবে নিজের খুশীকে জাহির করতে পারত কি? পারত মহিমের মত অমন গুছিয়ে বলতে—গলার স্বরের সরগম সেধে?

কেদারের মনে পড়ে ইসকুলের কথা—এক ক্লাসেই দুজনে পড়ত, দুজনেই ভালো ছাত্র। দুজনের বন্ধুত্বও ছিল জমজমাট। যেখানে কেদার সেখানে মহিম। কিন্তু কেদার যেন মহিমের ছায়া। ছেলেরা তাই নিয়ে যা-তা বলত: মানিকজোড়! চখা-চখী! কপোত-কপোতী!—কত কি! বোর্ডে ছড়া লিখে রাখত। আড়ালে বড়রা পর্যন্ত হাসাহাসি করত। ব্যতিক্রম শুধু সাধনবাবু।

সাবাস! দরাজ গলায় সাধনবাবু বলতেন, এই তো চাই। একেই বলে অনেস্ট কর্মাপিটিশান। পরীক্ষার বেলায় ভাববে চরম শত্রু, অন্য সময় পরম মিত্র। জীবনে উন্নতি করতে হলে—

কী চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারতেন সাধন মাস্টার!

কেদারের কাঁধে হাত রেখে মহিম বলে, 'চল, চা খেয়ে আসি।'

'চা খাবি?'

'চা খাওয়া মানে খানিক গল্প করা আর কি!' কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে মহিম, ফিশ্‌ ফিশ্‌ করে বলে 'ওই দ্যাখ, সবাই আমাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে, মেয়ে দুটো যেন কী বলাবলি করছে। চল কেটে পড়ি—।'

চায়ের নামে কেদার উৎসাহিত হয়ে উঠছিল, চা খেতে যাওয়ার কারণ শুনে থিতিয়ে যায়: হাঁ করে সকলের চেয়ে থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। মেয়ে দুটির নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করাও। ওরা তো আর জানে না একদিন কী সম্পর্ক ছিল কেদার আর মহিমের মধ্যে। ওরা শুধু দেখেছে স্যুট-পরা এক বাঙালী সাহেব কাঁধে হাত রেখেছে এমন একজনের—পরনে

যার আধময়লা আটহাতি ধুতি, গায়ে টুইলের ছেঁড়া পাঞ্জাবি, পায়ে টুটাফাটা চটি।

নিজের চেহারাটা কল্পনা করে অস্বস্তিতে কেদার ছটফটিয়ে উঠে।

'চা— ! এখন চা !'

'কেন ? তোর তাড়াতাড়ি আছে নাকি ?

'তা একটু— ।' কেদার বোকা বোকা হাসে : তাড়াতাড়ি আছে বটে, সাড়ে দশটার মধ্যে রায়বাবুর কাছে যাওয়া দরকার, কিন্তু সেজন্যে নয়— তাড়াতাড়ি এখন ছাড়াছাড়ি হওয়া দরকার। কেননা চা খেতে মহিম কি আর হেঁজিপেঁজি দোকানে ঢুকবে ? হয়তো 'দেলখোসে' নিয়ে তুলবে ? সেখানেও কি বয়গুলো এমনি ভাবেই চেয়ে থাকবে না ? তাদের দুজনকে একসাথে দেখে অবাকের বেহদ্দ হয়ে যাবে না ?'

মহিম বলে, 'তাড়াতাড়ি অবশ্য আমারও একটু আছে। থাক তবে, পরে দেখা হবে, কেমন ? রোববার ? থাকিস কোথায় ?'

কেদার যেখানে থাকে সেখানে যাওয়া কি মানাবে মহিমের ? কেদার যেন স্পষ্ট দ্যাখে—বস্তির গলি দিয়ে মহিম চলেছে, তার পিছনে পিছনে সারা বস্তির লোক।

কেদার বলে, 'আমার দোকান এই কাছেই।'

'দোকান ? অ তুই তো ইলেকট্রিকের কাজ শিখেছিলি, দোকান দিয়েছিস ? বাঃ, বেশ বেশ। শুনে ভারি খুশী হলুম।'

সত্যিই মুখখানা যেমন খুশী-খুশী হয়ে উঠেছে মহিমের, কেদারের ভয় হয়, এই বুঝি তার পিঠ চাপড়ে দেয় মহিমের হাতটা। কিংবা গলা জড়িয়ে ধরে। পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হলে যেমন পিঠ চাপড়ে দিত, গলা জড়িয়ে ধরত। বন্ধুগর্বে বুক ফুলিয়ে, অনেস্ট কমপিটিশনে হেরে গিয়ে।

অথচ মহিম যেবার ফার্স্ট হত, কেদার কি খুশী হত না ? বন্ধুর জন্যে তারও কি গর্ব হত না ? তারও কি বন্ধুর পিঠ চাপড়ে দেবার, গলা জড়িয়ে ধরার সাধ জাগত না ?

জাগত না আবার ! অংকে ও সংস্কৃতে পিছিয়ে থেকেও ফার্স্ট হওয়া চাট্টিখানা কথা !

কিন্তু কেদার কি কোনদিনও মহিমের পিঠ চাপড়াতে পেরেছে, গলা জড়িয়ে ধরতে পেরেছে—প্রাণে সাধ উথলে উঠলেও ?

কেদার চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—অতীতের কথা ভেবে। বর্তমানের দিকে চেয়ে ঃ বেশ বোঝা যায়, মহিমটা দিব্যি আছে। ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল, আই-এ বি-এ পাশ করে কোন্-না হোমরা-চোমরা চাকরি বাগিয়েছে। জিজ্ঞেস করবে নাকি—কোথায় চাকরি করছিস ? থাক। যদি বলে, 'আমি লাট সাহেবের পি-এ'—কেদার কি পারবে ওর পিঠ চাপড়ে দিতে !

ভারিক্কি চালে মহিম বলে, 'টেকনিক্যাল লাইনই বেস্ট। মনে আছে, তখন তুই বেঁকে বসেছিলি ? আজ বুঝছিস তো কাকাবাবু ঠিকই করেছিলেন ?'

দস্তুরমত সায় দেয় কেদার ঃ বোঝেনি ! হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। বন্ধুকে দেখে মর্মে মর্মে বুঝছে। বাপটা তার মরার দাখিল না হলে বন্ধুকে এক্ষুনি টেনে নিয়ে গিয়ে হাজির করত তার সামনে। বলত—দ্যাখ বাবা, চোখ চেয়ে দ্যাখ, মহিমের চেয়ে বেশিবার ফার্স্ট হলেও, দু-দুটো লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করলেও কলেজে পড়ানোর বদলে ইলেকট্রিক-মিস্তিরি বানিয়ে কী সর্বনাশ আমার করেছ তুমি। টেকনিক্যাল লাইনই বেস্ট ! কেন তুমি সেদিন মুখ ফুটে বলনি যে ছেলেকে কলেজে পড়াবার সাধ্যি নেই তোমার ? কেন পরের কথায় নেচে বলেছিলে যে স্বাধীন ভারতে গ্রাজুয়েটের চেয়ে কারিগরের কদর হবে ঢের বেশী ? তুমি অমন জিদ না ধরলে টিউশনি করে, খবরের কাগজ ফিরি করে, পার্টটাইম চাকরি করেও কলেজে আমি পড়তে পারতুম। ভালভাবে পাশও করতুম। আজ তা হলে আমাকে—

দাঁতে দাঁত ঘষে কেদার। মরণাপন্ন বাপের উপর প্রচন্ড একটা আক্রোশ ঘাই দিয়ে ওঠে কেদারের মনে। সংগে সংগে বন্ধুর ওপরেও মনটা যায় বিরূপ হয়ে : পিঠ চাপড়ানোর নামে সান্ত্বনা দিচ্ছে ! বড়লোকেরা যেমন গরিবদের দিয়ে থাকে। সান্ত্বনার বুলি শুনিয়ে আদর্শের লেকচার ঝেড়ে বড়লোক হয়েও বজায় রাখে নিজেদের মহত্ত্ব। নিজেরা চিরকাল বড়লোক হয়ে থাকবার আর গরিবদের চিরকাল গরিব করে রাখবার মতলবে।

গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে কেদার। 'এখন তাহলে'—

'যাবি? আচ্ছা আয়। রোববার দেখা হচ্ছে, কেমন? কত কথা যে বলার আছেরে—উফ্! হ্যাঁ, তোর দোকানের ঠিকানাটা— ?'

'তিনের দুই রামতনু স্ট্রীট, শ্যামপুকুর। প্রভা ইলেকট্রিক্যাল স্টোর্স।'

'প্রভা? অ, বুঝেছি বুঝেছি'! মহিম চটুল হাসে, 'বেশ বেশ!'

: বুঝেছ তুমি কচু! শ্যামপুকুর পৌঁছে রামতনু স্ট্রীটের খোঁজেই তোর জন্ম কাবার হবেরে মহিম, প্রভা ইলেকট্রিক্যাল স্টোর্সের হদিস পাওয়া তো দূরের কথা।

বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হনহনিয়ে হাঁটে কেদার। দশটা পঁয়ত্রিশে রায়বাবুর বাড়ি গিয়ে শোনে আটটার ট্রেনে রায়বাবু দেশে চলে গেছে, ফিরবে কবে বলে যায়নি।

অবশ্য রায়বাবুর সাথে দেখা হলে আজ কিছু হত না, কেদার জানে। মিস্ত্রিমজুরদের পাওনা বাবুরা সহজে মেটায় না। দশ দিন ঘোরাবে, বারবার খোশামোদ করাবে, হাতে-পায়ে ধরাবে—তবেই না উঁকিঝুঁকি মারবে বাবুদের দয়াধর্ম। হকের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার দয়া, গরিব মানুষকে দয়া করার ধর্ম! বাবুদের নাড়িনক্ষত্র জানে কেদার: দরকারের সময় বাবা-বাছা বলে কাজ করিয়ে নেয়, টাকা দেওয়ার সময় আজ নয়, কাল। কাজের সময় সোমত্থ মেয়েকে দিয়ে চা পাঠায়, তাগাদায় গিয়ে সদর পেরলেই 'হুট করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লে যে!'—বলে খেঁকিয়ে ওঠে।—'যত্ত সব চোরছ্যাঁচর ছোটলোক! বাইরে থেকে ডাকতে পার না?'

চোরছ্যাঁচর ছোটলোক! স্বাধীন ভারতের কারিগর!

প্রথম যে-বন্ধুকে দেখে খুশী হয়েছিল, খানিক পরে যে-বন্ধুর ওপর বিরূপ হয়ে গিয়েছিল—এখন সেই বন্ধুর প্রতি অকথ্য ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে যায় কেদারের মন।

অকথ্য ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে যায় আর-এক বন্ধুর মন-ও।

বিকেলে, ইণ্টারভিউয়ের বদলে পুলিশের লাঠি খেয়ে, ডাইং-ক্লিনিং থেকে ধার-করা প্যাণ্টে কাদা মাখিয়ে, সবেধন নীলমনি শার্টটা ছিঁড়ে, খিদেয়-তেষ্টায় ধুঁকতে ধুঁকতে পথ হাঁটে মহিম আর ভাবে—বেশ আছে কেদার। তোফা আছে।

একটি উপন্যাসের বিজ্ঞপ্তি

আমি একটি উপন্যাস লিখব। নাম দেব তার পরমপুরুষ।

উপন্যাসের বক্তব্যের সংগে নামটি চমৎকার মানানসই। নামের দৌলতে বইটাও হটকেক অর্থাৎ গর্মাগ্রম ফুলুড়ির মত বিক্রি হবে। ফলে সততাও বজায় থাকবে, ব্যবসাতেও বাড়বাড়ন্ত। সততা বজায় রেখে ব্যবসায় বাড়বাড়ন্ত!

উপন্যাসটি হবে নায়কপ্রধান। নায়কের নাম?

শান্তিরঞ্জন-ই সংগত।

কিন্তু তাতে অসুবিধে আছে। পাঠক ভাববে, মওকা পেয়ে নিজের পাবলিসিটি করে নিচ্ছি। শুধু টাইটেল নয়, পাতায় পাতায় নিজের নাম।

নায়কের নাম শান্তিরঞ্জন! পাঠিকা নাক সিঁটকাবে। শান্তি!

নাম নিয়ে তাই মুশকিল। পার্থপ্রতিম-টার্থপ্রতিম দিলে পাঠক-পাঠিকা খুশী হয়, জানি, কিন্তু আমার নায়কের বাপের নাম যে হারাধন। তায় গেঁয়ো স্কুলের হেডপণ্ডিত। ছেলের নাম সে নায়কোচিত রাখে কী করে? ভবিষ্যতে ছেলে তার অতিনায়ক হয়ে উঠলেও কী করে?

ছেলে যে ভবিষ্যতে একটা কেউকেটা হয়ে উঠবে জন্মের সময় কোনও বাপ ভাবতে পারে?

নায়কের নামটা, সুতরাং, আপাতত মুলতবি। গোলমেলে ব্যাপার এড়িয়ে যাওয়াই বিধেয়।

এই বিজ্ঞপ্তিতে সে শুধুই নায়ক।

নায়কের বয়স এখন চুয়াল্লিশ। উনিশ শো কুড়িতে জন্ম।

নায়ককে পৃথিবীতে আনার মাশুল হিসেবে তার মাকে স্বর্গে চলে যেতে হয়।

মায়ের অভাব পূরণ করে বাপ। ছেলেকে মানুষ করতে কোমর বাঁধে।

ছেলের মুখ চেয়ে বাপ আর বিয়ে করেনি। ফলত নায়কের ভাইবোন নেই। আশ্রিত কোন আত্মীয়স্বজনও না।

সাবালক পাঠক, আদৌ যদি থেকে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তুলবে: এ ধরনের নির্ঝঞ্ঝাট নায়ক জনপ্রিয় লেখকরা পয়দা করে। সিনেমার মুখ চেয়ে পয়দা করে। আমারও কি শেষে জনপ্রিয় বনার সাধ চাগাল? আমিও শেষে গোবরমাথা গাড়োল বনলাম?

জবাবে আমার সবিনয় নিবেদন: উদ্দেশ্যের খাতিরেই নায়ককে আমি নির্ঝঞ্ঝাট করেছি; আর্টের খাতিরে যদি ন্যাকামি-ছেনালি-বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত করা চলে উদ্দেশ্যের খাতিরে এটুকু করতে পারি না?

নায়ক আমার আগুনের টুকরো, অতিসাধারণ অবস্থা থেকে নিজের শক্তি ও অধ্যবসায়ে অসাধারণ অবস্থায় উঠেছে—ব্যক্তি মানুষের এই বিজয় অভিযান আমি ডেপিক্ট করতে চাই। সেক্ষেত্রে কতকগুলি পোষ্যের পিছটান রাখা চলে না।

আগুন কখনো ছাই-চাপা থাকে না?

কে বলল হে থাকে না। এক শীট কাগজে আগুন ধরিয়ে দাও দেখি এক বালতি ছাই দিয়ে চাপা—দেখি আগুনের মুরোদ কত!

এক বালতি ছাই এক শীট কাগজের আগুনের বারোটা বাজিয়ে দেবে, কিন্তু ছাই-চাপা না পড়লে, অবাধ স্কোপ পেলে ওই আগুনই লংকাকাণ্ড বাধাতে সক্ষম।

নায়ক ছেলেবেলা থেকেই বুদ্ধিমান। লেখাপড়ায় হীরের টুকরো। দেখতে আহা-মরি না হলেও মন্দ না।

এবং উচ্চাভিলাষী।

নায়কের এই উচ্চাভিলাষের জন্যে তার বাপের বাহাদুরি কম না। জীবনে বড় হতে হবে, দশজনের একজন হতে হবে—বাপ উঠতে-বসতে শোনায়। সৎ হতে হবে, ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে—পাখি-পড়া করে শেখায়, বড়-হইয়েদের গল্প বলে, জীবনী পড়ায়। পৃথিবীর তাবৎ বড়রা যে ছোট থেকে বড় হয়েছে—মুখস্থ করিয়ে করিয়ে দেয়।

ছেলেও স্বপন দেখে—

উপন্যাসে একটি স্বপ্নের সিকোয়েন্স ঢোকাব। কৈশোরে নায়ককে একটি স্বপ্ন দেখাব, জীবনে বারবার সেই স্বপ্ন ফিরে ফিরে আসবে। গানের ধুয়ার মত। নায়ককে বড় থেকে বড়তর, বড়তর থেকে বড়তম হয়ে-ওঠার মদৎ দেবে।

স্বপ্নটি হল :—একটি পাহাড়ের নিচে নায়ক দাঁড়িয়ে। চারপাশে তার আবছা আঁধার ঘোলাটে আলো। আর ভাঙাচোরা মানুষের ভিড়। ও হাঁফধরা পরিবেশ। নায়কের দম বন্ধ হয়ে আসে, গা গুলিয়ে ওঠে।

পাহাড়ের ওপরে তাকায়। সেখানে আলোর রোশনাই। উৎসবের উতরোল। দিব্যি মলয়ানিল বইছে নিচে থেকেই মালুম।

উবু হয়ে হয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে, বুকে হেঁটে হেঁটে নায়ক পাহাড়ের ওপরে উঠবে। উঠে স্বস্তি পাবে, বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে। নিচের দিকে তাকাবে। তাকিয়ে ঠোঁট ওল্টাবে, থুতু ফেলবে। কিন্তু নিচের জন্যে মায়া-মমতাও মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে।

কিন্তু ফের উপরে চাইলেই চোখে পড়বে আরেকটি চুড়ো, সেখানে ডবল আলোর রোশনাই। ঝোড়ো মলয়ানিল। সেই ওপরের তুলনায় এখানেও আবছা আঁধার, ঘোলাটে আলো, ভাঙাচোরা মানুষের ভিড়, হাঁফধরা পরিবেশ। এখানেও দম বন্ধ হয়ে আসা, গা গুলিয়ে ওঠা। অগত্যা আবার উবু হয়ে হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে, বুকে হেঁটে হেঁটে ইত্যাদি। ফের স্বস্তি-পাওয়া, বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো, নিচের দিকে তাকানো ইত্যাদি ফের ওপরে আরেকটি চুড়ো চোখে পড়া ইত্যাদি। ফের উবু হয়ে হয়ে—
এই ভাবে বেশ কয়েকদফা তমসো মা জ্যোতির্গময়ের স্বপ্ন দেখাব। উপন্যাসের শেষ ইস্তক।

নায়কের ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়ার সাথে সাথে বাপটাকে মারা দরকার। নিজের যোগ্যতায় নায়কের বড়-হয়ে-ওঠার বাহাদুরি দেখানোর সুযোগ দেওয়ার জন্যেই দরকার।

অবিশ্যি মাস কয়েকের জন্যে কলকাতায় একটা মামাবাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। নইলে ধাঁ করে একটা গেঁয়ো ছেলে কী করে কলকাতার কলেজে এসে ভর্তিটর্তি হয়? কিন্তু নায়কের মর্যাদাবোধ কিনা ভীষণ টনটনে,

অচিরেই বুঝবে মামারা তাকে হেনস্থা করছে। হাটবাজার করিয়ে লেখা-পড়ার পথে বাগড়া দিচ্ছে। যা-প্রাণ চায় করতে দিচ্ছে না। এখানে থাকা মানে রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মত মামুলী হয়ে যাওয়া।

স্বাধীনচেতা নায়ক তখন ঠিক করবে দেশের ঘরবাড়ি বেচে দিয়ে হস্টেলে উঠে যাবে। সে-টাকা ফুরিয়ে গেলে টিউশনি, না জুটলে না খেয়ে থাকবে, ফুটপাতে ডেরা বাঁধবে, ল্যাম্পপোস্টের আলোয় লেখাপড়া চালিয়ে যাবে। লেখাপড়া ছাড়ান দেওয়া চলবে না, লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই। ছাপার হরফে লেখা আছে। মনে গেঁথে আছে।
গাড়িঘোড়াচড়া মানে বড় হওয়া। আখেরে বড়-হওয়ার উদ্দেশ্যে দেশের বাড়িঘর বেচতে নায়ক দেশে আসবে।

এখানে একটা ইনসিডেণ্ট ঢোকাব: জীবনে প্রথম বাড়ির বাইরে পা দিয়েছিল, মাস কয়েক পরে ফিরেছে। বাড়ি-বেচার টাকা নিয়ে জন্মের মত চলে যাবে।

বাড়ি মানে চোদ্দ পুরুষের ভিটে। মা-বাপের স্মৃতি-জড়ানো। নিজেও সে এই ঘরে পনেরোটা বছর—

যথারীতি নায়কের বড্ড মন খারাপ হয়ে যাবে। যথারীতি নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভোঁস ভোঁস করে গুটি কয় শ্বাস ছাড়বে। তারপর মন-খারাপকে চরমে তোলার জন্যে উবু হয়ে শুয়ে ঘরের মেঝেয় গাল রেখে যথারীতি খানিক গুমরে গুমরে কাঁদতে যেই না রেডি হবে—তক্তাপোষের পায়ের কাছে বিড়ালের কংকাল! আস্ত কংকাল।

কংকালের গলায় চামড়ার ফিতে! ঘণ্টা-বাঁধা চামড়ার ফিতে!

নায়ক চমকে উঠেই থমকে যাবে।

তারই অতি আদরের বিড়াল। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা নিজেই সে বেঁধে দিয়েছিল। চড়কের মেলা থেকে কেনা ঘণ্টা। এ বিড়াল তো ইঁদুর ধরার উদ্দেশ্যমূলক বিড়াল নয়, বিশুদ্ধ ভালোবাসার বিড়াল। একে পাশে নিয়ে না বসলে তার খাওয়াই হত না।

অথচ কলকাতার যাওয়ার অথৈ উৎসাহে অতি আদরের এই জীবটিকে ভুলে গিয়েছিল, উচ্চাভিলাষের তাগিদে ভালবাসাকে উপেক্ষার দরজা-জানলায় বন্ধ করে দিনের পর দিন—

জ্যান্ত বিড়ালের কংকাল হয়ে-ওঠার আগাপাশতলা ইতিহাস কল্পনা করে নায়ক শিউরে উঠবে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে।

কেঁদে কেঁদে অপরাধের বোঝা হালকা করবে। রাতভর কেঁদে কেঁদে।

পরদিন সকালে তার ঘরবাড়ির ক্রেতা, অর্থাৎ পাড়াতো কাকা ছুঁচিবেয়ে রসময় ভট্চাজ আসার আগেই বাসী মুখে কংকালটাকে তাড়িবাড়ি তুলে নিয়ে পিছনের ডোবায় বিসর্জন দিয়ে আসবে।

নায়কের মনটা যে কুসুমের মত মৃদু, দরকার মত অন্যায় করলেও অন্যায়ের জন্যে প্রয়োজন মত অনুতাপে কদাচ পিছু পা নয়—তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে এই ইনসিডেণ্টটা ঢোকাব। প্রথম দৃষ্টান্ত হিসেবে।

তাছাড়া এর একটা প্রতীকী দিকও আছে : বিড়ালের ওই হাল দেখে বৃহত্তর জীবনের জন্যে নায়ক আরও ব্যাকুল হয়ে উঠবে। দশ-বাই বারো ফুট ঘরে বিড়ালের যা পরিণতি ঘটেছে, মাইল দুয়েক বর্গমাইল এই গাঁয়ে থাকলে তারও তাই হবে। জ্যান্ত কংকাল। মামুলী মানুষ আর জ্যান্ত কংকালে তফাত ?

বরং তারটা হবে আরও শোচনীয়। তার কংকালের গলায় তো ঘণ্টা-বাঁধা ফিতের অভিজ্ঞান থাকবে না অর্থাৎ সে তো কোন বিশ্বামিত্রের ব্যাটা নয় যে চামচিকে হলেও সবাই মান্যগণ্য করবে ? তার কংকাল দেখে কে বুঝবে, এর বুকে একদিন হাজারো সাধ ও স্বপ্ন ছিল ! উচ্চাভিলাষ ওৎ পেতে ছিল !

তার বাপকে গাঁয়ের কেউ বুঝেছে ?

বাপের প্রতি নায়ক যারপরনাই কৃতজ্ঞ।

বাপ যদিও সম্পত্তি বলতে শ আন্টেক টাকার ভিটেমাটি মাত্র রেখে গেছে, কিন্তু বড়-হওয়ার আদর্শের ইনজেকশনটি তারই দেওয়া।

লাখ টাকার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে এর দাম ঢের বেশি। ঢের—ঢের বেশি।

কলেজে নায়ককে খানিকটা পলিটিকস করাব। ছেলেবেলা থেকেই সে দেখছে বাপের দৌলতে অনেকে করে খাচ্ছে। তার থেকে নীরেস ছেলে লেখাপড়া না শিখেও তোফা গাড়িঘোড়া চড়ছে।

বড়লোকের প্রতি নায়কের একটা বিদ্বেষ থাকবে। তার সেই বিদ্বেষকে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার অভিযোগ থেকে মুক্ত করার জন্যে তাকে সাম্যবাদী আন্দোলনে ভিড়িয়ে দেব। ভবিষ্যতে করে খেতে হলে দীন-দুনিয়ার নাড়ি-নক্ষত্র জানা দরকার।

অবিশ্যি ঔপনিবেশিক রাস্ট্রে নিখাদ সাম্যবাদ সম্ভব নয়। বুর্জোয়া-ডেমো-ক্র্যাটিক রেভোলিউশান আগে চাই। সামন্ততন্ত্র এখানে পয়লা নম্বরের দুষমন। এই দুষমনকে টিট করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র যুক্তিবাদ, বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদের বিকাশ, জনজীবনের প্রতি আত্মীয়তা, গণ-আন্দোলন।

স্টুডেন্ট পলিটিকসে অচিরেই নায়ক নাম করে ফেলবে। ছাত্র হিসেবে ব্রিলিয়াণ্ট, চালাক-চতুর, বলিয়ে-কইয়ে।

কিন্তু বছর দুয়েক চুটিয়ে পলিটিকস্ করে নায়ক পলিটিক্স্ ছেড়ে দেবে। তার ঘনিষ্ঠতম কমরেড রাতারাতি বাপের কথায় একটা লোকের বউ হয়ে যাওয়ায় পলিটিকসে বিরাগ এসে যাবে।

ফোর্থ ইয়ারে উঠে লেখাপড়াতেও ইস্তফা। বাড়িবেচা টাকাগুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় ইস্তফা। কলেজ ও হস্টেল খরচ চালানোর মত টিউশনি না জোটায় ইস্তফা।

অবিশ্যি এই লেখাপড়ায় ইস্তফা দেওয়ার যুক্তি একটা খাড়া করে নেবে: জীবনে যারা বড় হয়েছে তাদের অনেকেই ডিগ্রিধারী বটে, কিন্তু ডিগ্রিধারী মাত্রেই বড় হয়েছে কি? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কর্মবীর আলামোহন?

যুক্তি বুকে আগলে লেখাপড়াকে তালাক দেওয়ার খেদটা কাটিয়ে উঠবে।

ম্যাকনিল কোম্পানীতে কেরানির চাকরি করতে করতে বড় হওয়ার স্বপন দেখাব।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, দুর্নীতিপরায়ণ না হলে যেমন ব্যবসায়, উন্নতিপরায়ণ না হলে তেমনি চাকরিতে বড় হওয়া যায় না।

বড় হওয়াটাও আবার রিলেটিভ।

যেমন: আমার পাড়ায় আমি মস্ত বড় লেখক। কারণ আর যে

কটি লেখক আমার ধারেকাছে থাকে, তাদের একজন একটি হাতে-লেখা পত্রিকায় পদ্য লেখে, বাদবাকি অফিসে চিঠিপত্র, গদীতে খাতাপত্র, আদালতে দলিল-দস্তাবেজ। ফলে পাড়ায় আমার আরও নামডাক, যদিও পাড়ার বাইরে আমার কেউ পোঁছেও না।

ম্যাকনিল কোম্পানীর অফিসেও নায়কের ভীষণ নামড়াক, বছর তিনেকেই, কিন্তু তার বাইরে?

আমি না হয় অক্ষম, অতএব অল্পে তুষ্ট, কিন্তু শক্তিমান নায়ক আমার ভূমায় বিশ্বাসী। শুধু অফিস নয়, সারা কলিকাতা, আসাম, বাংলা—অখিল ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে সে দাঁড় করাতে চায়।

তাই বড় হওয়ার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠে।

এই বড় হওয়ার তিনটি দিক: থিসিস, অ্যান্টিথিসিস, আর সিন-থিসিসের মত তিনটি দিক।

এক নম্বর: তুমি পাঁচ ফুট থেকে পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি, দুইঞ্চি, তিন ইঞ্চি করে নিজেকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে সাড়ে ছয়, সাত ফুট অব্দি বড় হয়ে সকলের মাথা ছাপিয়ে উঠতে পার।

দু নম্বর: আশেপাশে সকলের ঠ্যাং এক ইঞ্চি দু ইঞ্চি করে ছেঁটে দিয়ে তাদের আরও ছোট করে নিজেকে আরও বড় করে দেখাতে পার।

তিন নম্বর: অন্যের ঘাড়ে পা দিয়ে দাঁড়াতে পার।

এই তিনের হরিহর মিলনেই আর পাঁচজনের সংগে তোমার ফারাকটা প্রকটতম হয়ে উঠবে।

মরা বিড়ালের প্রসংগে বলেছি নায়কের মনটা কুসুমের মত মৃদু, জ্যান্ত সহকর্মীদের বেলায় দেখা যাবে বজ্রাদপি কঠোরাণি। সেই কঠোরতার পরিচয় সে হরবখত দেবে। চুকলি, লাগানি ভাঙানি। ফলে কেউ সাসপেণ্ড, কেউ ছাঁটাই, কারও ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ। অবিশ্যি এ সবের পিছনে যুক্তি থাকবে। চার্জশীটে সেই যুক্তি লেখা থাকবে।

আড়ালে সবাই তার বাপান্ত করবে, সামনে বাপ-বাপ—নায়ক তা বুঝবে। সে তো আকাশ থেকে পড়েনি, নিচে থেকে ওপরে উঠেছে। ওদের থেকেই। ওদের সে হাড়ে হাড়ে চেনে!

ওদের মামুলীপনাকে ঘৃণা করে। আবার মমতাও ওদের জন্যে

বোধ করে। ওদের দিকে তাকিয়ে নিজের কথা ভাবে। তার থেকে যোগ্যতম কেউ এলে তার অবস্থা ওদেরই মত হত, ভবিষ্যতেও হতে পারে—বেশ বোঝে।

এখনই কি নেই হয়ে? তার ওপরে যে ডাণ্ডা ঘোরায় সে কি বাপের দৌলতে বস হয়ে বসেনি?

নিজের কাজের জন্য নায়কের তাই মাঝে মাঝে অনুতাপ জাগবে। অপদার্থ বলে অধস্তনদের যে নাকের জলে চোখের জলে করাচ্ছে কিন্তু ঊর্ধ্বতনদের? আড়ালে বাপান্ত করলেও সে-ও তো তাদের বাপ-বাপ করে?

বিবেকের পারগেশন অনুতাপ।

নায়কের এই বিবেক এবং তার পারগেশনই আমার উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।

নায়কের মত নায়কের বিবেকের জন্মদাতাও তার বাপ। গেঁয়ো ইস্কুলের সেই হেড পণ্ডিত।

বাপ বড় হতে বলত বটে, কিন্তু সৎ হয়ে ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে বড় হতে। অর্থাৎ বিবেকের বড়-খেলাপ না করে।

তাই বিবেককে নায়ক এতদিন লাই দিয়ে এসেছে। নায়কের সঙ্গে সঙ্গে বিবেকও তার সাবালক হয়ে উঠেছে। অন্যায় করলে বিবেক বেঁকে বসে। তখন অনুতাপ করে তাকে তোয়াজ করতে হয়। তাতে কাজ না হলে হাতেকলমে প্রায়শ্চিত্তও।

এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেব। যেমনঃ কিছু স্টেশনারি চুরির অপরাধে নায়ক একটি বেয়ারাকে ছাঁটাই করল। বেয়ারা এসে হাতে-পায়ে ধরলেও গালাগাল দিয়ে ভাগিয়ে দিল। পরে মনে পড়ল, যুদ্ধের বাজারে চালের ফলাও চোরাকারবারে এই অফিস লাল হয়ে উঠছে—কই, সেখানে বকলমে তো কিছু বলতে পারছে না। নানান অ্যালাউন্সের কর্তারা দুহাতে মারছে—সেখানে তো প্রতিবাদ করতে পারছে না। সে নিজেও—।

বেয়ারাকে ছাঁটাইয়ের জন্যে অকথ্য অপরাধবোধে নায়কের মন দুর্দান্ত খারাপ হয়ে গেল। এমনই খারাপ যে চাকরিই ছেড়ে দেয়।

কিন্তু সে চাকরি ছাড়লে বেয়ারার তো কোন উপকার হবে না। এবং বেটার চাকরি না পেয়ে চাকরি ছাড়ার কোন যুক্তিও নেই। নায়ক তখন বেনামে সেই বেয়ারাকে একশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বিবেককে ঠাণ্ডা করবে।

এইসব উদাহরণে বোঝা যাবে আমার নায়ক উন্নতিপরায়ণ হলেও বিবেক-বর্জিত নয়। আর পাঁচজনের মত নয়। মোক্ষম উদাহরণটি হবে—বিবেকের জন্যে তার চাকরি ছেড়ে-দেওয়া। বেটার অফার পেয়ে ছেড়ে-দেওয়া যদিও। এই ভাবে বেটার অফার পেয়ে বিবেকের জন্যে বেশ কয়েকটা চাকরি সে ছাড়বে।

এর মধ্যে বিয়ে করবে। শাঁসালো শ্বশুর দেখে, নির্ভেজাল প্রেম করে। শ্বশুরের সুপারিশে স্বদেশী ইণ্ডাস্ট্রি কোম্পানীতে চাকরি। কোম্পানী তাকে বিলেত পাঠাবে।

নায়ককে পুরোদস্তুর নায়ক করে তোলার জন্যে বিলেত ঘুরিয়ে আনা দরকার। আণ্ডার ও ওভার ইনভয়েসিংয়ের টেকনিকটা হাতে কলমে জেনে আসা দরকার। ছাত্র বয়েসে মুলতুবি দেশপ্রেমটা ফের চাড়া দিয়ে উঠবে। বিলেত ঘুরে এসে বুঝবে ওরা কত এগিয়ে, আমরা কত পিছিয়ে। সুতরাং আরও প্রোডাকশন। আরও আরও আরও। এবং রেশনালাইজেশন তবেই ভারত আবার জগৎ সভায়। দেশের জন্যে নায়ক আদাজল খেয়ে লাগবে। দেশের সম্পদ বাড়াবার জন্যে। সম্পদ না হলে তার সমবণ্টন কি? সম্পদের সমবণ্টন ছাড়া সোস্যালিজম কি? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থেকে অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার। এক লপ্তে বাইশ জন লে-অফ। লে-অফের ফলে ভদ্দরলোক থেকে মজুর-হওয়া একজনের গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে-পড়া।

এই আত্মহত্যার ঘটনা নায়কের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেবে। কাটা পাঁঠার মত বিবেকটা তার আথালিপাথালি শুরু করে দেবে। তারই জন্যে একটি মানুষ আত্মঘাতী হল! তারই জন্যে! তারই জন্যে!

একটি মানুষের মৃত্যু ঘটাল! মৃত্যু ঘটাল! মৃত্যু ঘটাল!

বেকার অবস্থায় দিনের পর দিন না খেয়ে সইয়ে সইয়ে মরে যেত, কিছু যেত আসত না। বরং লোকটা যে সত্যিই কোন কাজের না—সেটাই প্রমাণ হত। কিন্তু কাল যাকে বিদায় দিল কাল রাতেই সে—

অনুতাপে বুকটা নায়কের ফুটিফাটা হতে চাইবে। প্রাণ চাইবে ছুটে গিয়ে আত্মঘাতীটার ভরগুষ্টির পা জড়িয়ে ধরে, অপরাধ কবুল করে মাপ চায়, তাদের সারা জীবনের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে নেয়।

কিন্তু প্রথমটায় প্রেস্টিজে বাধে, দ্বিতীয়টায় বহুৎ টাকার ধাক্কা।

যদিও সেই পঞ্চান্ন টাকার কেরানি আমার নায়ক তখন মাইনে-অ্যালাউন্সে হাজারের বেশি পায়, কোম্পানীর কোয়ার্টার এবং গাড়ি সেই সঙ্গে—কিন্তু খরচও দারুণ বেড়ে গেছে। স্ট্যাটাসের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেছে।

নায়ক তাই ছোটে তার বন্ধুদের বাড়ি।

নায়কের বন্ধু দু ধরনের। সমপর্যায়ের আর নিচুপর্যায়ের:

সমপর্যায়ের বন্ধুদের সাথে দেশের ইন্ডাস্ট্রি, পলিটিক্স, ফিউচার ইত্যাদি দামী দামী প্রসঙ্গ নিয়ে বারে বা পার্টিতে আলোচনা, নিচুপর্যায়ের বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে চা-মুড়ি খেতে খেতে সুখদুঃখের গল্প। মনের কথা প্রাণের ব্যথা।

আর তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনের জন্য আপসোস।

এইখানেই আমার নায়কের মহত্ত্ব। মদ খেলেও সে মাতাল হয় না, বেশ্যা বাড়ি গিয়েও চরিত্র বজায় রাখে, মান্যগণ্য হয়েও নগণ্যদের ভোলেনি।

অফিসে যার সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে—বাড়িতে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে।

কলেজের সহপাঠীরা, পুরনো সব অফিসের গরিবগুর্বো সহকর্মীরা বেলেঘাটা শ্যামবাজার—শিবপুর—শালকেয় ছড়িয়ে আছে। কেউ বাপকেলে এঁদো বাড়িতে, কেউ সাতভাড়াটের খুপরিতে।

সেই বন্ধুদের কাছে গিয়ে নায়ক নিজের অপরাধ কবুল করে আসে। অপরাধ কবুল করতে করতে গলা বুজিয়ে, চোখ ছলছলিয়ে কাঁদুনি গায়কী টানা-পোড়েন যে তার জীবনে! এমন নিঃসঙ্গ তার জীবন! আপন বলতে দুনিয়ায় তার কেউ নেই! কেউ নেই! তাকে কেউ বোঝে না! বুঝল না! বন্ধুদের মা-মাসিরা গলে যায়। বউ-বোনেরা বর্তে যায়। অতবড় অফিসার মানুষের এমন সাদাসরল মন। আহা-হা!

নায়ক চলে গেলে দাঁতে দাঁত ঘষে বন্ধুরা বলে শালা !

বন্ধুদের কিন্তু এটা অন্যায়। উন্নতিপরায়ণ বলে আমার নায়ক দরকার মত সবকিছু করে বটে তাই বলে তার বিবেকের জ্বালাটা মিথ্যে নয়।

মিথ্যে নয় তার অতীতের জন্যে হাহাকার, ভবিষ্যতের জন্যে আকুতি। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে সত্যিই সে নিয়ত ক্ষতবিক্ষত।

তার যোগ্যতা আছে, কেন সে সবাইকে ছাপিয়ে উঠবে না ? কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে-ওঠার প্রসেসে' এত যন্ত্রণা ! এমন গ্লানি ! নায়কের মনমেজাজ দিনকে দিন তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। জীবনের উপর বিরাগ এসে যায়।

মানুষের সবসেরা কাম্য সুখ আর শান্তি। সুখ-শান্তির জন্যেই বড় হওয়া। কিন্তু জীবনে যদি সুখ-শান্তি না এল, লাভ তবে বড় হয়ে ?

সামান্য থেকে অসামান্য হয়ে উঠেছে এটা যেমন বাহাদুরি, তেমনি বহু বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, বহু সহকর্মীর ক্ষতি করেছে, একাধিক বসকে ল্যাং মেরেছে—এও তো মিথ্যে নয় ? নিজের বাহাদুরির কথা ভাবলে এগুলোও যে মনে পড়ে যায় !

আমার নায়ক যদি সাধারণ মানুষ হত, অতীতকে বেমালুম ভুলে যেত। অমানুষ হলে তো সোনায় সোহাগা—কোন কিছুই পরোয়া করত না। খুনের শেষে হাত ধুয়ে ফেললেই রক্তের দাগ মুছে যায়। কিন্তু আমার নায়ক যে পরমপুরুষ ! তার যে কেবলি মনে পড়ে রক্তের দাগ মুছে ফেললেও খুনটা মিথ্যে হয়ে যায় না ! তাই এই ট্রাজেডি।

এই ট্রাজেডি সবাই বুঝবে না। বুঝবে না যে অলীক অসুখে যে কষ্ট পায় তার অসুখটা অলীক হলেও কষ্ট পাওয়াটা সত্যি।

নায়কের দারুণ মনোকষ্টের ব্যাপারটা ফেনিয়ে ফেনিয়ে লিখব। মনোকষ্টকে ক্লাইমেক্সে তুলে আত্মহত্যার দিকেও বার কয়েক ঠেলে দেবো।

বউ ছেলেমেয়ের কথা ভাবিয়ে আত্মহত্যার কিনার থেকে ফেরাব : আহা, সে যত অপরাধই করুক, ওরা তো নির্দোষ-নিষ্পাপ। মাটির

মানুষ বউ। প্রেমে পড়ে বিয়ে। বড় উপকারী সেই প্রেম। আত্মহত্যা করলে প্রেমের প্রতি কৃতঘ্নতা করা হবে না! ফুলের মত সন্তানগুলি! ওরা তো যেচে পৃথিবীতে আসেনি, সে-ই এনেছে। তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জের ওরা টানবে কেন? এদের অনাথ করে যাওয়া কি আরও বড় অন্যায় নয়? প্রায়শ্চিত্ত ও এই অন্যায়ে কাটাকাটি হয়ে স্বর্গের বদলে তাকে নরকে যেতে হবে না?

আমার যুক্তিবাদী নায়ক ইদানীং স্বর্গ-নরক নিয়েও মাথা ঘামায়। হাত দেখায় বিশ্বাস করে। সুটের আড়ালে মাদুলী পরে।

হাত দেখায় বিশ্বাস করায় মহা সুবিধে। তোমার হাতে যদি লেখা থাকে তুমি রাজা হবে, রাজাকে সভার মাঝে কোতল করে সিংহাসনে চড়ে বসলেও তোমার কোন কসুর নেই। হাতেই যে লেখা ছিল!

হাতে যদি লেখা থাকে তোমার জন্যে অন্যে কষ্ট পাবে—অন্যকে কষ্ট দিলেও তোমার কোন কসুর নেই। হাতেই যে লেখা!

আমার ভাগ্যই এই রকম! নায়ক বিবেককে বোঝায়। আমি না চাইলেও আমায় আরও বড় হতে হবে, আমার জন্যে অনেককে কষ্ট পেতে হবে। এই আমার বিধিলিপি!

আমি কে! আমি তো নিমিত্ত মাত্র। যথা নিযুক্তোঽস্মি—

নায়ক ঘুম থেকে উঠে নিয়মিত গীতা পাঠ শুরু করে।

কিন্তু গীতা পাঠেও শেষ রক্ষা হয় না।

স্ট্রাইক বন্ধ করার জন্যে ইউনিয়নের পাণ্ডাটাকে শায়েস্তা করতে গোপনে গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়ার ফলে দুই দলে মারামারি। মারামারি থামাতে পুলিশ তলব। পরিণামে গুলী। তিন জন খুন সাতজন জখম।

নায়ক আমার দিশেহারা পাগলপারা।

আদালতে মামলা কেঁচে যাবে সন্দেহ নেই, কোম্পানীও তাকে বকশিশ হিসেবে সামনের বছর ম্যানেজার করে দেবে নিঃসন্দেহে—কিন্তু তিন তিনটে মানুষকে খুন করা আর সাত জনকে জখম করার পাপ?

সেই আত্মহত্যার ঘটনায় নায়কের প্রত্যক্ষ কোন দায়িত্ব ছিল না। লে-অফ আরও অনেকে হয়েছিল, সবাই তো আত্মহত্যা করেনি? আসলে

অন্য কোন কারণ ছিল আত্মহত্যার। নির্ঘাত অন্য কোন কারণ। বিবেককে হাতে-পায়ে ধরে বুঝিয়েছে।

দরকারের সময় বজ্রাদপি কঠোরাণি হলেও অন্য সময় নায়কের মন কিনা মৃদূণি কুসুমাদপি—তাই ওই আত্মহত্যার নৈতিক দায়িত্বটা সে ঘাড়ে তুলে নেয়।

কিন্তু এবার? তারই ইঙ্গিতে গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়া। মারামারির সময় কোন পক্ষকে শায়েস্তা করতে হবে—তাও তো সেই পুলিশকে বাৎলে দিয়েছিল?

মানুষ খুন! জলজ্যান্ত তিনটে মানুষ!

নায়ক কারখানায় যাওয়া বন্ধ করে। চব্বিশ ঘণ্টা গীতা খুলে বসে থাকে! এক লাইনও পড়া হয় না!

কুষ্ঠি খুলে তন্ন তন্ন করে পড়ে। এখনও বড় হওয়ার যোগ রয়েছে। এখনও! নায়ক আরও ভড়কে যায়।

সারা দিন ঘরের দরজা দিয়ে একা। সারারাত ঘরময় পায়চারির নামে দাপা-দাপি। আর কান্না। বিবেকের চাবুকে কান্না। উপন্যাসের ক্লাইমেক্স এখানে। অকথ্য দরদ দিয়ে অনেকদিন ধরে এই চ্যাপটারটা লিখব।

বস্তুত আমার নায়কের পরমপুরুষত্বের মোক্ষম প্রমাণ হবে এই চ্যাপটার।

নগরে যেমন ডাস্টবিন, নাগরিকদের জন্যে তেমনি গুরুদেব।

ডাস্টবিন সব পাড়ায় থাকে না, গুরুদেবও সব নাগরিকের জোটে না।

তবে ময়লা ফেলার যা-হোক একটা ব্যবস্থা সর্বত্র বিদ্যমান। ডাস্টবিনের মত কিছু, গুরুদেব জাতীয় কিছু।

উপসংহারে আমার নায়ককে এক গুরুদেবের জিম্মায় ছেড়ে দেব।

আমানি আঁশের খোশা, পচা কাঁঠালের ভুতি, অপুষ্ট ভ্রূণ, মেয়েলি রক্তমাখা ন্যাকড়া, ছাই-পাঁশ যাবতীয় নোংরা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে বাড়িকে লোকে ঝকঝকে-তকতকে রাখে, আমার নায়কও তার সমস্ত পাপ গুরুদেবের পায়ে উগরে দিয়ে এসে বিবেককে সাফসুফ রাখবে।

এবং অতঃপর তার আরও বড় হওয়ার, বড় থেকে বড়তর হওয়ার, বড়তর থেকে বড়তম-হওয়ার পথে নির্বিবাদে দ্রুতবেগে অগ্রগতি।

শ্রাদ্ধের মন্ত্র

বাহাদুর বটে!

বছর চোদ্দ ছুটিয়ে সংসার করে আচমকা একদিন বাসের তলায় দেহটাকে তালগোল পাকিয়ে ফেলে রেখে দুনিয়া থেকে কেটে-পড়া কম বাহাদুরি!

বিমলকে দেখে হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে যায় বুক।

বাসের তলায় পা-দুটি রেখে যদি ফিরতে হত?

পা ছাঁটাই—অফিস থেকে ছাঁটাই। কিন্তু খিদেটিদে বজায়। জ্ঞানগম্যি টনটনে। দাদা-বৌদির লাথি-ঝাঁটায় গলায়-দঁড়ি-দিয়ে-ঝুলে-পড়ার সাধ জাগে হরদম।

অথচ দাদা-বৌদিরই হেল্প ছাড়া সে সাধ মেটানো সাধ্যি নেই!

বেচারা রাজেন!

রাজেনের জন্যে মমতা বুকে ঘাই মারে।

বেকার হয়ে যদি বেঁচে থাকতে হত? হাত পা ইত্যাদি ইনট্যাক্ট বেকার হয়ে?

বেশ্যারা ঘরে বসে গতরের খদ্দের জোটায়। বয়েস বাড়লে দরজায় দাঁড়িয়ে। আর একই সাথে গতর-মাথার খদ্দেরের খোঁজে রমাপতির মত ডজন-ডজন দরখাস্ত ছেড়ে অফিসে-অফিসে ধর্না দিয়েও যদি—

বিমলকে তাক করে ভক করে ধোঁয়া ছাড়ে।

অমি খেয়াল হয় সামনে সোফার কাঁধ ধরে সরযূ এখনও দাঁড়িয়ে।

'বসুন।' বন্ধুকে ধোঁয়া-ছুঁড়ে-মারা সামাল দিতে জোরালো দীর্ঘশ্বাস খসায়। 'এটা তো আগে কখনো—'

'গ্রুপ ফটো থেকে—ওর তো এমনি কোন ফটো—কেমন হয়েছে?'

'চমৎকার!' কচুপোড়া! টেকোটাকে একেবারে উত্তমকুমার বানিয়ে দিয়েছে! টেকনিকালার উত্তমকুমার! 'আপনি বসুন।'

'চা ভিজিয়ে এসেছি, নিয়ে আসি।'

'ওসব হাঙ্গামা কেন—'

'হাঙ্গামা আর কী! শুধু চা—'

শুধু চা? অফিস-ফেরতা জেনেও শুধু চা!

শুধু চা ভেজাতেই আধ ঘণ্টা কাবার করে এল?

নাকি দোটানায় পড়ে গিয়েছিল? যে-লোকটাকে এতদিন দূরে-দূরে করে এসেছে চা তাকে দেবে-কি-দেবেনার দোটানায়? জরুরী দরকার বলে ফোনে তলব করেও দেবে-কি-দেবেনার!

'রাঁধুনি দেশে গেছে—।'

হীটারে কেটলি বসাতে তাই বুঝি হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল? আহারে!

'ঠিকে ঝিটা আসেনি।'

চায়ের কাপ ডিশ নিজের হাতে ধরতে হয়েছে? কী কষ্ট! কী কষ্ট!

'রুনু-ঝুনু কোথায়?'

'গানের ইশকুলে। আজ মঙ্গলবার।'

'ঝুনু নাচ শিখছে, না?'

'একই ইশকুল।'

'শামু?'

'ও তো হস্টেলে। শনিবার এসেছিল, কাল সকালে চলে গেল। যাই, চা নিয়ে আসি।'

বিমলরে, দ্যাখ্ দ্যাখ্—তুই ফৌত হলেও তোর সংসারের পান থেকে চুন খসেনি! মেয়ে দুটো আগের মতই নাচ গান চাল্যে যাচ্ছে। ছেলেটা মিশনারি হস্টেলে থেকে নেকাপড়া।

ড্রেসটা বিধবার হলেও শরীরখানা তোর বউয়ের তেমনি টসটসে। বরং সিঁথি থেকে একঘেয়ে সিন্দুরের দাগটা উবে যাওয়ায় দিব্যি আনকোরা লাগছে।

আরতির থেকে কমসে-কম বছর দশেকের বড় কে বলবে! তিন বিয়োনী কে বুঝবে!

অ্যাসট্রেতে গুঁজতে গিয়ে সিগারেটটা মেঝেয় ফেলে জুতো দিয়ে প্রাণ-পণে রগড়ায়।

হয়, এমন হয়। চাহিদামাফিক প্রোটিন-ভিটামিন সাঁটাতে পারলে এমন হয়। দুশ্চিন্তার বালাই না থাকলে এমন হয়!

তায় গ্রাজুয়েট!

গ্রাজুয়েট অবিশ্যি আরতিও। কিন্তু একটা চাকরি দুটো টিউশনির ধকলের পরও দুবেলা সংসারের হাঁড়ি ঠেলতে হলে পড়বে না চোখে কালি? যাবে না গাল চুপসে? মাই ভেস্তে?

প্রেমিকের আদরে শরীরে মাংস গজায়? প্রেমিকের সোহাগে লাবণ্য পয়দা হয়?

'এ কী!'

'কী আর!'

নড়েচড়ে বসে। সন্দেশ! ক্রীমক্র্যাকার! চা!

আর দু মিনিট আগেই কিনা শুধু চা শুনে—

—ছি ছি! ভদ্রতার প্যাঁচ বোঝে না!

চারটে সন্দেশ। কী সাইজ একেকটার! মাখন-মাখানো বিস্কুট। কোন্-না সিকি ইঞ্চি পুরু মাখন!

সারা মুখ জলে ভরে যায়! কত কাল সন্দেশ খাইনি! মাখনের স্বাদ কেমন?

'সন্দেশ নিজে করেছি। ওর দুধটা—'

বিমলে, তুই পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও তোর দুধের বরাদ্দ কিন্তু বহাল।

আর বাপ এন্তেকাল করলে তার খাইখরচা বাবদ গোটা ত্রিশেক টাকা বাঁচলেও সত্তর টাকার পেনশনটা বেহাত-হয়ে-যাওয়ার ধাক্কা কী করে সামলাবে বাপের সর্দি হলেই তাই ভেবে-ভেবে আরতি হয়ে যায় দিশেহারা।

'নলেন গুড়ের সন্দেশ বড় ভালোবাসত।'

সন্দেশের প্লেটে বাড়ানো হাতটা চটপট মাথায় চালান করে দেয়। মরা বন্ধুর ভালোবাসার ধন! গপাগপ গেলার ইচ্ছেটা ঢোঁক গিলে গিলে মেটায়।

'সেদিনও বলেছিল—'

গলা বুজিয়ে নাকের পাটা ফুলিয়ে দুই চোখ ছলছলানোর প্রতিদানে উজবুকের মত চেয়ে না থেকে উপায়!

'কিন্তু তখনো নলেন গুড় ওঠেনি—!'

দুম করে কান্না জুড়ে দেবে না তো? গেঁয়ো বউয়ের মত কান্না? নলেন গুড় ওঠা সত্ত্বেও তুমি কোথায় গেলে গো বলে ডাক ছেড়ে বুক চাপড়ে কান্না?

'আর পাটালি-দিয়ে-ঘন-করে-জ্বাল-দেওয়া দুধ-মুড়ি-মর্তমান কলা—'

'ভালোবাসত?'

'ভীষণ।'

কী কেরামতি ভালোবাসার! নলেন গুড়ের সন্দেশ, পাটালি দিয়ে ঘন করে জ্বাল দেওয়া দুধ মুড়ি মর্তমান কলা। আর কী? ক্ষীর? রাবড়ি? রসমালাই? রাজভোগ? নিখুঁতি? সরভাজা? জলভরা? মুরগির ঠ্যাং? টার্কি রোস্ট? খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের গরমাগরম ফুলকো লুচি? সোয়ামী তোমার আর কী কী ভালোবাসত সোনা?

'চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল—'

যাক বাবা! ভালোবাসার বাকি আইটেমগুলি শোনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে হাঁফ ছাড়ে।

'আমাকে কেন ডেকেছেন বললেন না তো?'

'বলছি। চা-টা খেয়ে নিন।

তুমি কথা না শুরু করলে যায় খাওয়া? এমন ওৎ পেতে চেয়ে থাকলে দুটো সন্দেশ ফেলে রাখতে হবে না? এক টুকরো বিস্কুটের বেশি নেওয়া কি উচিত হবে? এটিকেট বলে কথা!

অথচ তোমার কথা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে বেখেয়ালে কাপ-ডিশ চিবোতে শুরু করে দেওয়া যায় বেকসুর।

'আমার একটু তাড়াতাড়ি—মানে একটা এনগেজমেন্ট—'

'আমার ব্যাপারটা একেবারে পার্সোনাল—'

আচ্ছা। দুনিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে সলা—পরামর্শের জন্যে ডাকোনি তাহলে? 'পার্সোনাল ব্যাপার?'

'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর কো-অপারেটিভে ওর কিছু লোন ছিল জানতাম, 'কিন্তু কিছু মানে যে এত—'

'জানতেন না?'

'উঁহুঃ !'

নোকি। কত ধানে কত চাল হচ্ছে গিন্নি হয়েও টের পেতে না ?

'ইন্সিওরেন্সও লোন আছে। হিসেব করে দেখলাম সব মিলিয়ে হাজার পনেরোর বেশি—'

পনেরো হাজার ? তবু কাঁদুনি !

বিমল না সত্তর টাকায় ঢুকেছিল ? বছরে ইনক্রিমেণ্ট পাঁচ ?

'অবশ্য ও জন্যে ভাবিনা।'

ভাববে কোন্ মুখে ? একে-ওকে ল্যাং মেরে দেড় হাজারী অফসর বনেও যে বিমল ধার-দেনা করেছিল সে তো তোমারই খাঁই মেটাতে মানিক।

'এ-ফ্ল্যাট ছেড়ে দেব !'

নইলে গোঁত্তা মেরে হটাবাহার করে দেবে !

'খরচ কমিয়ে ফেলব।'

পাঁঠার ইচ্ছেয় ঘাড়ে কোপ !

'চাকরিও একটা ঠিক জুটিয়ে নেব।'

ছেলের হাতের মোয়া !

'কিন্তু ইমিজিয়েটলি যে প্রবলেমটা—আপনি ছাড়া—আপনি ছাড়া—এখন আপনিই আমায়—আপনি ছাড়া এখন আমার আপন বলতে—আপনিই–'

সেরেছে ! তোতলামি শুরু হয়ে গেল যে !

সরযূবালা নার্ভাস ? ব্যাপার তবে গুরুচরণ ?

ফোনে তলব করে সন্দেশ খাওয়ানোর পেছনে তবে মতলব আছে। মারাত্মক কোন মতলব ? ঝটপট দুটো সন্দেশ মুখে ঠাসে। একসাথে।

'আপনি ওর সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন, সেই হিসেবে আমারও—'

তাই বুঝি আমি এলে লজ্জাবতী হয়ে আড়ালে থাকতে ? আড়াল থেকে শব্দভেদী বাক্যবাণ ছাড়তে ?

বিলু, তোর দোষ নেই। তুই ওপরে উঠেছিলি নিজের মুরোদে। এর-ওর কাঁধে পা না দিয়ে পাঁচজনের ঘাড় না ভেঙে ওপরে ওঠা যদিও যায় না — কিন্তু সেটাই বা কজন পারে।

অতীতটাকে প্রাণপণে ভোলার চেষ্টা করাই তোর পক্ষে স্বাভাবিক :

পাঁক-কাদা ভেঙে ডাঙ্গায় উঠে আগাপাশতলা সাবান ঘষা। আমাকে তাই এড়িয়ে চলতিস। তুই-তোকারির সম্পর্ক যে!

কিন্তু অফিসের বাইরে তুই সেই বিমলে, বিলু, বিলে। টাই আলগা করার সাথে সাথে তোর গলার আওয়াজও বদলে যেত। অতীতের রোমন্থনে থরথর করে উঠত। দাও-ফিরে-সে-অরণ্য মার্কা আপসোসে তুই গুমরে উঠতিস।

হেসেখেলে ফুর্তিতে থাকবে বলে সব জেনে-বুঝে সোনাগাছিতে ডেরা বেঁধেও ফেলে-আসা ঘর-সংসারের জন্যে মাঝে মাঝে যে সব মেয়ের প্রাণ কাঁদে তুই ছিলি তাদেরই একজন।

বিমল, তোর জন্যে করুণা হয়। মায়া হয়।

কিন্তু তোর বউটা কী? লাল ঝাণ্ডা নিয়ে তোর পাশে পাশে গলা ফাটাত, লাল চেলি পরে ঘরে ঢুকে আর নট নড়নচড়ন।

বড় বোনের জন্যে বাপ ব্যারিস্টার স্বামী কিনে দিয়েছিল, মেজ-সেজর জন্যে আই-এ-এস।

কিন্তু বাপকেলে রেওয়াজ একালে অচল। রেডিমেড স্বামীর থেকে স্বামী তৈরি করে নেওয়া ঢের ঢের ভালো।

রেডিমেড পোশাক সব সময় ফিট করে? সাব জজ জামাইবাবু যা হাল করেছে মেজদির!

সস্তায় আসলি চিজের খোঁজে চোরাবাজারে ঢুঁ মারার মত এই মাগী ভিড়েছিল ছাত্র ফেডারেশনে।

'আপনি আমায়—' খপ করে সরযূ একটা হাত জড়িয়ে ধরে।

'এ কী করলেন!' তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়।

'অ্যাঁ!' সরযূ যায় ঘাবড়ে। 'কী করলাম?'

'আমাকে ছুঁলেন?'

'মানে?'

'আপনি জানেন আমি মাতাল। কোন ভদ্রলোকের বাড়ি যাওয়াই—'

'হয়েছে! আপনার বন্ধুটিও কত সাত্ত্বিক ছিলেন! ও-ও তো মাঝে মাঝে হুইস্কি—'

'হুইস্কি আর দিশি এক? দিশিতে বদ্ গন্ধ না? দিশির দোকান ছোটলোকের আড্ডা না? তাছাড়া আমার চরিত্রও—'

'কী যা তা বলছেন!'

'বাঃ, আরতির মত মেয়ের সাথে—'

'ওকে তো আপনি ভালোবাসেন।'

'বিয়ে না করে বছরের পর বছর ভালোবাসা—'

'আহা, দু পক্ষেরই অসুবিধে আছে বলে—'

বটে! এত বুঝসুঝ তুমি? তবে কেন সোনামানিক এতদিন আমি মাতাল বলে দুশ্চরিত্র বলে আমার সামনে আসতে তোমার ঘেন্না হত? ভয় হত?

'সংসারে মুখ চেয়ে আপনারা দুজনে যে স্যাক্রিফাইস করছেন—'

দ্যাখ বিলু, দ্যাখ—তোর বউ আমায় তারিফ করছে! সার্টিফিকেট দিচ্ছে!

'মানুষটা যে এভাবে আমায় ডুবিয়ে যাবে—'

শোন্ বিলে, শোন্—আমায় খুশি করতে তোর বউ তোর বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছে!

'এখন আপনি আমাকে উদ্ধার না করলে—'

'উদ্ধার?'

সরয়ু সেকেন্ড কয়েক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

'বুঝতে পারেননি? এতক্ষণেও—'

মাথা দোলায়। দু চোখ ফাটিয়ে মাথা দোলায়।

সরয়ু ঘুরিয়ে নেয় মুখ। নিচের ঠোঁট কামড়ে তাকায় বিমলের ফটোর দিকে।

'ও আমায় ফাঁসিয়ে গেছে।'

'ফাঁসিয়ে গেছে? কট করে কথাটা কানে বাজে। সরয়ুবালার মুখে রকের ভাষা।

'এখন—' 'এখন?'

'এখন মা হওয়া আমার পক্ষে ইমপসিবল।'

এই ব্যাপার! এই ব্যাপার!

'তিনটিকে মানুষ করতেই—'

সে তো বটেই। বিমলকে জব্দ করার জন্যে, বিমলের ইনক্লাবী ডানা ভেঙে দেওয়ার জন্যে বিয়ের তিন বছরেই তিনটে বিয়োলেও এখন আর ও ঝক্কি পোয়ানো চলে না।

'আপনি যে চেনাজানা নার্সিং হোমে আরতিকে নিয়ে গিয়েছিলেন—'

'আরতিকে—নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়েছিলাম?'

'আমি জানি। ও-ই আমায়—'

'বিমল? মিথ্যে কথা।' গলা চিরে বলে, 'হি ইজ—হি ওয়াজ এ ড্যাম লায়ার।'

'মিথ্যে কথা?'

'ষোল আনা!' বিমল, তুই এত ইতর হয়ে গিয়েছিলি? অতীতকে ভুলতে আমাকে ছাঁটাই করার জন্যে এমন ইতরামি। 'বিমলই বরং তার পি-এ কে'—

'কী বলছেন!'

'আরও যেসব কাণ্ড—' মাস কয়েক আগে বিমলের ভি-ডি হয়েছিল বলবে নাকি? ভি-ডি হয়েছিল বলেই ঘাবড়ে গিয়ে ডবল ডেকারের সামনে লাফিয়ে পড়ে বলে দেবে আরও ঘাবড়ে?

হারামজাদা! হারামজাদী!

বাকি সন্দেশ দুটো তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা চা দিয়ে গিলে ফেলে। 'ম্যান ওয়াস নট উইথ দ্য ডেড। বিমলের কথা থাক।' সোফায় হেলান দেয়। কচমচ করে বিস্কুট চিবোতে চিবোতে বলে, 'আমার চেনাজানা নার্সিং হোম নেই। তবে—যদি বলেন—বন্ধুবান্ধবদের কাছে খোঁজ নিতে পারি—আপনার এমন বিপদের কথা শুনে

'না না না!' সরবে করে ওঠে চাপা আর্তনাদ। 'খেপেছেন!'

'কিন্তু ব্যবস্থা একটা যখন করতেই হবে—'

'সে আমি যা হয় করব। দোহাই আপনার, এই নিয়ে—'

'কিন্তু আমারও তো একটা ডিউটি মানে কর্তব্য আছে। আপনি আমার বন্ধুপত্নী, তায় অতীতের কমরেড—আপনার বিপদে সাহায্য করা আমার যাকে বলে গিয়ে—পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু নিজের সাধ্যে না

কুলোলে পাঁচজনের সাহায্য না নিয়ে উপায় ?' সরযু হাউ মাউ করে বার-বার বাধা দিতে চায়, তাকে আমল না দিয়ে লেকচারের ঢঙে বলে চলে, 'আজই আমি সবাইকে জানিয়ে দেব। আরতিকেও বলব। সবচেয়ে ভালো নার্সিং হোম—খরচ সবচেয়ে কম—রিস্ক একদম নেই—' উঠে দাঁড়ায়। 'যাই, এক্ষুনি কাজে হাত দেওয়া দরকার। জরুরী কাজ ফেলে রাখতে নেই। ওকি !'

সরযু দরজা আগলে দাঁড়ায়। কাঁদ কাঁদ গলায় বলে, 'এত বড় শত্রুতা করবেন ? কী অপরাধ আপনার কাছে করেছি !'

'আশ্চর্য ! আপনারই উপকারের জন্যে—শুধু আপনার কেন—রুনু, ঝুনু শামুরও উপকার সুতরাং ওদেরও জানানো উচিত। কৃতজ্ঞতায় ওদেরও মাতৃভক্তি তাহলে উথলে উঠবে। গানের ইস্কুল হয়েই যাই বরং। শামুর কাছে না হয় কাল যাব।'

'আপনি একটা ক্রিমিনাল ! অমানুষ ! অমানুষ !'

'আস্তে, মিসেস রায় আস্তে। পাশের ফ্ল্যাটের কেউ শুনলে ভাববে আমি বোধ হয় ক্রিমিনাল অ্যাসাল্ট করতে চাইছি।'

'আমাকে আজ অসহায় পেয়ে'—সরযু ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।

অপলক সরযুর কান্না দেখে। সিপ করে তারিয়ে তারিয়ে মাল খাওয়ার মত করে দেখে।

তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে নাকে মুখে ধোঁয়া ছেড়ে বলে 'দুনিয়ার তো এই-ই নিয়ম মিসেস রায়। লাথি তো নিচের দিকেই মারতে হয়। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হয়। 'বিমলও—'

'আপনার পায়ে পড়ি !'

'বালাই ষাট !'

সত্যি সত্যি সরযু পায়ে উপুর হয়ে পড়ছিল, সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে তাকে বুকে টেনে নিয়ে জাপ্টে ধরে।

সরযু কাঁদে। কেঁদে ভাসায়। বুকের সঙ্গে সেঁটে থেকেই কেঁদে ভাসায়। দুহাতে কোমর জড়িয়ে কেঁদে ভাসায়।

'দ্যাখ শালা !' দেওয়ালে ঝুলন্ত বিমলকে চোখ মেরে বলে, 'আমার বাহাদুরি এবার প্রাণভরে দ্যাখ !' বলে সরযুকে নিয়ে সোফার দিকে যায়।

প্রেম কাহিনী

ছেলেবেলায় ছিল আত্মহত্যার সাধ। নিজেকে বড়-বেশি ভালোবাসত কিনা।

ভালোবাসার গায়ে কেউ টুসকি দিলেই ভালোবাসার মান বাঁচাতে মরিয়া হয়ে যেত।

মান বাঁচানো না-গেলে ব্যর্থ আক্রোশটা ফঁসতে ফঁসতে শেষ অব্দি নিজেকেই খতম করে টুসকিদাতাকে জন্মের মত জব্দ করার জবরদস্ত একটা সাধ হয়ে মনকে উস্কানি দিত হরদম।

ছেলেবেলার কথা ভাবলে হাসি পায়। কী আহাম্মকই মানুষ থাকে ছেলেবেলায়!

বন্ধুদের সামনে বকুনি দেওয়ায় ধাঁ করে জিতু দিদির গালে চড় কষিয়ে মান বাঁচায়। কিন্তু সংগে সংগে ঘর থেকে বেরিয়ে দাদা চুলের মুঠি ধরে কয়েকটি থাপ্পর হাঁকিয়ে বন্ধুদেরই সামনে মাথাটা তার দিদির পায়ের কাছে ঠেসে ধরলে সেই রাত্তিরে বি-এন-আর বাঁধে গিয়ে শুয়ে থাকে।

দুটুকরো ভাইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে দিদি অবিশ্যি দারুণ কান্নাকাটি করে। লাশকাটা ঘরের দেয়ালে কপাল ঠুকে ঠুকে দাদা দস্তুরমত রক্ত ঝরায়।

কিন্তু জিতুর তাতে যায় আসে নি।

বছর তিরিশেক চুটিয়ে সংসার করে নাতিনাতনীর ভরাট সংসার থেকে ড্যাংডেঙিয়ে দিদি সেদিন স্বর্গে পাড়ি দিল। লাইসেন্স-পারমিট বেচে ঘাড়েগর্দানে হয়ে মর্ত্যে দাদা দিব্যি বহাল।

মাঠে মারা গেল নিজেকে জিতুর দুটুকরো করাটা। স্রেফ মাঠে মারা গেল!

অথচ জিতুর বদলে মেসোমশায়, অর্থাৎ জিতুর বাবা যদি—

সত্যি আজ অফিস যাবে না?

কড়া নজরে স্ত্রীকে ধমকায়। একই কথা কেন বারবার জিগ্যেস করা ? মানে বোঝে নি, না বিশ্বাস করে নি ?

মেঘে আকাশ ছেয়ে এলে 'আজ আর না গেলে গো' বলে এখনও যে খুকিপনা করে, মুখ ফুটে বলা সত্ত্বেও তার আজ অফিসে পাঠাতে এত উৎসাহ।

সাতসকালে দাড়ি কামালে—

অভ্যেস।

স্নান করলে—

অভ্যেস।

নাকেমুখে খেয়ে নিলে—

দাড়ি কামানো স্নান করাকে অভ্যাস বলে চালানো গেলেও সাতসকালে নাকে মুখে খাওয়ার কোন যুক্তি নেই। নাকেমুখে খেয়ে অফিস কামাই করার।

স্বামীর দাড়ি কামানোর স্নান-করার অভ্যাস চালু রাখায় স্ত্রীর কোন মেহনত নেই। কিন্তু নাকেমুখে খাওয়ার জোগাড় করতে উঠতে হয়েছে শেষ রাতে।

আগে যদি বলতে—

আগে ভেবেছিলাম—

ঘর থেকে স্ত্রী বেরিয়ে যাওয়ায় বর্তে যায়।

আগে ভেবেছিলাম!

অথচ সত্যি কথাটাও বলা চলে না। বলা চলে না যে শ্মশানে কাল আমি ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছিলাম।

শ্মশান থেকে সেই ভয় পিছু নিয়েছে। রাতভর দুঃস্বপ্ন দেখিয়েছে। একই দুঃস্বপ্ন বারবার।

সকালে ভুলে গেলেও জামাকাপড় পরার সময় হঠাৎ সেই দুঃস্বপ্নটা—

কী লাভ কোরিকে ভড়কে দিয়ে!

দুঃস্বপ্ন কেউ জেগে দ্যাখে ? কেউ দ্যাখে ইজিচেয়ারে বসে ?

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে রোমাঞ্চিত হয় বলে কি জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখে—

তুই নাকি অফিস যাবি না ? কী হয়েছে ? মালা-হাতে মা দোটানায় পড়ে। জ্বরজ্বারি হয়নি তো রে ? দেখ তো, বৌমা।

আমার কিছুই হয় নি। কেন তোমরা—

কিছু হয় নি অফিস কামাই করছ ?

করি না ?

হঠাৎ করো ?

আঃ বৌমা ! হ্যাঁরে, গা ম্যাজম্যাজ করছে ? রাত্তিরে জানালা খুলে শুয়েছিলি ? তুই মাথা নাড়লে আমি শুনব ? এত করে বলি—তুমিও বৌমা—

এই শুরু হল ঘ্যানর ঘ্যানর। স্নেহমমতা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পার্বলিসিটি।

স্নেহমমতা ইত্যাদি খুবই দামী চিজ সন্দেহ কি। কিন্তু কারণটা সে-সবের জেনেবুঝে গেলে এমন অসহ্য লাগে। এমন অকথ্য অসহ্য।

নন্দ ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসবি ? যা না। যা বাবা যা।

যাও এখনও বাড়িতেই আছেন।

কেন তোমরা মিথ্যে—

মিথ্যে নয়। জাবজ হলেও নির্ভেজাল এই স্নেহমমতা। নিখাদ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা।

মাথার যন্ত্রণাটা বিনুপিসির মনের বানানো রোগ ডাক্তাররা বলেছে, কিন্তু যন্ত্রণায় তার কষ্ট পাওয়াটা খাঁটি।

চারিদিকে যা অসুখ বিসুখ শুরু হয়েছে—যা, ঘুরে আয়।

অসুখ বিসুখ, না ছাঁটাই ? ছাঁটাই হয়ে অনাথ দত্তও ছুটির অজুহাত দিয়েছিল।

জ্বরজ্বারি না হলেও 'শরীরটা খারাপ লাগছে' বলতে বলতে পটল তোলে পটল সরকার।

ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাব ?

তাই ভালো। ভর পেটে এতটা পথ—তুমি বরং খোকাকে পাঠিয়ে দাও, বৌমা।

ভর পেটে রোজ দেড় মাইল দাবড়ে স্টেশনে যেতে পারি, রাস্তার মোড়টুকু এখন পারব না ?

সত্যিই জ্বরজ্বারি হলে অবিশ্যি ডাক্তার ডাকার প্রশ্ন উঠত না। তখন টোটকা। রোগ জানা গেলে ডাক্তার দরকার? কড়কড়ে চারটি টাকা!

কথা বলছ না কেন?

আমার শরীরটরীর ঠিক আছে। বছর শেষ হতে চলল, ক্যাজুয়াল লীভগুলো পচে যাবে বলে---

ওমা!

তবে বেশ করেছিস বাবা। বেশ করেছিস। বাঁধভাঙা হাসিতে মার মুখ ভরে যায়। পাওনা ছুটি কেন পচাবি। মালা কপালে ঠেকিয়ে পেছন পেরে।

কথাটা আমাকে বলতে কী হয়েছিল?

রাগ করছ!

কেন আগে আমায়—

অবাক করে দেব বলে।

মানে?

ওরা ইস্কুলে চলে গেলে সারা দুপুর আজ—

মরণ!

দাঁত-কেলানো রসিকতা। যাক, মনটা তবু বউয়ের খোলসা করে দেওয়া গেল।

ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পাচারের জন্যে এক্ষুনি তোড়জোড় শুরু করে দেবে মাকে বাড়ি-ছাড়া করার অছিলা খুঁজবে।

দিব্যি আছে!

সিনেমা দেখে দেখে আর সিনেমা পত্রিকা পড়ে পড়ে নিজেকে এখনও নায়িকা ভাবতে পারে। স্বামীকে নায়ক বানিয়ে তার সাথে লদকালদকির সাধ এখনও উথলে উঠতে পারে।

খাড়াইবাব না হলেও, স্বামী বাগড়া দেওয়ায় হতে আর না পারলেও এখনও কী অবুঝনাবুঝ!

কিন্তু বাড়ি খালি করে খুশিতে পাছা দোলাতে দোলাতে ঘরে ঢুকে যদি দ্যাখে স্বামীটা বিছানায় মরে পড়ে আছে? পটল সরকারের মত পটল তুলে আছে?

শরীর খারাপ লাগার কথা বলে আগেভাগে একটা আভাস দেওয়ায় মরাটা পটলের মানিয়ে গেলেও ক্যাজুয়াল লীভ পচানো এড়াতে অফিস কামাই করে ঘরে থাকার কোন মানে নেই ?

কিন্তু মন ? মন খারাপ ?

শরীর খারাপের চেয়ে ডেঞ্জারাস নয় মন খারাপ ? মন বিগড়ে গেলে শরীরকে পোয়াতে হয় না তার ধাক্কা ?

অরবিন্দবাবুর গাড়িচাপা পড়ে ফৌত হওয়াটা অ্যাকসিডেন্ট বলেই বলে গেল। কিন্তু বড় মেয়ে বিধবা হয়ে গুচ্ছের বাচ্চাবাচ্চা সমেত বাপের ঘাড়ে এসে পড়ায়, অফিস থেকে রিটায়ারমেণ্টের নোটিশ পাওয়ায় এবং একসটেনশনের আরজি হাতেনাতে খারিজ হয়ে যাওয়ায় মনটা বেয়াড়ারকম বিগড়ে গিয়েছিল বলেই না ধীরস্থির হিসেবী মানুষটা অমন বিতিকিচ্ছির এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল ?

যতই হঠাৎ-ফটাৎ বিশেষণ জোড়ো, সবকিছুর মত সব অ্যাকসিডেণ্টের পেছনেই কারণ থাকে।

ড্রাইভারের বেখেয়ালে অ্যাকসিডেন্ট, পথচারীর বেখেয়ালে অ্যাকসিডেন্ট।

ড্রাইভারের ইচ্ছেয় অ্যাকসিডেণ্ট, পথচারীর ইচ্ছেয় অ্যাকসিডেন্ট।

বেখেয়ালটা কারণ, ইচ্ছেটা কারণ।

অরবিন্দবাবুর কারণ বেখেয়াল, না ইচ্ছে ?

সংসারের ঝক্কিঝামেলা থেকে তড়িঘড়ি কেটে পড়ার মতলবে পাকা মাথার কারসাজি নয় তো ?

তা যদি হয়, অরবিন্দ একটি হাড় হারামজাদা। সংসারের কাছ থেকে জীবনভর নিজের পাওনাগণ্ডা কড়ায়-ক্রান্তিতে বুঝে নিয়ে এভাবে সংসার ফেলে পালানো বেদম স্বার্থপরতা। অরবিন্দ বাস্তোৎটা—

কী লাভ মরা মানুষকে গালাগাল দিয়ে ! শোনানো না গেলে গালাগাল দিয়ে !

এবং হার্টফেল করেই হোক কি গাড়ি চাপা পড়েই হোক দুই মৃত্যুরই পরিণাম যখন এক।

জিতুর মৃত্যুতে কয়েক লিটার চোখের জল আর ছটাক খানেক রক্ত ছাড়া

বরবাদ কিছু হয় নি। কিন্তু মেসোমশায় অর্থাৎ জিতুর বাবা অর্থাৎ সবেধন রোজগেরে মানুষটা সেদিন কাবার হলে সংসারটি পথে বসত।

যেমন বসেছে পটল সরকার হার্টফেল করতে, অরবিন্দবাবু পাঁড়চাপা পড়তে।

আমি মরলেও—

বুকটা ধক করে ওঠে : সেই দুঃস্বপ্ন!

ঘরে গিয়ে অশরীরী হয়ে মাবউছেলেমেয়ের হালহকিকত দেখতে আসার দুঃস্বপ্ন!

আমার ডেডবডির ওপর ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—দৃশ্যটা মজাদার। সাড়া পাবে না জেনেও আমাকে ডেকে ডেকে গলা চিরে ফেলেছে—মজাদার মজাদার! পাড়াপড়শি আমার ডেডবডি কাঁধে নিয়ে চলেছে—কী মজা কী মজা! আমার চোখের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে আমার ডেডবডি—মজাদারির চরমানন্দ!

কিন্তু তারপর? মাস কয়েক পর? বছর খানেক পর? বছর কয়েক পর? শুনছ? এ্যাই—এ্যাই—এ্যাই—

ঘরে ঢোকা মাত্র বউকে জাপ্টে ধরে বুকের ধড়ফড়ানি সামলাতে হয়।

চকাচক চুমো খেয়ে নিজের নাটুকেপনা চাপা দিতে হয়।

তুমি না—মা কী ভাবলেন বলো তো!

বেটপ হাসি হাসতে হয়।

আবার!

চোখ পাকালেও মুখ জিভ দেখানোয় আরেও এক কিস্তি সোহাগ করতে হয়।

ঘাম মশলা ক্যাম্ফারাইজডনের গন্ধ একজোট হয়ে স্নায়ুকে নিস্তেজ করে ফেলে।

ছাড়ো!

একটা কথা মনে পড়ে গেল—

শুনবখন পরে, ওদিকে উনোনে—

ইন্সিওরেন্স আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ছাড়াও অফিসে কয়েকজনের কাছে আমার কিছু পাওনা আছে—

পাওনা আছে আদায় করবে। ও নিয়ে—

যেমন ধরো রাখালদা পনেরো, সেনবাবু সাত, অমিয়—

আমি কী করব। তোমার ব্যাপার—

সব মিলিয়ে আশি-র মত। এখুনি লিখে রাখছি। আশি টাকা, বুঝলে, চাট্টিখানি কথা নয়। এক মাসের বাড়ি ভাড়া হয়েও পঁচিশ টাকা বাচবে, পঁচিশ টাকায়—

কী যাতা বলছ!

ইন্সিওরেন্স প্রভিডেন্ড ফান্ড মিলিয়ে হাজার নয়েক—যেও না। এসব জেনে রাখা ভালো, বুঝলে। নইলে হঠাৎ যদি চোখ বুজি—

ছাড়ো! ছাড়ো বলছি!

মানুষের মৃত্যু—ওকি! যাঃ বাবা।

মেয়েদের এই একটা মস্ত সুবিধে: কান্না পেলেই কাঁদতে পারে।

চোখের জলেই সব সমস্যার ফয়সালা ভাবতে পারে।

পটল সরকারের বউ কাঁদতে কাঁদতে ভিরমি খেয়ে ঝাঁক সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। অরবিন্দ বাবুর বাড়িতে পা দিলে আজও মরাকান্না ওঠে।

কিন্তু লাভ: কান্নাকাটিতে এনার্জি নষ্ট করে কখনো?

সকাল থেকে এইসব ভাবা হচ্ছে!

ভাবনার ওপর কি মানুষের হাত আছে গো।

এই জন্যে অফিস কামাই! এই সব ভাবার জন্যে—

আমি তো না ভাবতেই চাই। এতদিন কিছু ভাবিও নি। কিন্তু কাল শ্মশান থেকে ফিরে—

চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে বউয়ের গালে হাত বুলোয়, পিঠে হাত বুলোয়। গাল বুক পিঠ যাচাই করার জন্যে বুলোয়।

পুরুষের মাথার দাম যত কমছে, তত বাড়ছে মেয়েমানুষের মাংসের দাম। দেখনেগে এই মাংস-কো টাকায় কত সংসার—

রঞ্জতকে ধমকে থামিয়ে দিয়েছিল। অমলের বোনের মুখটা চোখের সামনে কলমলিয়ে ওঠায় থামিয়ে দিয়েছিল। খুকুর মুখের সঙ্গে অমলের বোনের মুখের আদল আছে বলে থামিয়ে দিয়েছিল।

অথচ ওই বোনের দৌলতেই অমল এখনও হাসপাতালে টিকে আছে, সংসারটা টিকে আছে।

পাশটাস না-করায় চাকরি পায় নি, কিন্তু শরীরে মানানসই মাংস থাকায় যে-কোন চাকরে মেয়ের ডবল কামাচ্ছে।

আর চোপসানো-গাল শিরদাঁড়া-বেরনো বে-হাওয়া ব্লাডার মাই এই মেয়েছেলেটা—

পেচ্ছাপ করে আসি।

আচমকা বউকে ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি মরে গেলে বউটা আমার অমলের বোন হয়ে যাবে? সিনেমার নায়িকা সেজে স্বামীর সাথে খুনসুটি করার সাধ কলকাতার হোটেলে গিয়ে ভাড়া খাটাবে?

নাকি শরীরে গ্রামফেড মাটনের মত লোভনীয় মাংস না থাকায় খুকুর দিকে হাত বাড়াবে? বাতিল-বেশ্যা বাড়িউলি যেমন কচিকাঁচা মেয়েকে এঁচোড়েপাকিয়ে লাইনে নামিয়ে দেয় আমার খুকুকে আমার খুকুমণিকে আমার ছোট্ট মা-মণিকে তেমনি—

—মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।

আমার খোকা আমার খোকন আমার খোকনসোনা চায়ের দোকানের কাপডিশ ধোবে? আমার মা পরের বাড়ি ঝিগিরি করবে?

পেচ্ছাপ মাথায় ওঠে।

আত্মহত্যার সাধের মধ্যে রোমান্টিক একটা আমেজ ছিল। মৃত্যুভয়ে নিছক আতঙ্ক।

মৃত্যুটা ভয়ঙ্কর লোকসানের।

জবর মুনাফারও।

অরবিন্দবাবুর বিধবা মেয়ে নিজের গয়না বেচে বাপের শ্রাদ্ধের খরচ জোগায়, বাপের শ্রাদ্ধে মজুমদার সাহেব ফুঁকে দিয়েছে কমসে কম ত্রিশ হাজার।

অরবিন্দবাবুর গুষ্টি এখনও শোকের রোমন্থন চালিয়ে পেটের খিদেকে বুঝ দিচ্ছে, হাজার দুয়েক লোককে গণ্ডেপিণ্ডে গিলিয়েও পেল্ট কন্ট্রোলের জন্যে কী আপসোস মজুমদার সাহেবের।

ভাই মরলে, বুঝলেন, লাখ টাকা খরচা করবে।

খুবই স্বাভাবিক। বাবা মরায় ভাগীদার কমেছে, ভাই মরলে একচেটে মালিক।

বাপের মৃত্যু তাই মজুমদার সাহেবের কাছে উৎসব। ভাইয়ের মৃত্যু হবে মহোৎসব।

আসলে মৃত্যুর নিজস্ব কোন মানে নেই। জিতুর মৃত্যু পাঁচু সরকারের মৃত্যু অরবিন্দবাবুর মৃত্যু মজুমদার সাহেবের বাপের মৃত্যু সবই মৃত্যু—কিন্তু একেক মৃত্যুর মানে একেকরকম, জের একেকরকম।

মোদ্দা কথা হল দাদা, বড়লোক হওয়া। অবিশ্যি সবাই বড়লোক হলে চলবে না বড়লোকি ফলানোর ব্যাকগ্রাউন্ডটা বজায় রেখে—

তুমি বুঝি সেই তালে আছো, রজত?

তালে থাকলেই শুধু হয় না দাদা, ওতে অনেক ঝকমারি। আমার পোষাবে না। ওপরে উঠে গিয়ে সব ব্যাটাই সততা অধ্যবসায়ের বুকনি ঝাড়ে, কর্মবীর বনে—আসলে কিন্তু পাঁচজনের ঘাড় মটকে কাঁধে পা না দিয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব। চুরি জোচ্চুরি বাটপাড়ি না করলে—

মানুষের বিবেক—

রাসকেল! সেকশ্চকে ঘুম পাড়িয়ে চোরকে মওকা করে দেয়। ওই সোয়াইনটা—

রজত!

অবিশ্যি বিবেকের দোষ নেই। মজুমদারেরই তো পয়সা। ওরাই ওকে খাইয়ে পরিয়ে পুষছে। মঠমন্দির ফেঁদে বইকেতাব লিখে লেকচার ঝেড়ে—

লেকচার তুমিও সুযোগ পেলে—

শুনতে খারাপ লাগছে? বেশ, মুখ বন্ধ করলাম।

আহাহা, আমার কথাটা তুমি—

আপনি বেশ আছেন। রবি ঠাকুরের সেই খাওয়ার পর রাঁধা আর রাঁধার পর খাওয়ার মত অফিস আর সংসার নিয়ে তোফা আছেন।

আছেন নয়, ছিলেন।

সত্যিই বেশ ছিলাম। তোফা ছিলাম।

পটল সরকার অরবিন্দবাবুর মৃত্যুর খবর শোনবার পরেও ছিলাম।

রেওয়াজমাফিক 'ঈস্! চ্ চ্ চ্ চু!' করে দুদিনই রাত্তিরে বউকে নিয়ে শুয়েছিলাম। দুটো মৃত্যুই শনিবার যে!

অরবিন্দবাবুর মরে যাওয়া মানে এতকাল সামনাসামনি টেবিলে বসে কাজ করত যে-মানুষটা জীবনেও আর তার সাথে দেখা হবে না।

দেখা তো দুমাস পর থেকে হতও না। রিটায়ার করার পর কে আর অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখে।

পটল সরকার পাড়ার লোক, মুখচেনা ছিল মাত্র। সেই চেনামুখই তো চিরতরে হারিয়ে যায়।

দুটো মৃত্যুই ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু কাল শ্মশানে চোখের সামনে—

তোমার আগেই আমি মরে যাব, দেখো।

?

আমার দুশ্চিন্তায় অফিস কামাই করছে—

শুধু তোমার নয়। সংসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষের মৃত্যু যে কী ভয়ানক—

কারো জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।

তাহলে কি শুধু বউ নয়, খোকাখুকুও মরে যাবে? মাও মরে যাবে? ফুড পয়জনিং বা কলেরাফলেরায় রাতারাতি রেহাই দিয়ে যাবে?

বাজে বোকো না। বউকে ধমকে মনকে নিজের শায়েস্তা করে।

আমি মরে গেলে আমার মা বউ ছেলেমেয়ের কী গতি হবে ভেবে ভেবে কাল রাত্তির থেকে যে-মন দিশেহারা, সে-ই এখন ওদের মরণ কামনা করছে? ফুর্তিবাজি করে কাটানোর জন্যে বিলাসের মত ঝাড়া-হাত-পা হতে চাইছে?

বাজে কথা নয়, মশাই। আমার কুষ্ঠিতে আছে সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে মরব, খুকুর কুষ্ঠিতে আছে বড় ঘরে বিয়ে হবে, খোকার—

তুমি ওসবে বিশ্বাস করো?

ওমা! কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করব না? ঠাকুরদেবতায় বিশ্বাস করব না? ম্লেচ্ছ।

বত্তসব—

ওমা! রাধহরি পণ্ডিতের কুষ্ঠি—

রাধহরি! পণ্ডিত!

মেজাজ ছরকুটে যায়: মার পেড়াপীড়িতে খোকাখকুর কুষ্টি তৈরি করতে দিয়েছিল। বউয়ের আবদারে মাকে না জানিয়ে তারটাও।

শস্তার লোভে ওই হাড়হাভাতেটার কাছে যদি না যেতাম! শস্তার মান বাঁচাতে হাড়হাভাতেটার অত গুণগান যদি না করতাম।

কলকাতার গাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালা তাবড় তাবড় সার্টিফিকেটওলা কোন জ্যোতিষীর কুষ্ঠি হলেও না হয় কথা ছিল।

ও সব কুষ্ঠিফুষ্টি আমি বিশ্বাস করি না।

খুব করো।

না, করি না। বউয়ের মুখটেপা হাসি বোজাতে গলা চড়ায়। সোমেনের কুষ্ঠিও রাধহরি করেছিল, বলেছিল রাজা হবে, তবে কেন সোমেন—কী, কথা বলছ না কেন? মুখে রা নেই কেন?

সোমেন—!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোমেন। কাল যে—

রাজা তো হয়েইছে।

রাজা হয়েছে! বউয়ের মুখের দিকে চেয়ে চমক খায়। হঠাৎ দুই চোখ জলে টসটসে হয়ে উঠেছে, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলেটার বেঘোরে মারা যাওয়া রাজা হওয়া?

রাজার মত সবাই ওকে মাথায় তুলে নেয় নি? ওকে নিয়ে মিছিল করে নি? ওর জন্যে সবাই—

আচ্ছা! ঘরের বার না হলেও খবরাখবর জানে তাহলে? এমন জানাই জানে যে জানান দিতে গিয়ে গলা বুঁজে আসে, গাল বেয়ে জল গড়ায়?

তুমি তো শ্মশানে গিয়েছিলে, দ্যাখ নি?

দেখেছে। সোমেনের জায়গায় নিজেকে। দাউ দাউ করে চিতায় জ্বলছে?

পেটের ছেলে মরলেও মানুষ—

নিজেকে পড়তে দেখে মনে পড়েছে নিজের মা-বউ-ছেলে-মেয়ের কথা।

পটল সরকারের সংসারের কথা। অরবিন্দবাবুর সংসারের কথা।

ভয় পেয়েছে। মৃত্যুভয়। ভয়ংকর এই ভয়।

বাড়ি পর্যন্ত সেই ভয় ধাওয়া করেছে। রাতভর দুঃস্বপ্ন দেখিয়েছে. আমি মরে গেলে কী হবে আমার মা-বউ-ছেলেমেয়ের!

সবাই পুলিশকে শাপমান্যি করেছে। সোমেনের জন্যে কেঁদে ভাসাচ্ছে।

কাল শ্মশানে দেখেছি। এখন আবার দেখছি। কিন্তু লাভ কি কেঁদে? কান্নার পুলটিশে সোমেনের বুলেট-বেঁধা বুকটা ফের আগের মত সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে যাবে?

অমন সোনার টুকরো ছেলে—

বড় বড় বাত ছেড়ে দাও। ইজিচেয়ারে টান টান হয়ে বসে। ওদের সংসার এখন কী ভাবে চলবে ভেবে দেখেছ? সর্বেশ্বরবাবুর থাকা না থাকা সমান। পাঁচ-ছটি ভাইবোন, মা-বাবা, পিসি—

ভগবান—

নিকুচি করেছে ভগবানের। ভগবান গিয়ে সোমেনের জায়গায় চাকরি করবে? মাস গেলে ওর বাপের হাতে ভগবান মাইনে তুলে দেবে?

ভগবান কি সব নিজে করেন, পরকে দিয়ে করান। টাকা তোলা হচ্ছে—

টাকা তোলা হচ্ছে?

অতক্ষণ শ্মশানে ছিলে, শোনো নি?

হয়ত শুনেছিল, মনে রাখে নি। সারাক্ষণ চেয়েছিল চিতার দিকে সোমেনের জায়গায় আমি দাউ দাউ করে পুড়ছি।

নিজেকে পুড়তে দেখে মনে পড়েছে নিজের মা-বউ ছেলেমেয়ের কথা। পটল সরকারের কথা। অরবিন্দবাবুর সংসারের কথা। সোমেনের সংসারের কথা। টাকা তোলা হচ্ছে। ওর ভাইবোনদের ইস্কুলে ফ্রি করে দেওয়া হচ্ছে। রমেনের চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে। যতদিন না রমেন চাকরি পায় সংসারের সব পাঁচজনে নেবে ভার।

পাঁচজনে নেবে ? সোমেনের সংসারের ভার—

ওমা ! নেবে না ? নেওয়া উচিত না, পাঁচজনের জন্যে ও—

পাঁচজনে যাতে শস্তায় চাল কিনতে পায়, সেই দাবি জানাতে গিয়ে মরেছে যখন নেওয়া উচিত বইকি। ঘাড় অগত্যা নাড়তেই হয়।

আজই দেড়শো টাকা উঠেছে। সবাই মাসে কিছু কিছু দেবে বলেছে—

বটে !

মণিদিকে বলেছি আমিও পাঁচ টাকা করে--

অ্যাঁ !

ভয় নেই। সংসারখরচে হাত দেব না। আমার উপরি উপায় থেকে—

তার মানে সিনেমা দেখা মুলতুবি ? চেয়ে চিন্তে আনা সিনেমা পত্রিকা পড়েই শুধু নিজেকে নায়িকা ভাবার সাধ মেটাতে হবে ?

সোমেনের কী ভাগ্য !

পাঁচজনের জন্য ও বুক পেতে গুলি খেল. ওর সংসারের জন্যে পাঁচজনে বুক দিয়ে পড়বে না ?

'সোমেনের কী ভাগ্য !' বলে খোঁচা সুতরাং নিরর্থক। সোমেনের ভাগ্যে বুক টাটানো নিরর্থক।

তুমি যদি তোমার ভালবাসাকে সংসারের মধ্যে আটকে রাখো তোমার সংসারই শুধু—

আর তুমি যদি তোমার ভালোবাসাকে পাঁচজনের মধ্যে ছড়িয়ে দাও—

দুইয়ে দুইয়ে চারের মত এই সহজ সরল শাদামাঠা ব্যাপারটা শেষে বুঝতে হল বউয়ের কাছ থেকে ! নেহাতই মামুলি বউটার কাছ থেকে !

রাতভর ছটফটানি বুটেমুটে ! অফিস কামাই তবে বুটেমুটে !

এক গেলাস জল দাও না গো !

স্বপ্ন দেখে আত্মজিজ্ঞাসা

প্রথম অধ্যায়

১

চোখ না থাকলে স্বপ্ন দেখা যায় না। স্বপ্নটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখার বিষয় হলেও।

জন্মান্ধরা তাই স্বপ্ন দেখে না।

২

স্বপ্নের কাছে সবাই কৃতজ্ঞ। এমন কৃতজ্ঞ বাপমায়ের কাছেও নয়।

জন্মদানের দাম হিসেবে বাপ মা শ্রদ্ধা ভক্তি আদায় করে। ন্যায়ত সেটা প্রাপ্য না হলেও। খোরপোষের দাবি জানায়। সে-দাবি মেটাতে জান বেরিয়ে গেলেও।

স্বপ্নের কোন খরচ-খর্চা নেই। মেহনতও না।

বরং বেশি মেহনত করলে স্বপ্নের বেজে যায় বারোটা।

৩

জ্ঞান হওয়া ইস্তক কম স্বপ্ন দেখছি!

চোখ খুললেই পৃথিবীটাকে দেখতে হবে, চোখ বুজে স্বপ্নটুকুও দেখতে পাব না— বাঁচব কী করে!

৪

স্বপ্ন আমার অমাবস্যার সবিতা।

৫

স্বপ্নের পৃথিবীতে আমি বরাবর একা।

ছেলেবেলায় স্বপ্নে আমি প্রজাপতি হতাম।

পাখি হয়ে যেতাম।

চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটতাম।

৬

ইদানীং স্বপ্নে আমি রাক্ষস হয়ে যাই। একা একা ঘুরে বেড়াই। প্রাণ যা চায় তাই করি। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হয় চেঞ্জে গিয়েছিলাম।

৭

কিন্তু কাল রাতের স্বপ্নটা আমায় দারুণ ঘাবড়ে দিয়েছে।

চোখে পুরু লেন্সের সান গগল্‌স।

বাজারের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি।

দুপাশে সারি সারি মাংসের দোকান।

ক্রেতা নেই।

বিক্রেতাও না।

জীয়ন্ত প্রাণী বলতে আমি একা।

৮

প্রতিটি দোকানে ঝুলছে শিকে পা- আটকানো মানুষের ধড়।

সব বয়সের পুরুষ।

সব বয়সের নারী।

কারো মুণ্ডু নেই।

এরা কারা ?

পর পর সব কটির গায়ে হাত দিলাম। প্রত্যেকবারই মনে হল এরা আমার অতিচেনা।

ভয়ংকর চেনা !

ঈশ, যার ধড় তার মুণ্ডুটা যদি সঙ্গে থাকত !

অন্তত পাশে বসানো !

তিনটে মুণ্ডু পাঁচটা ধড়, কি তিনটে ধড় পাঁচটা মুণ্ডু থাকলেও আমি ঠিক বের করে ফেলতাম কোন্ ধড়ের কোন্ মুণ্ডু। কোন্ মুণ্ডুর কোন্ ধড়। কোন্ কোন্ ধড় বা মুণ্ডু বাড়তি।

১০

মুণ্ডুর হদিশ মিলল খানিক এগিয়ে যেতে।

দুপাশের দোকানে শো-কেশ। শো-কেশে থরে থরে সাজানো।

সবকটা পরিচিত।

বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন

লেখক শিল্পী

বিজ্ঞানী ব্যবসাদার

বেশ্যা সাংবাদিক

রাজনীতিক।

১১

সবার মুণ্ডু মজুত।

সবার ?

বুক গুর গুর করে উঠল :

আমার ? আমার মুণ্ডুও কি—

আগাপাশতলা হাত বুলিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

১২

মুণ্ডুগুলো মমির মত কেন ?

আমার এত চেনাজানা

তবু আমায় চিনছে না কেন ?

১৩

এগিয়ে গেলাম।

পেশী।

১৪

এগিয়ে গেলাম।

যোনী

১৫

এগিয়ে গেলাম।

ঘিলু।

১৬

তবে কি এটা মানুষের বাজার ? মানুষের মাংস মানুষের মুণ্ডু মানুষের পেশী মানুষের যোনী মানুষের ঘিলু এখানে বেচাকেনা হয় ?

কিন্তু আমি এখানে কেন ?

আমি ক্রেতা নই।

আমি বিক্রেতা নই।

তবে কি—

১৭

তবে কি আমিও পণ্য ?

আমাকেও কেটেকুটে ওই ভাবে—

১৮

প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলাম।

স্বপ্নে ছোটা যে

কী অকথ্য অমানুষিক ব্যাপার!

১৯

বারবার দুই হাঁটু ভেঙে ভেঙে পড়ে

আর মনে হয়

ফেলে-আসা পথটুকু সড়াৎ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

হুমড়ি খেয়ে পড়ি!

২০

হাঁটু ছড়ে যায়।

বাঁচাও বাঁচাও বলে গলা চিরে চিৎকার করতে চাই—

আওয়াজ বেরোয় না।

২১

চারপাশের দোকানগুলি নড়েচড়ে ওঠে।

ধড়ের দোকান। মুন্ডুর দোকান। পেশীর দোকান। যোনীর দোকান। ঘিলুর দোকান।

দোকানগুলি এগোতে থাকে।

মাঝখানে আমি।

চারপাশ জুড়ে এগিয়ে আসে।

দোকানের ফাঁকে আমি।

এগিয়ে আসে।

২২

ভগবান!

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

আমি কোথায় ?

আমার কাছে।

তুমি কে ?

ভগবান।

২

ভগবান! ভগবান! ভগবান!

ভগবান! ভগবান! ভগবান! ভগবান! ভগবান!

ভগবান! ভগবান!

ভগবান!

৩

দাও।

?

তোমার ঘিলু।

কেন ?

আমি চাই।

কেন আমার ঘিলু তোমায় দেব ?

বন্ধক দাও।

?

বন্ধক দাও।

কেন বন্ধক দেব ?

প্রতিদান।

?

আশ্রয়ের প্রতিদান।

৪

আমি চাই না তোমার আশ্রয়! চাই না!

৫

আচমকা গলা চড়িয়ে নিজেই ভড়কে যাই।

ও হরি, ভগবানও যে ঘাবড়ে গেছে!

নিজে ভড়কে গিয়েও ভগবানকে ঘাবড়ে দিয়েছি?

মন্দ নোলে।

৬

আমার ঘিলু না দিলে কী হবে?

সবাই দেয়!

কেন দেয়?

আমি চাই।

কেন চাও?

এই রেওয়াজ।

রেওয়াজ ভাঙলে কী হয়?

দোষ হয়।

কী দোষ?

ভীষণ দোষ?

কী ভীষণ?

ভীষণ ভীষণ!

ভীষণ ভীষণ? মানে কী? মানে কী ভীষণ-ভীষণের? শিগগীর বলো—

আজ্ঞে—!

আজ্ঞে! ভগবান আমায় আজ্ঞে বলল?

তোমার রেওয়াজের আমি—

খিল্ড করছেন!

কী হয় খিল্ড করলে?

দোষ হয়।

কী দোষ ?

ভীষণ দোষ।

কী ভীষণ ?

ভীষণ ভীষণ।

মানে কী ভীষণ ভীষণের ?

ভগবানের মুখে রা নেই

বল, বল কী করতে পারিস তুই খিস্তি করলে ?

ফ্যাল ফ্যাল করে ভগবান চেয়ে থাকে।

বল কী করতে পারিস ?

কাঁদো কাঁদো মুখে ভগবান বলে, কিছু না !

৮

ভগবান যে ভেতরে ভেতরে এমন একটা আস্ত ম্যাদামারা কে ভেবেছিল

হায় ভগবান !

৯

গড়াতে গড়াতে একটা মুণ্ডু এগিয়ে আসে।

এখানে কী ? ভগবান গর্জে ওঠে, যাও।

না।

ও এখানে আসতে পারে না।

কেন পারে না ?

দোষ হয়।

কী দোষ ?

ভীষণ—

চোপ !

১০

হাওয়ায় ভেসে আসে এক জোড়া পেশল হাত।

ভগবান হাঁ হাঁ করে ওঠে।

ফের ! জোরসে ধমক হাঁকাই।

১১

এবার একটা কংকাল।

ভগবান মুখ খোলার আগেই কটমট করে তাকিয়ে বলি, খবর্দার !

১২

কাটা মুণ্ডুর চোখ দিয়ে জল গড়ায় :

ওই মুণ্ডু আমার বাবার। বিনা ওষুধে বিনা পথ্যে বাবা আমার মরে গিয়েছিল।

পেশল দুই হাত আমায় জড়িয়ে ধরে।

আমার ভাই। বেকারির জ্বালা সইতে না পেরে রেললাইনে গিয়ে শুয়ে থেকেছিল।

কংকাল আমাকে বুকে টেনে নেয়।

মা! দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে মা আমার—

১৩

এরপর কি আমার বোন আসবে ?

বোনেরা আসা মানে—

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেলি।

পারব না! পারব না!

ভাই হয়ে সে-দৃশ্য আমি দেখতে পারব না!

১৪

সবাই ঘুরে দাঁড়ায় ভগবানের দিকে।

কাটা মুণ্ডুর চোখ দিয়ে আগুন ছোটে।

পেশল দুই হাতের আঙুলগুলি আক্রোশে কিলবিল করে।

হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি করে আগুনের ফুলকি ছড়ায় কংকাল।

১৫

এবং ভগবানের মুখোমুখি আমি বুক চিতিয়ে দাঁড়াই।

১৬

তুই খুনী !

!

তুই একটা শুয়োরের বাচ্চা খুনী!

!!

হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা খুনী!

।।।

১৭

খপ করে দু হাতে গলাটা টিপে ধরে হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা খুনীটাকে খতম করে ফেলব ?

১৮

উঁহু, জ্যান্ত রেখেই এমন লেসন দিতে হবে জন্মেও যাতে না ভোলে।
ওর ভগবানগিরি ছুটিয়ে দিতে হবে।
একচোটে ওর কারবারের বারোটা বাজিয়ে দিতে হবে।

১৯

হাঁ কর।
ভগবান হাঁ করল। দু পা ফাঁক করে ট্রাউজারের বোতাম খুললাম।
হাঁ করে থাকবি, বুঝলি ?
হাঁ-করা মুখ ভগবান কাৎ করল।

২০

পারলাম না ! পারলাম না !
এক ফোঁটা জল ঝরাতে পারলাম না !

তৃতীয় অধ্যায়

১

কেন এমন হল ?
কেন এমন হল ? কেন ? কেন ?
এমন হল কেন ? কেন ? কেন ? কেন ?

২

আমি ইম্‌পোটেণ্ট, জানি।
কিন্তু এও কি ইম্‌পোটেন্সির লক্ষণ ?
স্বপ্নেও ভাই—
ভগবান !

শুকনো নাকে প্রাণপণ সিকনি টেনেও ফল হয় না। অথচ ভুটভাট আওয়াজ শোনা যায়! ঝিরঝিরে ধোঁয়া দেখা যায়। এগিয়ে গিয়ে উঁকি মারবে? তিন-ইটের উনোনে-চাপানো হাঁড়িতে উঁকি মারবে?

পা বাড়িয়েই পিছু হটে। ভারি ডেঞ্জারাস বুড়ি! কাছে ঘেঁষতে দেয়া দূরস্থান, কাছাকাছি ভিখিরি দেখলেই যা কটমটিয়ে তাকায়!

হেমন্ত অবিশ্যি ভিখিরি নয়। পরনে ফরসা জামাকাপড়=ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের দয়াতেই ভিখিরি বেঁচে থাকে। এবং ভিখিরি বেঁচে-থাকা= ভদ্রলোক বহাল-থাকা।

কিন্তু বুড়ি কি অতশত বোঝে? কোমরে-ত্যানা উদোম-বুক বেগুন পোড়া মাই গাছতলার এই ভিখিরি বুড়ি?

হেমন্ত পড়ে যায় দারুণ ধাঁধায়।

কোনদিন বুড়িকে এক নয়ার দয়া দেখানোরও হদিশ পায় না স্মৃতি আঁচড়ে। বরং কেবলি মনে পড়ে ভিক্ষে চাইলে না-শোনার ভান করেছে, মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে ধমক হাঁকিয়েছে।

বুড়ি যদি চিনে রেখে থাকে? কেশবের মত তাকেও যদি চিনে রেখে থাকে?

আহা, কেশব যদি এখন থাকত!

উসকে দিলেই 'কী রাঁধছ গো মেয়ে?' বলে হাঁড়ির উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। 'এসো বাপ এসো।' বলে নিদাঁত দুই মাড়ি দেখিয়ে বুড়িও তাকে আপ্যায়িত করত।

করবে না! হররোজ শেতলাতলায় একটা প্রণাম ঠুকে আর বুড়িকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে ডবল আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ট্রেনে চাপত। ডবল সেই আশীর্বাদের দৌলতেই না—

বন্ধুর প্রতি অকথ্য ঈর্ষায় প্রাণটা হেমন্তর জ্বলে পুড়ে যায়। ইলেকট্রিক পোস্টে মাথা-ছাতু-হওয়া বন্ধুর প্রতি অকথ্য ঈর্ষায়।

আচমকা অমন মিনিমাগনা কৌত-হয়ে-যাওয়া কম ভাগ্য !

জ্বলজ্বল করে বন্ধুর মুখ।

শুধু মুখ ! পাঁজরার হাড়, বুকের লোম, পেটের আঁচিল, মায় কুঁচকির ফোঁড়া-কাটার দাগ অব্দি। ছেলেবেলার বন্ধু বলে কথা !

পাছে পুলিশটুলিশের হাঙ্গামায় পড়ে অপিসে ফের লেট হয়ে যায়, বন্ধুকে সেদিন বন্ধু বলে জানান দেয় নি। ভাগ্যিস দেয় নি ! দিলে কি আর আস্ত শরীর সমেত আস্ত মুখখানা তার জ্বলজ্বল করে উঠত ?

মাথা-ছাতু বন্ধুর মুখে শত্রুর মুখে ফারাক থাকে ? কেশবের মুখে এম-ডি'র মুখে ?

এম-ডি'র মুখের জন্যে একদলা থুতু আর কেশবের মুখের জন্যে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে হেমন্ত সিগারেটের প্যাকেট বের করে।

'একটু আগুন দেবে গা ?'

বারেক তাকিয়ে বুড়ি একরাশ শুকনো ঘাস-পাতা উনোনে ঠেস দেয়।

দরদে-খাবি-খাওয়া গলায় হেমন্ত ডাকে, 'ও মেয়ে— !'

বুড়ি ঘুরে বসে।

দেখন-হাসি হেসে হেমন্ত বলে, 'একটু আগুন—'

'দুটো নয়া দাও।'

'অ্যা !' হাসি হেমন্তর ডুবে যায়।

'দুটো নয়া।' বুড়ি হাত বাড়ায়।

ওরে হারামজাদী ! সাত নয়ায় একটা দেশলাই। একটা দেশলাই অফিসিয়ালি পঞ্চাশ আসলে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ কাঠি। ∴ দু-নয়ায় চোদ্দ। কী কারবার ! বিনা মূলধনেই—

'দাও।'

'কাল দেবখন—'

'কাল আগুন নিওখন '

'এখন ভাঙানি—'

'ভাঙো দিচ্ছি।'

কী চটপটে জবাব ! দু-চোখ নাচিয়ে নাগিবাব জয়েচ

'নোট আছে ? পাঁচ ট্যাকার না দশ ট্যাকার নোট ?' বুড়ি মাড়ি দেখায়।

বুড়িকে ফুটবল বানানোর অথৈ সাধ মনে হেমন্তর ঘাই দিয়ে ওঠে।

কিন্তু হায় ! কটা সাধ আর মানুষ মেটাতে পারে ? হেমন্তর মত মামুলী মানুষ !

এবং তামাম দুনিয়াকে ফুটবল বানানোর দুর্দম সাধ হর্দম যার মনে চাগায় নগণ্য একটা পথের ভিখিরিকে ফুটবল বানিয়ে আশ কি তার মিটবে ?

'তোমাকে রোজ দিই—।' অভিমানে তাই গলা হেমন্ত বুজিয়ে ফেলে।

'দাও ?'

'দিই না ?' ধমক হাঁকায়। সে না দিক কেশব দিত। প্রাণের বন্ধু কেশব দিত।

ধমক দিয়েই অবিশ্যি ভড়কে যায়। 'কবে দিয়েছিসরে মুখপোড়া ?' বলে বুড়ি যদি এখন চ্যালাকাঠ নিয়ে তেড়ে আসে ? দৌড় লাগালে দমাদ্দম খিস্তি ছুঁড়ে মারে ?

কিন্তু ফ্যালফ্যালিয়ে বুড়ি চেয়ে থাকায় হেমন্ত বোঝে ধমকে তার কাজ হয়েছে।

ভদ্রলোকের ধমক যে ! ভিখিরিকে ভদ্রলোকের ধমক !

'রোজ তোমাকে পয়সা দিই, আর আজ—' কথা মুলতুবি রেখে শ্বাস টানে, 'আর আজ—' ঘন ঘন টানে, 'আজ একটু আগুনের জন্যে—' ঢক ঢক হাওয়া গেলে, 'একটু আগুনের জন্যে তুমি—' আরেক ঢোক, 'তুমি—আচ্ছা—বেশ !' শেষ ঢোক হাওয়া গিলে নিয়ে হাঁটা শুরু করে দেয়।

'নে যাও বাবা, নে যাও নে যাও।'

এই গন্ধের ত্রিসীমায় আর না।

'অ বাপ !'

লম্বা লম্বা পা চালায়।

'অ বাপ !'

রাগ দেখিয়ে এখন কেটে পড়াই সুবিধে ! আর কক্ষনো বুড়ি তাহলে ভিক্ষে চাওয়ার ভরসা পাবে না।

সবাই দিলেও সে দেয় না বলে মনটা কখনো খচখচ করবে না।

রাগ তো নয়, লক্ষ্মী!

মোড় ঘুরে হেমন্ত দেশলাই বের করে। সিগারেটের প্যাকেট থেকে বিড়ি।

গন্ধটা বড়ই উতলা করে তুলেছিল। এখনও নাকে ভাসছে। জলে সারা মুখ সপসপ করছে। কড়া বিড়ি ছাড়া রেহাই পাওয়ার উপায় নেই।

শত্তুর শত্তুর! এই শত্তুরের কথা ভাবাও পাপ।

এর চেয়ে রুটি ভালো। খেলে কেমন অম্বল হয়। এ-বেলা খেলে ও-বেলা উপোস। উপোস=নো খরচা।

তবু যে কেন মরতে সাতসকালে কলকাতা দাবড়েছিল!

বউয়ের সাথে ঝগড়া করে, পড়ানোর ছলে ছেলেমেয়েদের একচোট ঠ্যাঙানি দিয়ে চায়ের দোকানে রাজাউজির মেরে বেলা বারোটা অব্দি খাসা কাটাতে পারত। দুপুরে ঘুমিয়ে বিকেলে ছেলেমেয়েদের যেচে আদর করে রাত্তিরে বউকে নিয়ে শুলে দেহ-মন দিব্যি ঝরঝরে হয়ে যেত। আদর্শ বাপ আদর্শ সোয়ামীর দেহ-মন।

কাল থেকে ফের নটা-বারো পাঁচটা-পঞ্চান্ন।

ছ-দিনের-মেহনতে-রোজগার একটা বরাবর নাহক বরবাদ!

তাও যে কেন সরোজের কাছে গেল! শুয়োরের বাচ্চা সরোজের কাছে!

সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটা তক হারামজাদা হরেক কিসিমের লেকচার শোনাল—স্রেফ এক কাপ চা ঠেকিয়ে!

তার সাত-সাতটা চারমিনার ফুঁকে দিল—মুখ ফুটে একবার বলল না যে এত বেলায় যাবি দুটি ডালভাত খেয়ে যা।

বন্ধু! বাঞ্চোৎ!

হ্যাঁ, বন্ধু ছিল বটে কেশব। মাথা ছাতু হওয়ার সেকেণ্ড কয়েক আগেও ফুটবোর্ড থেকে 'হেম-হেম-হেমন্ত!' বলে কী ডাকটাই ডেকেছিল! লোকে যেমন শেষ সময়ে 'হরিবোল' বলে যায় কেশব তেমনি 'হেম-হেম-হেমন্ত' বলে গেছে।

নির্ঘাৎ স্বর্গে গেছে। সাতজন্মের পুণ্যের ফল না থাকলে ওভাবে

কেউ ফৌত হয় ? নো রোগে ভোগাভুগি = নো ডাক্তারবদ্যি ওষুধপথ্যি।
.' নো ধারকর্জ।

সরোজের বদলে যদি অবিনাশের কাছে যেত। 'অনেকদিন আসতে পারি নি, কেমন আছেন মাসিমা ?' বলে অবিনাশের হাবাগোবা মা'টাকে চৌকোশ একখানা প্রণাম ঝাড়লে—

উঁহু, অবিনাশের ওখানে যাওয়া = বাসভাড়া দশ-দশ বিশ নয়া। তার ওপর আহাম্মকটা এখনও আত্মীয়কুটুমকে লাই দেয়, বাড়তি কার্ড নেই। রেশনের চাল যদি বাড়ন্ত হয়ে গিয়ে থাকে ? ডাহা লোকসান।

অবিনাশের বদলে সুনীল—

ওরেঃ ফাদার ! ছাঁটাই হব-হব হয়েছিল, হয়ে গিয়ে থাকলে নির্ঘাৎ ধার চেয়ে বসত।

বরং নিতুর কাছে গেলে—

বেস্ট হত শিবপুরে। বাসভাড়া সতের-সতের চৌত্রিশ বটে, কিন্তু সুদে-আসলে উশুল হয়ে যেত।

দুপুরে ভরপেট ভাত। চাল নেই ? ব্ল্যাকে কেনো। মাছ-মাংস ডালকাল চাটনি-দই। মাসের শেষ ? হাওলাত কর। জামাই না !

দুপুরে বেমক্কা ঘুমিয়ে পড়তে পারলে বিকেলে পুরোদস্তুর টিফিন।

ভদ্রতা করে রাত্তিরেও কি খেয়ে যেতে বলত না ? সম্বন্ধী না বলুক শাশুড়ি ?

রাত্তিরে খেলে থাকার জন্যে সাধাসাধি ? দু-দুটো সোমত্থ শালী আছে না !

রাত্তিরে থেকে-যাওয়া = পরের দিন সকালেও দমভর। তারপর পান চিবুতে চিবুতে বেলা নটায়—

তিন-তিন বেলা পেটপুরে ভাত !

মাস-দেড়েক-এক-নাগাড়ে-রুটি-গিলে-গিলে-হল্লাক পেটে তিন-তিন বেলা ভাত !

তবে কিনা, সম্বন্ধী শালাও বড্ড সেয়ানা। বোনাইকে তিনবেলা খাওয়ানোর শোধ তুলতে বোনের খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে প্রাণটা যদি তার আঁকুপাঁকু করে ওঠে ? সেই সঙ্গে ভরগুষ্টির প্রাণগুলিকে যদি

আঁকুপাঁকু করে তোলে? তারপর আঁকুপাঁকু প্রাণগুলিকে বগলদাবা করে বিরাটি এসে হাজির হয় যদি?

আড়াই টাকা কিলোর চাল আজ হারাম বলে না ছুঁলেও বাপ বাপ বলে তখন—

এক লাথিতে ভেজানো সদর হাট করে ভেতরে ঢোকে।

'এই তো বাবা এসে গেছে!'

'আমার কিশলয় এনেছো বাবা?'

'আমার খাতার কাগজ?'

'আমার ইতিহাস?'

'আমার—'

'কাল আনব।' দুপদাপ পা ফেলে হেমন্ত দাওয়ায় ওঠে।

'কাল! তুমি তো রোজই—'

বাপকে অবিশ্বাস! 'যা অ্যাকসিডেণ্টের হাত থেকে আজ—'

'তোমার কি বাপু রোজই—'

স্বামীকে অবিশ্বাস! কেন, অ্যাকসিডেণ্ট হয় না কলকাতায়? রোজ হচ্ছে না? অ্যাকসিডেণ্টের ফলাফল জানে না? চোখের সামনে কেশবের সংসারটার হাল দেখেও—

'তাহলে তুমি বাবা পয়সা দাও।'

'হ্যাঁ বাবা, আমরা জগুদার দোকান থেকেই—'

'আমার একটাকা দু-আনা—'

'আমার সাড়ে তিন টাকা।'

'আমার—'

ভিখিরি! ভিখিরি! শাড়ি ফ্রক প্যাণ্টুল পরা ভিখিরির পাল! ভাগ! ভাগ!

'দেবেখন। এখন সর দেখি তোরা। একটু জিরোতে দে।'

দেবেখন! হেমন্ত পয়সার গাছ। নাড়া দিলেই শিউলির মতো টুপটাপ পয়সা ঝড়বে।

'তাই দিও বাপু। তোমার যখন আনা হয়ে উঠছে না—'

দিতে হবে বইকি। নইলে লেখাপড়া শেখা যে বন্ধ থাকছে। লেখাপড়া শিখে ভদ্দরলোক হয়ে-ওঠা, ভদ্দরমহিলা হয়ে-ওঠা যে পিছিয়ে যাচ্ছে।

যেমন ছা তেমনি মা! শাড়ি-বেলাউজ-পরা ভদ্দরমহিলা! কিন্তু খোলস ছাড়িয়ে রাস্তায় ছেড়ে দাও—

গাছতলার ওই বেগুন-পোড়া মাই বুড়ি।

আহা, ওই বুড়িটা যদি—বুড়িটাই যদি--

মা হত!

আজকালকার মা নয়, আগেকার দিনের মা। নির্ভেজাল মা। অন্নপূর্ণা-মার্কা মা। এক্ষুনি তাহলে ছুটে গিয়ে—

'খেতে দাও।' হেমন্ত হামলে ওঠে।

'হাতমুখ ধোবে তো!'

'ধেত্তেরি!' মাছের ঝোলভাত হলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে আসনপিঁড়ি হয়ে বসার মানে হয়।

কাঁড়া-আঁকাড়া ভিক্ষের চালের ভাত হলেও হয়। স্রেফ ভাতে-ভাত হলেও। রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে খেতে হলেও।

কিন্তু গিলবে তো ছাই পচা গমের রুটি আর হাবিজাবির ঘণ্ট। তার জন্যে হাত-মুখ ধোয়ার বায়নাক্কা!

'অ্যাদ্দুর এলে—দুদণ্ড জিরোও—হাতে-মুখে জল দাও—'

'লেকচার থামিয়ে পিণ্ডি আন। খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি—'

'মাংসটা একটু গরম করে—'

'মাংস?' হেমন্ত বিষম খায়।

'আমি এনেছি বাবা। সামনের রাং থেকে—

'তোমার জন্যে একটা মেটুলি আছে বাবা।'

'মাংসটা যা মার্ভেলাস হয়েছে না বাবা!'

'কে রেঁধেছে দেখতে হবে।'

'ওরে মিথ্যুক!'

'মাংস?' ফ্যালফ্যাল করে এর-ওর মুখের দিকে তাকায়। 'মাংস মানে? হঠাৎ—'

'বলে গেলে না?'

বলে গেলে ! ধপ করে হেমন্ত বসে পড়ে।

হ্যাঁ, গিয়েছিল বটে বলে।

নিজে বন্ধুর বাসায় ভাত মারবে আর বউছেলেমেয়ে গিলবে সেই থোড়-বড়ি খাড়া—বড্ড মায়া হয়েছিল।

খেতে বসে বউ-ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ে গেলে খাওয়ার মেজাজ পাছে ছরকুটে যায়—তিনশো মাংস সাতশো আলুর দরাজ ফরমাস করে গিয়েছিল।

কিন্তু তখন কি জানত সরোজ শালা হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা—

এ কী ভয়ংকর তার মায়ার পরিণাম !

নিজের হাত কামড়াতে প্রাণ চায়। পেঁয়াজ-রসুন-তেল-নুন-লংকা-হলুদ-ঘি-গরমমশলা দিয়ে রান্না মাংস ফেলে কচ কচ করে নিজের কাঁচা মাংস চিবোতে প্রাণ চায়।

দরজা খুলে পরদা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওমা তুমি ' বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে।

খোঁপা খুলে বেনী। পরনে সায়া অব্দি নেই। শাড়িটা কোনমতে গায়ে জড়ানো। ময়লা শাড়িটা!

খুব যা হোক! আমাকে ডেকে পাঠিয়ে—

কী করব বলো! শ্যামবাজার থেকে পিছু নিয়েছে. চেনা লোক—

তবে চলি।

আমার মাথা খাও! খপ করে রমা একটি হাত সুরপতির ধরে ফেলে।

দশ মিনিট। দশ মিনিটের মধ্যেই—

দশ মিনিট আঙুল চুষব? বারান্দায় দাঁড়িয়ে?

দুলীর ঘরে বসবে? চলো।

মানে? সুরপতি যায় ঘাবড়ে।

মরণ! সুরপতির গালে থাপ্পড় মেরে রমা বলে, বোনের ঘরে ভাই দুদণ্ড বসে না? তোমায় অত দাদা-দাদা করে—এসো। হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়।

খাটে শুয়ে দুলী উল্টোরথ পড়ছিল, ধরমরিয়ে উঠে বসে।

তোর দাদা এসেছে লো। তোর সাথে একটু গপ্প করবে।

কী ভাগ্যি! কী ভাগ্যি!

যদি চাটা খায়—

নিশ্চয়। এসো দাদা এসো।

এক মুখ হেসে চটপট খাট থেকে নেমে গিয়ে দুলী আস্ত খাটটা সুরপতিকে ছেড়ে দেয়।

দেখিস পালিয়ে যায় না যেন চলি।

পালিয়ে যাবে দাদা? হ্যাঁ দাদা, বোনের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে?

রমাকে ওই অবস্থায় দেখে একেই মেজাজ ছরকুটে, তার ওপর এই বোনাগিরি !

আচমকা এক ধাক্কায় দুলীকে ডিগবাজি খাওয়ানোর সাধ চাড়া দিলেও দু পাটি দাঁত বের করে সুরপতি খাটে ওঠে। জুতো-পায়ে গ্যাঁট হয়ে বসে।

প্যাণ্টুল পরে অসুবিধে হচ্ছে দাদা ? শাড়ি দেব দাদা ?

থাক !

দিই না দাদা। মেঝেয় নীলডাউন হয়ে দুলী জুতোর ফিতে খোলে।

কী গরজ জুতো খোলার ! বিছানা নোংরা হয়ে যাবে বলে, না দাদার খানিক সেবা করতে প্রাণ আইঢাই করছে বলে ?

দুলীর বুকে গলায় থুতনিতে আলতো করে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে দিয়ে কারণটা সুরপতি যাচাই করতে চায়।

আরাম করে বসো দাদা।

পাশবালিশে কনুই ঠেসে সুরপতি বলে, আরাম করে যে বসব হঠাৎ যদি কোন বোনাই এসে পড়ে ?

দুলী মাথা নেড়ে জানায় আসবে না।

যদি আসে। ধরো যদি—

ভাগিয়ে দেব।

ভাগিয়ে দেবে ? খদ্দের লক্ষ্মী, যেচে এলেও—

শরীর খারাপ হলে—

শরীর খারাপ ? সেকি ! জ্বরটর—

দুলী ফিক করে হাসে। মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

অ ! সুরপতি বেকুব।

অথচ জোরালো রসিকতা করে বেকুবিকে ঝেড়ে ফেলবে উপায় নেই। বোন যে !

ভাগ্যিশ বোন ! যা হাড়্গিলে শরীর ! ট্যারা !

চা খাবে দাদা !

চা ? নাঃ ! বরং আর কিছু হলে—

এখানে আর কিছু খাওয়ালে রমাদি আমাকে কেটে ফেলবে। চা খাও, ম্যা? সস্তার ডবল হাফ—খেয়েই দেখ। তুমি খেলে আমিও খাই।

আনাও তবে। সুরপতি মানিব্যাগ বের করে।

না না, তুমি কেন দেবে। বোনের কাছে এসেছ, বোন এক কাপ চা-ও খাওয়াতে পারে না। মুখে গড়গড়িয়ে আপত্তি জানালেও হাত বাড়িয়ে দুলী নোটটি নেয়। দ্যাখ দেখি! কেন যে তুমি—

চায়ের জন্য খুচরো হিসেব করে দেওয়া ছোটলোকামি। এক টাকার নোট একটিও নেই। এই দু টাকার কি আর ফেরত পাওয়া যাবে? পেলেও নেয়া যাবে? দশ টাকার নোটটা ভাঙাবার সময় সবগুলি যদি দুটাকার না নিতাম!

আর কিছু আনাব দাদা? চপ? কাটলেট?

সুরপতি মাথা নাড়ে।

সিগারেট?

সুরপতি সিগারেটের প্যাকেট বের করে।

হাড়গিলে শরীর হলেও চলনে জবর ঠমক। দশাসই পাছা! জোড় আলগা হয়ে কোমর থেকে ছিটকে যেতে চাইছে।

দুলীকে তাক করে খাট থেকে লাফ দিতে গিয়ে সুরপতি সামলে নেয়।

লাফ দেওয়া কিছু দুষ্কর না। শরীর খারাপ সত্ত্বেও না।

হাঁনিয়েবিনিয়ে খানিক খোসামুদি, রমার মুর্দাবাদ আর শরীর খারাপের জন্যে কিছু বাড়তি মূল্য ধরে দিলেই লাফ দেওয়া যায়।

কিন্তু এই লাফ দেওয়া মানে এ-বাড়িতে আসা বরবাদ। জন্মের মত রমা বেহাত।

গণ্ডায় গণ্ডায় দুলী মিলবে। বেমানান বড় পাছাওলা দুলী। বেমানান বড় বুকওলা দুলী। একই শরীরে বেমানান বড় পাছা এবং বুকওলা দুলীও। সেই সাথে টকটকে রঙ, পটলচেরা চোখ। নাচগানজানা।

ছন্দারানীর ফ্ল্যাট তো অপসরার হাট।

কিন্তু আর একটি রমা? ইমপসিবল! কোয়াইট ইমপসিবল!

সুরপতি সিগারেট ধরায়। জহুরী বটে মুরারি! চড়চড় সিগারেটে টান মারে। ভাগ্যিস মুরারিটা—

দুলী ঘরে ঢুকে বলে, সিগারেট দাও দাদা।

দুলীর মুখে সিগারেট গুঁজে স্থরপতি ধরিয়েও দেয়।

বোসো। তোমার মেয়েকে দেখছি না? কী যেন নাম?

স্থচি—স্থচিত্রা। নাকে-মুখে ধোঁয়া ছেড়ে দুলী বলে, পেটের তো নয়। যার জিনিস সে ফিরিয়ে নিয়েছে দাদা।

তুমি না পুষ্যি নিয়েছিলে?

লেখাপড়া করে তো নিইনি। দুলী করুণ হাসে। মাড়োয়ারিটা এখনই মাসে তিরিশ দেবে বলছে, বছরে বিশ করে বাড়াবে। পিচেশ! মা নয়, পিচেশ! পিচেশ!

মাঝপথে মা হাওয়া থামাতে গিয়ে জীবনে মা হওয়ার দফা গয়া হয়ে যেতে মেয়েটাকে পুষ্যি নিয়েছিল। আট বছরের মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন। ফর্সা রঙ।

বড় জোর বছর পাঁচ-ছয়। পাঁচ-ছ বছর খাওয়ালে-পরালে নিজের শেষ জীবনের খাওয়া পরা নিশ্চিন্ত।

স্থচির একটা দিদি ছিল না?

কলেরায় দুম করে মরে গেল যে!

তবে আর স্থচির মায়েব কস্থর কি। বয়েসটা তার দুলীর দেড়গুণ। মেয়েটা তার নির্ভেজাল নেজম্ব। নিজের আখের সে-ও ভাববে বইকি।

মাড়োয়ারিটা তো ওর রিয়েল মানে সত্যিকারের বাপ নয়।

স্থচি ওকে বাপ বলে ডাকত দাদা। পিচেশ! গীতাদিটা পিচেশ!

মাড়োয়ারি কিন্তু বাপকা ব্যাটা। পাতানো বোনের ওপর লাফিয়ে পড়ার সাধটুকুও আমি মেটাতে পারি না, আর পাতানো মেয়েকে নিয়ে শোওয়ার জন্যে এখন থেকেই দাদন দিচ্ছে!

নিজেকে স্থরপতির বড়ই যা-তা মনে হয়। নিতান্ত নগণ্য।

হাজার দেড়েক মাইনে পেলেও চাকরির মালিক মাড়োয়ারি। বছরে তিনবার বিলেত গেলেও মাড়োয়ারি। চলনে-বলনে চৌকোশ হলেও মাড়োয়ারি। মেজাজমর্জি মালিকের। মাড়োয়ারি মালিকের। দরকারমত সেটা জানিয়ে দিতেও ভোলে না। সেন সাহাব বলে খাতির করলেও ভোলে না।

সাধেই কি মাঝে মাঝে রক্ত মাথায় উঠে যায়! একদিকে ওই মালিক আরেকদিকে ওই ইউনিয়ন। দুই তরফকে সামাল দিয়ে চলা সহজ কথা! দু-মুখো দুই নৌকোয় পা দিয়ে চলা!

তবু ভাগ্যিশ ডি-আই আছে! সেনের মত ওয়েলউইশার আছে। ইউনিয়নের তিন পাণ্ডাকে আটকে ফেলে স্বস্তি পেয়েছি। কিন্তু বাস্টার্ড তিনটে বেরিয়ে এলে যে কি হবে খোদা মালুম!

ডি-আই উঠছে উঠছে শোনা অব্দি কী টেনশনে যে কাটছে দিনগুলো। সেন অবিশ্যি ভরসা দিয়েছে—

রমাদি তো চলল দাদা?

মানে?

তুমি জানোনা কিছু?

কই—না। কী ব্যাপার?

রমাদির কাছে শুনোখন।

না না, তুমিই বলো। কোথায় চলল রমা? দুলীর আঁচল সুরপতি খামচে ধরে।

নার্সিং হোমে কাজ করে বলে বাড়িতে জানে। পার্মানেণ্ট নাইট ডিউটি। সন্ধেবেলা আসে সকালে চলে যায়। হাফ গেরস্ত।

পাড়াটাই হাফ গেরস্থর। ডান পাশের ফুল গেরস্থরা বুঝে-সুঝেও চোখ বুজে থাকে। সেনট্রিস্ট! ধাক্কা দিলে যদি বাঁ পাশে চলে পড়ে? ও পাড়ার সাথে একাকার হয়ে গেলে খোদ পাড়া তাহলে গায়ে এসে পড়বে না?

রমা কি এবার খোদ পাড়ায় গিয়ে—

কোন দুঃখে!

তবে কি বরানগরের বাড়িতে? এক ভাসুর দুই দেওর তাদের বউ ছেলেপিলের জমজমাট সংসারে? মাসে সওয়া শো টাকা ঘর-ভাড়া আর যাতায়াতের বাস-ভাড়া বাঁচাবার জন্যে বাড়িতেই এবার আসর জমাবে? ছেলের দেখতাই? গত বছর স্কুল ফাইনাল পাশ করল—ছেলেটার বয়সও কোন না সতের-আঠারো হয়ে গেছে।

বাড়িতে? হ্যাঁ দুলী, বাড়িতেই এবার থেকে—

ঘেন্না ! ঘেন্না ! তুমি কী গো !

সুরপতি বড্ড দমে যায়। দাউ দাউ আশার আগুন দপ করে নিভে যায়।

বলো না কোথায় যাচ্ছে ? আঁচল ছেড়ে দাবনায় দুলীর থাবা বসায়।

মাসি চা নিয়ে এসেছে। দুলী সরে বসে। এসো ভেতরে এসো গো।

চা নয়, ফুল। এক হাতে গুচ্ছের বেলফুলের মালা ঝুলিয়ে আরেক হাতে ডজন কয়েক রজনীগন্ধার ডাঁটা উঁচিয়ে ঝোলা-কাঁধে লোকটা ভেতরে ঢোকে।

গোলাপও আছে দিদি। ঝোলা থেকে ফুলওলা গোলাপ বের করে দেখায়। টাটকা—দেখুন—একেবারে টাটকা।

গোলাপ চাইনা। বেলের গোড়ে কত করে ?

আপনাকে আর কী বলব দিদি ! আপনি তো—

বলো না কতো।

দেবেন এক টাকা করে ! নিচে দিয়ে এলাম—মালতীদি, রেনুদি—

ডজন ?

সুরপতির কথা শুনে ফুলওলা ভড়কে যায়। দুলী হেসে ওঠে।

ঠিক বলেছ দাদা। যা ফুলের ছিরি ! চাইনা বাপু।

ফুল খারাপ দিদি ! এমন টাটকা কুঁড়ি—ফোটেনি বলে—দেখুন না—শুঁকে দেখুন—বাবুকে দেখান।

আমার দাদা।

আচ্ছা ! নমস্কার দাদাবাবু।

নমস্কারকে আমল না দিয়ে ধমকের স্বরে সুরপতি তাড়া দেয়, ঠিক কত করে দেবে বল।

আজ্ঞে এক টাকা জোড়া। মালতীদি, রেণুদিও—

এক টাকা জোড়া !

আজ্ঞে সব জিনিসের দাম দাদাবাবু—

হারামজাদা ! নির্ঘাত কোন ইউনিয়নের পাণ্ডা। আমি এখানে এসেছি টের পেয়ে ফুলওলার ভেক ধরে এসেছে। জিনিসপত্রের দরদাম নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ বলে

আচমকা চেঁচিয়ে উঠবে। তারপরেই ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ। ঘেরা ডালো! ঘেরা ডালো! চেলাচামুণ্ডারা দুরদার করে দৌড়ে আসবে।

আপিশে ঘেরা ডালো হতে স্বামীর গর্বে সুলেখার বুকে দুধ এসে যাওয়ার যো হয়েছিল। ঘেরা ডালো হেঁজি-পেঁজিরা হয়?

কিন্তু এ-পাড়ায় ঘেরা ডালো হয়েছে শুনলে—গ্র্যান্ডে নয় ফারপোয় নয় বিল্টমোরেও নয়—এই পাড়ায় ঘেরা ডালো'—সংগে সংগে ডিভোর্সের স্যুট ফাইল করে দেবে।

নিয়ে নাও দুলী। নিয়ে নাও। চটপট সুরপতি মানিব্যাগ বের করে।

আমি নিয়ে কী করব দাদা! বরং রমাদির জন্যে—

রমারটা রমা বুঝবে। তুমি--

রমাদিকে বাদ দিয়ে নেব'

তাহলে দু জোড়া নাও। ব্যাগ থেকে দুটাকার একটি নোট বের করে দলা পাকিয়ে, ছুঁড়ে দেয়। যাও' বাজ অফ্‌!

নোট কুড়িয়ে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে সেই সাথে সুরপতিকেও নমস্কার করে চার গাছা মালা দুলীকে দিয়ে ফুলওলা বেরিয়ে যায়।

তুমি না দাদা এমন বোকা! চার আনা জোড়া দিত। ফুট করে—

গরিব লোক!

তা অবিশ্যি। তোমাদের দৌলতেই তো আমরা খেয়েপরে আছি।

দুটি মালা দুলী ড্রেসিং টেবিলে রেখে গেলাস থেকে কয়েক ফোঁটা জল তাতে ছিটিয়ে দেয়। দুটি ঝোলায় রামকৃষ্ণ সারদামনির ছবিতে। ঝুলিয়ে দেওয়ালে কপাল ঠোকে।

রামকৃষ্ণ সারদামনিকে সুলেখাও দারুণ ভক্তি করে। কিন্তু দেওয়ালের বিউটি নষ্ট হয়ে যাবে বলে টাঙায়নি।

ছবি টাঙাতে হলে আধুনিকতার জন্যে হাল আমলের আর্টিস্টদের, ঐতিহ্য বজায় রাখতে ঐ অবন ঠাকুর নন্দলালের, আন্তর্জাতিকতার প্রমাণ হিসেবে পিকাসোর।

পিক্যাসোটা কমিউনিস্ট। সোয়াইন! সুলেখাকে সমঝে দিতে হবে। কমিউনিস্টদের কখনো লাই দিতে নেই। ছুঁচ হয়ে ঢোকে ফাল হয়ে বেরোয়।

বিলিতি ছবি হিসেবে ক্রাইস্ট তোফা! ক্রুশিফায়েড ক্রাইস্ট। ম্যাডোনা খাসা! ম্যাডোনার কাছে কেষ্ট কোলে যশোদা? হরিবল্!

ক্রাইস্ট ম্যাডোনা ঝোলাও—ধর্মকে ধর্ম আর্টকে আর্ট! মিসেস রাও খুশী হবে।

মিসেস রাওকে খুশী করলে মিসেস মুখার্জি বেঁকে বসবে? চৈতন্যকেও তবে টাঙাও। রামকৃষ্ণ সারদামনির চেয়ে কার বেটার। এমনকি বিবেকানন্দও—

দাদা, পরশু না ভাবি একটা মজা হয়েছে। তোমাদের খবরের কাগজের—

অ্যাঁ! হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের খবরের কাগজের—কী হয়েছে?

দুজন এসেছিল। তোমার মতই সাব এডিটার। টং হয়েই এসেছিল।

আচ্ছা! এখানে এসে সব মক্কেলেই সাব এডিটার বা রিপোর্টার সাজে। পুলিশ অফিসার সাজে। ব্ল্যাক মেইলের ভয় থাকে না। কী বুদ্ধি মুরারির!

এতদিন অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করে টালিগঞ্জে জমি কেনার বেশি এগোতে না পারলেও এ তল্লাটের নাড়ি-নক্ষত্র জানেশোনে।

তারপর দুলী তারপর?

রমাদিকে ডাকলুম। দুজন তো! একটা গোঁজ হয়ে বসে মাল খেতে লাগল, আরেকটা একনাগাড়ে বকবক। খবরের কাগজের কাসুন্দি। রমাদি আমায় চোখ টিপে বলল, মার কাছে মাসির গল্প করছেরে।

ওরা টের পায়নি তো? তোমরা বলোনি তো আমি মানে মিহিরবাবু এখানে আসি?

খেপেছ!

ওরা নাম বলেছিল? কী নাম? কোন্ কাগজের!

ওসব জিজ্ঞেস কোরোনা দাদা। তুমিই বলো, বলা উচিত?

স্মরপতি ঘাড় নাড়ে। সতী! আপিস হলে ছুটিয়ে দিতাম সতীপনা। বোসকে যেমন দিয়েছিলাম। হয় পুলিশকে বলুন ওরা আপনাদের উস্কানি দিয়েছে, দেশটাকে দীন-রাশিয়া বানাতে চাইছে—নইলে—ছাটাই হলেও আপনার যে কোন অসুবিধে হবেনা সে-গ্যারাণ্টি দিতে পারি। সরকারের

অতিথি হয়ে আরামে থাকবেন। কিন্তু আপনার ফ্যামিলি—ওয়াইফের শুনলাম অ্যাডভান্স স্টেজ—আইবুড়ো দুটি বোন আছে—ছোট ছোট তিন ভাই—বাবা রিটায়ার করেছেন।

বিপ্লবী বোস হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। আপনি যা বলবেন স্যার—যা করতে হুকুম করবেন স্যার—।

বোস ঘায়েল হতে ভটচাজ ঘোষও কাৎ।

কেটলি হাতে ঝি ঘরে ঢোকে।

এত দেরি করলে মাসি!

বড় ভিড়।

এক হাতে কেটলি আরেক হাতে দুলী তার থেকে পয়সা নেয়। পয়সাওলা হাতটা সুরপতির দিকে বাড়ায়।

ইসারায় সুরপতি ঝিকে দেখিয়ে দেয়।

নাও মাসি। দাদা বকশিস দিল।

কী সেয়ানা! খুচরোগুলো ঝিকে দিয়ে নোটখানা ব্লাউজের খাঁজে চালান করল! পেছন ফিরে তাক থেকে কাপ ডিস নামাতে নামাতে চালান করলেও ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় সুরপতি হুবহু দেখে।

বেলফুলের মালা একটাকা জোড়ায় কী আপত্তি! চায়ের কাপ পড়ল দুটাকা জোড়া! রমার জন্যেই—

রমার কথা কী বলছিলে দুলী? রমা চলে যাচ্ছে মানে।

এখুনি তো রমাদির কাছে শুনবে দাদা।

বলো না তুমি!

রমাদি নিজে তোমায় বলবে বলে দারোগাবাবুকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে। হ্যাঁ দাদা, দারোগাবাবু নাকি বদলি হয়ে যাচ্ছে?

হ্যাঁ—মানে—।

জবাবটা হঠাৎ সুরপতি ঠাওর করে উঠতে পারে না। রমাকে তার হাতে সঁপে দিয়ে মুরারি পাশের বাড়ির সুখী না দুখী কার ঘরে বসছে। একেবারে পাড়া ছাড়া হবে? রমাই আটকে রেখেছে। দারোগা বলে কথা!

সত্যেনবাবু মানুষটা কিন্তু ভালো দাদা। দারোগা হলেও—

মুরারি নতুন কিছু জুটিয়েছে ? হাবড়ায় সেই ডেলি প্যাসেঞ্জার মেয়েটাকে ? পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাট ?

বদলি হয়ে যাচ্ছে দাদা ?

বলছিল বটে।

ওসব ফ্ল্যাটট্যাট যে রিস্কি জানেনা মুরারি ? সাঁতার কাটতে হলে চৌবাচ্চার চেয়ে পুকুরই ভালো জানে না ? নাকি অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে মন্দা পড়েছে বলে, বউ যমজ বিইয়েছে বলে খরচ বাঁচানোর জন্যে চরিত্রবান হচ্ছে।

নাও দাদা। উল্টোরথের উপর দুলী চায়ের কাপটি রাখে। একটি ডিসে চারটি বিস্কুট।

বিস্কুট!

বোনের ঘরে প্রথম পায়ের ধুলো দিলে—শুধু চা দিতে পারি। ঝোল টানার মত শব্দ করে চায়ে চুমুক দিয়ে দুলী বলে, এঘরে আসতে সুচিকে গীতাদি মানা করে দিয়েছে, কিন্তু ফাঁক পেলেই —

বিস্কুটের লোভে ? আর সেই বিস্কুট তুমি আমায় দিলে ?

বাপভাতারীকে বিস্কুট দেব! আজ দুপুরে এসেছিল, এমন তাড়া দিয়েছি!

আহা, মেয়েটা তো কোন দোষ করেনি।

দোষ কি সবাই নিজে করে দাদা ? আমিই কি কোন দোষ করেছিলুম ? ঠোঁটে কাপ চেপে ভুরু তুলে দুলী জুলজুল করে তাকায়।

সেরেছে! চোখ দিয়ে এবার জল ঝরানো শুরু করবে ?

শালার সাহিত্যিক হলেও না হয় কথা ছিল। এদের কাঁদুনিতে রঙ চড়িয়ে গল্প ফেঁদে দিব্যি দুপয়সা কামানো যেত। মাছের তেলে মাছ ভেজেও তেল মজুত। কিন্তু চার-চারটে টাকা গুনাগার দিয়েও কান্না শুনতে হবে?

জানো দাদা, আমাকে যে বিয়ে করবে বলে ভাগিয়ে এনেছিল—

ভালো কথা দুলী, তোমার কাছে যে লেখকবাবু আসত না—মাথায় টাক, ফর্সা মতন, চোখে চশমা—

কেন—কী হয়েছে ?

লিখেছে তোমায় নিয়ে গল্প ?

লিখছে।

লিখছে ? অ্যাদ্দিন হয়ে গেল এখনও---

মস্ত বড় গপ্প যে। সব গুছিয়ে লিখতে হবে না ?

ঘড়েল লেখক। গল্প শেষ হয়ে গেলে পাছে খাতিরও ফুরিয়ে যায়-পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছে। এবং পেঁয়াজের ভেতর থেকে কী না কী মানিক বেরোয় দুলী প্রতীক্ষা করে আছে।

ওর মালের খরচটা তো তোমার, না ? রেটও হাফ ?

ওসব কথা থাক দাদা। দুলী বলে, সেদিন বায়স্কোপ থেকে ফেরার পথে দেখি-কি হারামজাদা দুর্গা মিত্তির স্ট্রীটে ঢুকছে।

হয়ত শর্টকাট্ করছে।

শর্টকাট করছে ! ভরসন্ধেব ট্যাকসি থেকে নেমে—

হয়ত বিয়ে করে সুখী হয়নি, বউটা খাণ্ডারনী---

বউ খাণ্ডারনী হলেই মাগিবাড়ি যেতে হবে ? তাহলে শাশুড়ী দজ্জাল হলে, সোয়ামী নেশাভাং করলে বউরাও ঘরে লোক বসাতে পারে ? বলো, পারে ?

মোক্ষম যুক্তি ! সুরপতি দেখনহাসি হাসে।

সোয়ামীর সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে বউ জন্মের মত বাপের বাড়ি চলে যায় সে এক কথা—বৌদি আর আসবে না, না দাদা ?

তুমি কী করে জানলে ?

রমাদি বলেছে। আসবে না দাদা ?

মনে তো হয়না। চোখমুখ প্রাণপণে করুণ করে সুরপতি ঠোঁট ওল্টায়।

না আসুক গে ! বৌদি একটা হারামজাদী ! এই যাঃ, গালাগাল দিলুম বলে কিছু মনে করলে দাদা ?

সুরপতি ম্লান হাসে। আহা, সুলেখা যদি শুনত !

তোমার মত মানুষকে যে—আবার তুমি বিয়ে করো দাদা। তোমায় পেলে কত মেয়ে বর্তে যাবে।

বিয়ে করার সাধ আমার মিটে গেছে দুলী। এই বয়সে—

ব্যাটাছেলের আবার বয়েস! দেখো, রমাদিও বিয়ে করতে বলবে। আমায় বলছিল, আমি চলে গেলে মিহিরবাবুর খুব কষ্ট হবে।

রমা কোথায় চলে যাবে?

অ্যাই দ্যাখো! বলব না বলব না করেও—

লক্ষ্মীটি বলো! লক্ষ্মীটি! দুলী! দুলু! দুলুরাণী!

আমার গা ছুঁয়ে বলো আমি বলেছি রমাদিকে বলবে না। রমাদি তোমায় নিজে বলবে বলে—

বলব না! বলব না! বলব না! প্রতিজ্ঞা করতে করতে সুরপতি চড়াক করে উঠে দাঁড়ায়, গা ছোঁয়ার বদলে এক হেঁচকায় দুলীকে টেনে নিয়ে জাপটে ধরে। বলো বলো, রমা কোথায়—

সাবাস!

চমক খেয়ে সুরপতি পাশ ফেরে। দরজায় রমা।

তুমি!

আবার বলি, আউরংগজেব, সাবাস!

পরনে সাদা খোলের চওড়া লাল জরিপাড় শান্তিপুরে। চিকনের ব্লাউজ। সিঁথেয় দগদগে সিন্দুর। কপালে আধুলির মত টিপ। নাকে হীরের নাক-ছাবি। কানপাশা। হাতভরা চুরি বালা চুড় অনন্ত। গলাভরা বিছে হার। গালভরা পান।

ওমা! কী সেজেছ গো!

এদিকে যে কেল্লা ফতে হচ্ছিল। দরজার পাশে জলের বালতি বাঁচিয়ে পচ করে পানের পিক ফেলে রমা বলে, আমাকে খুঁজতে খুঁজতে তোকেই—

মর্ মুখপুড়ি! মুখে পোকা পড়বে। দাদা শুধোচ্ছিল—মাইরি, তোমায় যা দেখাচ্ছে না রমাদি! ও দাদা?

দুই চোখ সুরপতির ছানাবড়া। খানিক আগে এই রমাকেই দেখে এসেছে? অবিকল সুলেখার মেজ মাসি এই রমাকে?

মেজ মাসি অবিশ্যি নাকে নাকছাবি পরে না। হাতে অনন্তও না। হিন্দুস্থান পার্কের বাসিন্দা যে! ব্যারিস্টারের বউ যে!

বাইরে বেরোয় ছিমছাম হয়ে। কিন্তু বাড়িতে থাকে ভরি চল্লিশেকের

গয়না চড়িয়ে। হিন্দুস্থান পার্কের বাসিন্দা হলেও ব্যারিস্টারের বউ হলেও মল্লিকপুরের জমিদার গিন্নী না? শ্বশুর শাশুড়ী এখনো জলজ্যান্ত না?

জমিদারি উচ্ছেদের তাল সামলাতে বাড়ির কুকুর বেড়ালের নামে অজিদ জায়গা জমি লিখে রাখতে হলেও মল্লিকপুর থেকে প্রজারা মাঝে মাঝে এখনও আসে না?

রমার গয়নাগুলো গিল্টির? কী যায় আসে সাচ্চা-ঝুটায়! দেখন্তির কী যায় আসে?

সুলেখা ইদানীং পরে পুঁতির মালা প্লাস্টিকের বালা পাথরের টাব। তাইতেই সেদিন সেন ঘায়েল। স্বামীটা পাশে বহাল তবু কী রকম চনমন করছিল!

স্লিভলেসের দরুন? সিফনের শাড়ির দরুন? গাড়োল! গাড়োল! এতকাল পুলিশে চাকরি করেও মেয়েদের মামুলী জোচ্চুরিটা ধরতে পারলি না?

দাদার যে মুখে রা নেই! মুখ টিপে হেসে দুলী শুধায়, ঘর থেকে একটু বেরিয়ে যাব দাদা?

কেন লো ছুঁড়ি, আমার ঘর নেই না আমার খাটের গদি শক্ত? কি গো আসবে? না এখানেই—

ফের! মুখে পোকা পড়বে রমাদি, মুখে পোকা পড়বে! তুমি—তুমি—গলা দুলীর ধরে আসে।

ঠাট্টাও বুঝিস না!

না বুঝি না। বেশ করি বুঝি না। ঠাট্টা! যত সব—

মাপ চাইছি বাবা মাপ চাইছি! দুলীর গাল টিপে দিয়ে মুখে তার রমা হাসি ফোটায়। এসো গো নাগর। ননদটি আমার বড় কাঁদুলে। সুরপতির কাঁধে হাত রাখে।

সুরপতি জড়ায় কোমর।

তোমাদের দুটিতে যা মানিয়েছে না! একটা পেন্নাম করব? করি দাদা? করি রমাদি? অনুমতির তোয়াক্কা না করেই দুলী পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে।

আহা, প্রণাম জিনিসটা বড্ড উপকারী। সুরপতি হাত চালায়। রমা গাল কামড়ে দেয়।

প্রণাম করতে গিয়ে মানুষের মন বিগড়েও যায়। ব্যারিস্টারের মিসেসকে বিজয়ার প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। আর কিছু না পেরে পায়ের পাতায় হাত দিয়ে চাপ দিয়েছিলাম! প্রথমবার। দ্বিতীয়বার কপাল ঘষে ছিলাম। তৃতীয়বার অনেক লোক থাকায় শুকনো প্রণাম সেরে মাথা ধরার অজুহাতে দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। কী হল খোঁজ নিতে এসে জমিদার গিন্নি মাথায় হাত দিলে হাতটা মাথার সঙ্গে চেপে রেখেছিলাম। মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে? সারিডন খাবে বাবা? বলতে হাত ছেড়ে দিয়ে মনে মনে খিস্তি করে উঠেছিলাম।

তোমার দুটো মালা আছে রমাদি। দাদা কিনেছে।

মালা আর চাই না। হ্যাঁ গা, চাই?

সুরপতি অনর্গল মাথা নাড়ে। খোঁপায় মালা পরা মেয়েগুলো নেকির বেহদ্দ।

শ্রীলেখার হাতখানা শুধু ধরেছিলাম, খোঁপাটা ভালো করে দেখার জন্যে কাছে টেনেছিলাম—অমনি দিলেন তো জামাইবাবু সব নষ্ট করে! বলে হাত ছিনিয়ে নিয়ে দু পা পিছিয়ে গিয়ে দু হাতে খোঁপা ঠিক করার ছলে বুকের আঁচল খসিয়ে টাটকা ফ্রক-ছাড়া মেয়েটার দুচোখে সে কী ছলবলানি! পা বাড়ানো মাত্র অসভ্য! বলে দৌড়।

চাই না বললেই শুনেছি কিনা। মালা দু গাছি দুজনের গলায় পরিয়ে দিয়ে দুজনকে পিছন থেকে দুলী ঠেলে দেয়। যাও—বেরোও—ভাগো!

এ ঘরে ঢুকেই রমাকে সুরপতি প্রচণ্ড এক কিস্তি আদর করে। কী ভয়ানক সাধটা বুকে চেপে তিনবার প্রণাম করতে হয়েছে ব্যারিস্টারের বউকে! তিন বছরে তিনবার। তিন তিনটি বছর ধরে সাধটা বুকে ফুঁসছে।

তিন বছরের শোধ মিনিট তিনেকে তোলে।

গুণ্ডা কাঁহাকা!

খাটে বসে হাঁফায়।

শাড়িটার সামলাতে সামলাতে রমা শুধায়, সেদিন যা বলেছিলে ঠিক ঠিক হয়েছে তো বাপু?

আঠারো আনা হয়েছে। তুমি না—

আবার!

আবার বলে চোখ পাকালেও রমা এগিয়ে এসে গলা জড়িয়ে ধরে। কিছুক্ষণ সুরপতির মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর গালে গাল রেখে আয়নায় তাকিয়ে বলে মানায় না গো! দুলীটা যাই বলুক, তোমার পাশে আমায় মোট্টে মানায় না। তুমি কী সুন্দর! আর আমি! বয়সে বড়, মুটকি—

কেন বাজে বকছ।

রমাও নাটক করতে শুরু করল? মুটকি বলে বয়েস বেশি বলেই তো আসি। সুলেখার চেয়ে বেশি ভালোবাসি। হ্যা, ভালোই বাসি। আমার প্রতিটি শখ যে মেটায় তাকে ভালো না বেসে কি পারিরে! পারিরে! পারিরে! সুলেখা যৈসব প্রস্তাব শুনলেই আঁতকে উঠবে—

তোমার স্যালাড করা আছে। ছোট একটা জিনও—

জিন?

ফিরবে না আজ?

ফিরতে হলে জিন খেতে হয়। জিনে সুলেখার আপত্তি নেই। ঘরে বসে জিন খাওয়াতেও না। দেখতে মদের মত নয়। গন্ধই বা কই! লেমন-জিন তো শরবৎ। সুলেখাও চেখে দেখতে রাজি। তবে চাখার বেশি না। তোমার মতলব বুঝি না? আমাকে মাতাল বানিয়ে যাত্রা শুরু করবে? এমনিতেই—

কী ফিরবে না?

খেপেছ! আজ হোল নাইট পারফরমেন্স।

ভাগ্যিস বাপটা সুলেখার মর মর। লাখ কয়েক টাকার সম্পত্তির মালিক শ্বশুরটা।

দুই দিদির কথা শুনে ভাগ্যিস সুলেখারও খেয়াল হয়েছে এখন একটু সেবাযত্ন করে বাপটাকে পাহারা দেওয়া দরকার। নইলে দাদা দুটো বোনদের কচু দেখাতে নির্ঘাত উইল করিয়ে নেবে। দুই বৌদিও যা ধুরন্ধর।

দিশি?

দিশি দিশি। এক নম্বর।

ম্যান ইজ মরট্যাল। মানুষ মরণশীল। শ্বশুর মশায় মরবে। সেকালে রায়াবাহাদুর একালে কংগ্রেসী নেতা গাছের খেয়েছে, তলারও কুড়িয়েছে। ইদানীং ধর্মে মন দিয়েছিল দাঁত পড়ে যেতে মাংস ছাড়ান। একটা গরু পাকড়েছিল। এতদিনের জমা নোংরা ঢেলে ফেলে ঝাড়া হাত পা হয়ে স্বর্গে পাড়ির ডাস্টবিন।

মরুক কদিন ভুগে। জামাইকে একটু ফুর্সৎ দিয়ে যাক ফুর্তির।

সুলেখা ফিরে এলে হোলনাইট তো—

একটা শাড়িফাড়ি দাও। কাঁহাতক এই ধড়াচুড়া পড়ে—। নিজেই সুরপতি আলনা থেকে শাড়ি টেনে নেয়। প্যাণ্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলে. দিশির মত জিনিস নেই বুঝলে। বড়লোক বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে হুইস্কিটুইস্কি খাই—খেতে খেতে মনে পড়ে দিশির কথা। সোডা ছাড়া দিশির কথা। সোডা দিলে জল-জল লাগে। বরং একটু লেবু দিলে চমৎকার ঝাঁঝ হয়। গন্ধটাও দিব্যি—। ভীম নাগের সন্দেশ ভালো, কেমন? কিন্তু অ্যালেনের কাটলেট চাইলে যদি কেউ এক প্লেট সন্দেশ ধরে দেয়—

সন্দেশের নিন্দে করো না। বাপু।

আহা, নিন্দে করছি না ব্যাপারটা—

বুঝেছি। কষা মাংস? সঙ্গে পরোটা, না পাউরুটি।

নো রুটি-পরোটা। প্লেট চারেক মাংস আনাও। দাঁড়াও, টাকা দিচ্ছি। তাড়াতাড়িতে টাকাও বেশি—

টাকা চাই না। আজ তুমি আমার অতিথি।

অতিথি? সত্যেন বলছিল বটে—কী ব্যাপার বলো তো?

বলব বলেই তো—চার প্লেট একা খেতে পারবে? আমি কিন্তু আজ খাব না।

খাবে না? কেন? তুমি খাবে না কেন?

আজ একাদশী না?

একাদশী!

বিধবা হলেও আঠারো আনা সধবা সাজতে আপত্তি নেই—তবু

একাদশী ? এই সাজে আমি সাজতে বলেছিলাম বলে সেজেছে ? আমিই যদি মাংস খেতে বলি আপত্তি করবে ? যদি বলি গয়নাগাটি পরে স্রেফ গামছা জড়িয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে এক হাতে মাংস আরেক হাতে মাল খেতে হবে, মাংসের হাড় চিবোতে চিবোতে গেলাসে চুমুক দিতে হবে— রাজী হবে না ?

তোমাকেও মাংস খেতে হবে। আমি বলছি—খেতে হবে।

তুমি যদি বলো—

`ছি। খাবে না ?

হাসি মুখে সায় দিয়ে টাকা বের করার জন্যে রমা ড্রেসিং টেবিলের ডালা খোলে।

দ্যাখো, সুলেখা দ্যাখো। আমার একটা শখ তুমি মেটাও না। সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ যে ! নিউ এমপায়ারে মায়ার খেলার প্রমদা যে ! রায়বাহাদুরের মেয়ে যে ! দেড় হাজারী অফিসারের বউ যে ! মহিলা সমিতির মক্ষিরাণী যে !

অথচ দস্তুরমত প্রেম করে তোমাকে বউ বানিয়েছি। আর পাঁচ জনের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রেম করে।

মিসেস রাওকে সমিতির প্রেসিডেণ্ট করে মোটা রকমের চাঁদা বাগাতে মিস্টার রাওয়ের সাথে তুমি ফ্লার্ট করতে পারো, চ্যারিটি শোয়ের পঁচিশ টাকার টিকিটগুলো বেচার জন্যে মিসেস মুখার্জির ডাকসাইটে ডিক্চ দেওরটার সাথে রাত দশটা অব্দি গাড়ি নিয়ে ঘুরতে পারো—অথচ বিশুদ্ধ মন্ত্রপড়া নির্ভেজাল অগ্নিসাক্ষী জন্ম-জন্মান্তরের গাঁঠছড়া-বাঁধা পবিত্র স্বামীদেবতা যদি কোন আব্দার জানায়—

রমার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতায় বুকটা সুরপতির ঘন ঘন ঘাই মারে। কী বাধ্য মেয়েটা ! কী বাধ্য ! কী বুঝন্তি !

যা বলি শোনে ! যাই বলি ! যা ইচ্ছে বলি ! যা প্রাণ চায় বলি !

রমার মত মেয়ে কোটিকে গুটিক।

রমাকে না পেলে বাঁচতাম কী করে ? ওই চাকরি ! ওই ইউনিয়ন ! ওই বউ ! ওই পরিবেশ ! ওই জীবন !

মাঝে মাঝে কড়া পারগেশন ছাড়া কেমন করে হয় ?

মুরারিটা যা উপকার করেছে! মুরারি! মুরারি! হরে মুরারে মধুকৈটভ ভারে—

আগের দিন রাত আটটা নাগাদ মুরারির নামে গুণ গুণ করে গান গায়, পরের দিন বেলা আন্দাজ বারোটায় মুরারি ঢোকা মাত্র মিস রায় উইল ইউ প্লিজ—বলে পিএ-কে চেম্বার থেকে বের করে দিয়ে গর্জে ওঠে।

স্টুপিড! সোয়াইন! রাসকেল!

কী ব্যাপার বলবি তো? চেয়ারে বসে মুরারি শুধায়. সাতসকালে বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলি দেখেই বুঝেছি ব্যাপার গুরুতর। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

আমাকে এভাবে ফাঁসালি কেন?

ফাঁসালাম? তোকে?

কেন রমাকে বলে এসেছিস যুগবার্তার সবাই আমার চেনাজানা? আমি বললেই—

আচ্ছা! রমা জানতে চাইল তুই যখন সাব এডিটার—

আমি তো বিশ্ববন্ধুর—

আমি যদি কসবা থানার ওসি হয়ে বড়তলা জোড়াসাঁকোর সবাইকে হাতের মুঠোয় রাখতে প'রি, পারে—একটা কাগজের লোক আরেকটা কাগজের লোককে চিনবে না?

সুরপতি থতমত খায়। অকাট্য যুক্তি।

কিন্তু হয়েছেটা কী?

তুই কিছুই জানিস না? তোকে বলে নি?

নাঃ!

ওর ছেলে অ্যাদ্দিন যুগবার্তায় লাইনোর কাজ শিখছিল। কাজ শেখা সারা। এবার চাকরিটা যাতে পাকা হয়ে যায়—

তোকে চেষ্টা করতে বলেছে?

হ্যাঁ। যুগবার্তায় না হলেও অবশ্য মডার্ন বেঙ্গল প্রেসে হয়ে যাবে। তবে যুগবার্তা খবরের কাগজ—প্রেস্টিজ—

বটেই তো! সুরপতির গোল্ডফ্লেকের কৌটো থেকে সিগারেট তুলে নিয়ে মুরারি বলে, তা দেখ না যদি কোন সোর্সটোর্স থাকে—তুই চেষ্টা করলে—

সব শোন আগে, মাগিটার কী মতলব জানিস ? ব্যাটার চাকরি হলে এ লাইন ছেড়ে দেবে। জগাছা না কোথায় ছোটখাট একটা বাড়ি কিনেছে—বছর তিনেক—আগেই—

বাহাদুরি বলতে হয়। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা, বাড়ি কেনা। আর আমি কবে জায়গা কিনে রেখেছি—

তাছাড়াও হাজার সাতেক টাকা জমিয়েছে—

বটে !

ছেলের চাকরি হলে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে জগাছার বাড়িতে উঠে যাবে। তারপর ছেলের বিয়ে দেবে, নাতি নাতনী হবে—কত প্ল্যান ! কত পরিকল্পনা। খালি পেটে একটি বোতল গেলালাম—কিন্তু একটুও টসকাল না ! কেবলি ভবিষ্যতের কথা—

অনেকদিন থেকে মহড়া দিচ্ছে তো ! সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা মেঝেয় ফেলে ফের তুলে নিয়ে অ্যাসট্রেতে গুঁজে মুরারি বলে, যাক ! বেঁচে গেল !

মানে ? মুখের সিগারেট সুরপতির ছিট্‌কে পড়ে।

বেঁচে গেল না ? রোজগেরে ছেলে থাকলে, মাথা গোঁজার আস্তানা থাকলে কোন্ মা—

তুই শুধ ওদিকটাই ভাবছিস ! টেবিল থেকে দুয়ানি-পোড়া সিগারেটটা নিয়ে অ্যাসট্রেস্থ করে সুরপতি নতুন সিগারেট ধরায়। রমা চলে গেলে আমার কী গতি হবে ভেবেছিস ? এমন একখানা—

রমার অভাব গণ্ডায় গণ্ডায়—

কিন্তু ওর মত—

একটা যাবে দশটা আসবে। বাজারের যা হালচাল ! ভ্যাকুয়াম থাকবে না।

ধেত্তোর বাজারের হালচাল ! রমার যাওয়া চলবে না—সাফ কথা। রমা হারা হয়ে—

রমা হারা মোহন !

ইয়ারকি নয়। রমা হারা হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি ভেবে দেখেছি, রমাকে রাখার একমাত্র উপায় ওর ছেলের চাকরি যাতে না হয়—

সুরপতি !

চেঁচাসনি। তোকেই ব্যবস্থাটা করতে হবে। যুগবার্তার অফিস-স্টেশনারি তুই সাপ্লাই করিস—

চলি।

বোস। কফি আসছে। মডার্ন বেংগলের ভার আমার। আমরা ওদের পার্টি। ওটা আমি—উঠলি যে?

মাগির দালালি করতে রাজি আছি। খুঁজে পেতে আরেকটা রমা—একেবারে গাছখানাকি রমা—

আস্তে! আস্তে!

জুটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কারো চাকরিতে বাগড়া দিতে পারব না।

মুরারি বেরিয়ে যায়।

উঠে দাঁড়িয়েছিল, ধপ করে স্নরপতি বসে পড়ে। রিভলভিং চেয়ারে আধপাক ঘুরে নেয়।

বাস্টার্ড! বন্ধু নয়—বাস্টার্ড! থিয়েটারী প্রস্থান!

নির্ঘাত ওর ভি-ডি হয়েছে। ভি-ডি হলে অমন বৈরাগ্য আসে। সুশীল সরকার তো নিজের বউকে ছোঁয়া অব্দি ছেড়ে দেয়। ইনজেকশনের কোর্সটা শেষ না অব্দি গীতা-ভাগবত নিয়ে পড়ে থাকে।

নাকি কমিউনিস্ট হয়ে গেল মুরারি? অফিসের কর্তা বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও একটা অর্ডারও না পাওয়ায় গরিব-গুর্বোর জন্যে দরদ উথলে উঠল।

কমিউনিস্ট হলে মরেছে মুরারি। কমিউনিস্ট হলে দফা সারা।

ভি ডি থেকে কমিউনিজম ডেঞ্জারাস। পেনিসিলিনে ভি ডি শায়েস্তা হয়, কিন্তু কমিউনিজম শায়েস্তা করা—

সিগারেটের বদলে স্নরপতি পাইপ তুলে নেয়। না ধরিয়ে পাইপটা দাঁতে কামড়ে থাকে।

ভালোয় ভালোয় কাজটা হল না। বন্ধু হয়ে মুরারি বেঁকে দাঁড়াল। অগত্যা—

অগত্যা সেনের শরণই নিতে হবে। সেনও বন্ধু। দুর্দিনের বন্ধু। আসলি বন্ধু।

এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার? কিন্তু এই ব্যক্তিটিই কি এত বড় অফিস-

চালাচ্ছে না? এই ব্যক্তির মনমেজাজ না ঠিক থাকলে অফিস ঠিক থাকবে?

ডি আই উঠে যাচ্ছে? যাক। দেশের যা হালচাল! ভ্যাকুয়াম থাকবে না। ভ্যাকুয়াম! এই কথাটা মুরারি কিন্তু—

সুরপতি পাইপ ধরায়। ব্যবস্থা একটা সেন খুঁজে বার করবেই। বমার প্ল্যান বরবাদ করে দিতে ছেলেটাকে তার বেশ কিছুকাল জেলে আটকে রাখার ব্যবস্থা একটা। ডি আই উঠে গেলেও পি ডি থাকবে।

আর কিছু না হোক—এসেনসিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট তো আছে?

প্রেমিক প্রেমিকা

মিহিরের অনর্গল সান্ত্বনাতেও সুধার হিক্কা থামে না। ঠোঁটের ওপর বসে যায় দাঁতের পাটি। চোখ জোড়া হয়ে ওঠে রসবড়া।

শুধু মুখের কথায় কাজ হবে না। হাতটা টেনে নেওয়া দরকার। মাথাটা বুকে চেপে ধরা।

কিন্তু ভরদুপুরে মিশন রোয়ে যায় কোন যুবতীর মাথা বুকে চেপে ধরা? সম্পর্কটা মাথা-বুকে-চেপে ধরার বাড়া হলেও?

এদিক ওদিক তাকিয়ে মিহির তাই করে-কি 'ট্যাকসি ট্যাকসি!' হাঁক পেড়ে দৌড়ে গিয়ে চলন্ত এক ট্যাকসির সামনে গৌরাঙ্গ মাফিক নাচ শুরু করে দেয়।

এবং 'না না না!' বলে জোরালো আপত্তি জানালেও দরজা খোলার তর সয় না—ট্যাকসিতে উঠেই সুধা হাঁটুতে মুখে গুঁজে জুড়ে দেয় কান্না।

হাউ হাউ কান্না!

'এত সহজে ভেঙে পড়লে!' আয়নায় ড্রাইভারের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় মাথা বুকে চেপে ধরার বদলে সুধার হাতটা মিহির টেনে নেয়। 'আর ভাবোতো আমার কথা!'

ডজন দুয়েক ইন্টারভিউয়ে জোটানো চাকরিটিও টেমপোরারি। পয়লা দফায় নাকচ হওয়ায় ভেঙে পড়া সুতরাং উচিত নয়। সুধাও বোঝে।

কিন্তু লাভ বুঝে? খাদ্য না জুটলে খাওয়া হয় না—খিদে তাই বলে উবে যায়?

'হবে না হবে না—কোনওদিন আমার—!

কী অপমান! কী অপমান! সে ঢোকা মাত্র লোকটি ঘাবড়ে গিয়েছিল। 'আপনিই মিস রায়? সুধা রায়?' সামনে ভূত দেখার মত করে চেয়ে ছিল। 'আচ্ছা আসুন—পরে খবর পাবেন।' পত্রপাঠ বিদায় করে। কী অপমান! কী অপমান! দমকে দমকে ফোঁপায় সুধা।

'চাকরির যা বাজার—!' পিঠে হাত বুলোতে গিয়ে মিহির চমক খায়। টান লেগে পিঠ-বোতাম ব্লাউজের ফাঁকে বডিজের হুকটা বেরিয়ে পড়েছে! পট করে ভেঙে যায় যদি।

'বোসো, সোজা হয়ে বোসো।' সুধাকে সোজা করে বসিয়ে দেয়। গায়ের জোরে দেয়।

'তোমার জন্যেই আজ—!'

'আমার জন্যে!'

না, মিহিরের কোন দোষ নেই। প্রেমিকাকে প্রেমিক সুন্দর দেখবেই। প্রেমিকা কালো হলেও। মোটা হলেও। ট্যারা হলেও।

কিন্তু তার কাছে যত সুন্দরীই হোক রিসেপশনিস্ট হিসেবে সুধা অচল মিহির কি তাও বোঝেনি? প্রেমে এমনই অন্ধ? নাকি ইচ্ছে করেই, অন্যের কাছে সুধার যে কোন দাম নেই সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যেই, চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যেই—

'লেখাপড়া! লেখাপড়া, না চেহারা—বাজারে মেয়েমানুষের কিসের দাম বেশি? বিয়ের বাজারে? চাকরির বাজারেও?

জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি সুধার বমির মত গলগল করে বেরিয়ে আসে।

একসেপশন অবিশ্যি আছে। জ্যোৎস্না। খোঁড়া মেয়েকে বাড়ি বেচে বাপ বিলেত ফেরত ইনজিনীয়ার কিনে দিয়েছে। কিন্তু একসেপশন একসেপশনই।

'অ্যাই—তাকাও না—অ্যাই!' সুধার মুখখানি মিহির তুলে ধরে।

'বাবাকে গিয়ে এখন কী বলব!' সুধার গাল ভেসে যায় চোখের জলে।

'বলবে, পরে জানাবে বলেছে। আমি যেমন বলতাম। ইন দি মিন টাইম—'

মিহির আর সুধা যেন এক! প্রেমিক প্রেমিকা হলেও এক।

বেকারির খোঁটা অসহ্য হয়ে উঠলে দাদা-বৌদির সংসার ছেড়ে মিহির চলে আসে। বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি রাত কাটায়, ধারধোর করে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটায়। বছর দেড়েকের চেষ্টায় একটা চাকরী জুটিয়ে মেসে গিয়ে উঠেছে। এবার সংসার পাতবে।

সুধার চাকরী হলে পাতবে।

কিন্তু চাকরী না হওয়া তক সুধাকে তো বাপের সংসারে থাকতে হবে? বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি রাত কাটানো, ধারধোর করে খেয়ে না খেয়ে দিন-কাটানো তো সুধার পক্ষে সম্ভব নয়?

মিহিরকে খোঁটা দিত শুধু দাদা বৌদি, সুধাকে দেবে বাপ মা পিসিমা সমেত দুই দাদা এক বৌদি। ভাই বোনগুলিও তেরছা চাইবে।

বি-এ পাশ করায় যে-সব বুক সেদিন বেলুন হয়ে উঠেছে এখন সেগুলি হয়ে যাবে পোড়া বেগুণ।

এমন কুৎসিত মেয়ের বিয়ে হতে পারে না, বাড়ি বেচে পাত্র কেনার প্রশ্নই ওঠে না। চাকরি ছাড়া অতএব সুধার গতি নেই। রান্না করা বাসন মাজার জন্যে তো তোকে বি-এ পড়ানো হয়নি।

সুধার চাকরী হলে বাচ্চা বিইয়ে তলপেটের যন্ত্রণার হাত থেকে বৌদি রেহাই পাবে, মা রোজ মাছ আনবে, ছোড়দা বউ আনবে, পিশি তীর্থে যাবে, একসটেনশনের উমেদারি ছেড়ে বাবা মান বাঁচাবে, নির্ঝঞ্ঝাটে ভাই বোনগুলির পড়াশোনা চলবে।

কত আশা করে আছে সবাই। সুধারই সামনে কত প্ল্যান-পরিকল্পনা করেছে সবাই।

হাসি হাসি মুখে সায় দিয়েও মনে মনে সুধা দাঁতে দাঁত ঘষেছে। স্বার্থপর এই সংসারটাকে কলা দেখাবার দিন গুণেছে। প্ল্যান-পরিকল্পনা সেও করেছে।

আর এখন? মিহিরের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এখন? এখন!

সুধার হাতে চাপ দিয়ে মিহির বলে, 'সাত দিনের মধ্যেই ফের ব্যবস্থা করছি, দ্যাখো না চাকরী হবেই। আলবাৎ হবে। অলক বলছিল—'

আবার! আজকের পরেও আবার! 'না। আর কক্ষণো আমি ইণ্টারভিউ দেব না।' এক হেঁচকায় সুধা হাত টেনে নেয়।

মিহির যায় হকচকিয়ে। তবে কি শুধু মুখের কথায় মন মানছে না? শুধু হাত ধরায়? জোরালো আদর-সোহাগ ছাড়া কাজ হবে না?

কিন্তু ট্যাকসিতে সেটা কী করে সম্ভব? কতখানি সম্ভব?

তবু মিহির কোসিস করে। আয়নায় চোখ পেতে বাঁ হাতে সুধার কোমর প্যাঁচায়, ডান হাত বাড়িয়ে—

কিন্তু তার আগেই 'সরো!' বলে এক ঝটকায় মিহিরের বাড়ানো থাবাটা ঠেলে দিয়ে নিজেও সুধা সরে বসে!

'পাগলি!' থতমত খেয়েও মিহির হাসে। দেখনহাসি। উঁহু, ট্যাকসিতে সুবিধে হবে না। রেস্তরাঁয় নিয়ে তোলা দরকার। 'চলো, চা খাওয়া যাক।'

'না।'

'না। যখন তখন আমি চা খাই না।'

'তুমি না হয় অন্য কিছু খাবে। চা খেতে খেতে'—

'না।'

'না কি না! সব কথাতে না! সর্দারজী রোককে। নামো!'

নতুন চাকরীতে কামাই করায় মনটা খচখচ করছিল, প্রথম রাউণ্ডেই সুধা আউট হয়ে যাওয়ায় দমে গিয়েছিল, তার উপর ট্যাকসি বাবদ একটা টাকা গচ্চা গেল, রেস্তরাঁয় কোননা টাকা দুই যাবে।

সুধাকে এক রকম টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে তাই স্বস্তি পায়।

তিন তিনটে টাকা ডাহা লোকসানের জন্যে সুধাই না পুরো দায়ী। রাস্তায় অমন সীন ক্রিয়েট করল বলেই না ট্যাকসি নিতে হল? তাতেও কাজ না হওয়ায় রেস্তরাঁয় ঢুকতে হচ্ছে?

অথচ এই তিন টাকায় ভাঁড়ের চা আর ঝাল মুড়ি দিয়ে এক হপ্তা প্রেমের খরচ দিব্যি চালানো যেত।

কেবিনে ঢুকে নিজেই মিহির পর্দা টেনে দেয় তারপর ট্যাক্সি থেকে টেনে হিঁচড়ে নামানোটা ম্যানেজ করতে আচমকা সুধাকে জাপটে ধরে পটাপট কয়েকটা চুমো খেয়ে নেয়।

'এত অবুঝ হলে কি চলে সোনা। অল্পে ভেঙে পড়তে নেই। এখন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখা যাক—'

'ভাবার কিছু নেই।' মিহিরের থুতু মোছার জন্যে রুমাল দিয়ে সারা মুখ রগড়াতে রগড়াতে শান্ত গলায় সুধা বলে, 'চাকরি যে আমার হবে না —কোনওদিন হবে না—'

'কোন শালা বলে হবে না।'

'নমুনা তো দেখলাম !'

'ও কথা আমিও একদিন ভাবতাম। কোনদিন চাকরি হবে না ভেবে সুইসাইড পর্যন্ত করতে গিয়েছিলাম—মনে পড়ে? তুমিই তো সেদিন আমায়—সেদিন তুমি যদি না—'

কৃতজ্ঞতা উথলে ওঠায় আরেক কিস্তি আদর করতে যাচ্ছিল, বয় এসে পড়ায় মুলতুবি রাখতে হয়।

'কী খাবে বলো ?'

সুধা ঘাড় নাড়ে।

'খাবে না ! ইয়ার্কি ! আমি খাইয়ে দেব।'

'খেয়ে বেরিয়েছি।'

'ইণ্টারভিউয়ের খাওয়া—জানি তো !'

না, মিহির জানে না। সুক্তো, ডাল। আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা। মাছের ঝোল। চাটনি, দই। সামনে বসে মা জামাই আদরে খাইয়েছে। বাবা তদারক করেছে।

বৌদি পান সেজে এনেছে। বেরোবার সময় মাথায় পিশি গঙ্গাজল ছিটিয়েছে। দুর্গা দুর্গা জপতে জপতে গলির মোড় পর্যন্ত সবাই এগিয়ে দিয়েছে। ভাইবোনেরা বাস অব্দি। দুই দাদা ডালহৌসি।

সে যে কী খাতির মিহির ভাবতেও পারবে না।

ভাবতে অবশ্য সুধাও পারে না ফিরে গেলে অভ্যর্থনাটা এখন কেমন দাঁড়াবে। বাড়িতে মড়া কান্না পড়ে যাবে কিনা।

'দুটো কবিরাজী আর চা।'

'আমি কিন্তু খাবো না।'

'আনুক তো।'

'না।'

'সুধা !'

'না !'

পিত্তি মিহিরের জ্বলে যায়। বাড়াবাড়ি ! এটা স্রেফ বাড়াবাড়ি ! একসপিরিয়েন্সড মেয়েরাই যখন চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে, টাটকা

কলেজ থেকে বেরিয়েই চাকরি পেয়ে যাবে ভাবে কী করে? প্রথম বারেই পেয়ে যাবে?

তাও যদি চেহারায় চটক থাকত! চলনে-বলনে চৌকোশ হত! স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর কলেজে ভরতি হওয়ার আগে বছর চারেক একের-পর-এক পাত্রপক্ষের কাছে বাতিল হয়ে হয়ে বাতিল হওয়াটা মামুলী ব্যাপার না হয়ে যেত!

'দু কাপ চা। চাও খাবে না? আচ্ছা! এক কাপ। জলদি।'

ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দেওয়ার সাধ যায়। কিন্তু না, বউকে চড়চাপড় মারা চললেও প্রেমিকার ওপর বেশি চোটপাটে প্রেম ভেস্তে যেতে পারে। বউকে লাথি মারলেও রাত্তিরে বউয়ের পায়ে বারেক মাথা কুটলেই আস্ত বউ বুকে চলে আসে। বিয়ের বাঁধন জবর বাধন।

কিন্তু প্রেমিকার কাছে মেজাজ দেখানোও রিসকি। প্রেমের বাঁধন বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

নইলে অতসীকে হারায়। নিজে থেকে বডিজের স্ট্যাপ খুলে দিত যে অতসী, বলা মাত্র হোটেলের ঘরে গিয়েছিল যে-অতসী—রাস্তায় একদিন কথা কাটাকাটির জন্যে সেই অতসী কিনা সম্পর্ক চুকিয়ে দিল?

মাইনে, ডি-এ, ইত্যাদি নিয়ে অতসীর রোজগার এখন কমসে কম শ চারেক। বেমক্কা সেদিন মাথা গরম না করলে আজ—

অতসীর জন্যে আপসোসে আর সুধার ওপর আক্রোশে মিহির গুম হয়ে যায়। দু হাতে চুল খামচে ধরে টেবিলে কনুই রাখে। ভোঁস ভোঁস শ্বাস ছাড়ে।

তাই দেখে মনটা সুধার টনটনিয়ে ওঠে। বেচারা! ও-ও বড় আশা করেছিল। চেনাজানাব মধ্যে ইণ্টারভিউ যখন নির্ঘাত চাকরি হবে। প্ল্যান পরিকল্পনা ও-ও করেছিল।

আজ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেলে আজই রেজিস্ট্রী করে দুজনে গিয়ে মা-বাবাকে প্রণাম করবে। ও'রা ভালোভাবে নেন ভালো, নইলে সটান বারীনের ফ্ল্যাটে।

আলাদা বাসা না পাওয়া পর্যন্ত একখানা ঘর বারীন ছেড়ে দিতে চেয়েছে। প্রীতি তো পেয়িং গেস্ট হিসেবে বরাবরের মত রাখতে চায়।

বেচারা! দরদী গলায় সুধা সুধায়, 'রাগ করলে? আমার ওপর রাগ করেছ?'

মিহির সিগারেট ধরায়।

'তুমিও যদি আমার ট্রাজেডি না বোঝ!'

সুধা সিকনি টানে। 'তুমি তো জানো সংসারটা আমায় কী চোখে দ্যাখে।'

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে মিহির ধোঁয়া ছাড়ে।

'তুমি ছাড়া আপন বলতে আমার কে আছে বলো। তোমার কাছেও যদি মনের দুঃখ—।' গলা বুজিয়ে মিহিরের কাঁধে মাথা রাখে।

'এখনি বয় আসবে। সরো।'

'আহা, বয়-বেয়ারাদের কত লজ্জা মশায়ের!' মিহিরের কানে আলতো এক কামড় বসায়।

'আঃ।'

'খোকার লাগল বুঝি চুচু চুচু! আর নিজে যখন রাক্ষসের মত—ভালো হচ্ছে না কিন্তু। অমন হাঁড়ির মত মুখ করে থাকলে আমি কিন্তু যাতা করে বসব। তুমি কোথায় আমায় আদর করে—'

'আদর! আদর বোঝো তুমি? স্বার্থপর কাহাকা! শুধু নিজের কথা ভেবেই—নইলে গোড়া থেকে বলছি সাত দিনের মধ্যে আবার—'

'ঘাট হয়েছে ঘাট হয়েছে ঘাট হয়েছে!' এক টানে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মিহিরের হাত দুটি নিজের দুই বুকে সুধা চেপে ধরে। 'সাজা দাও। যেমন খুসি ইচ্ছে, যত জোরে ইচ্ছে সাজা দাও—টু-শব্দটি করব না।'

মিটিমিটি হাসে। দু চোখের তারা দুদিকে দৃষ্টিটা যদিও মিহিরের দিকে।

এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। দু চোখের তারা দুদিকে চালান করে সুধার এই হাসি অতসীর টানা টানা চোখের থেকেও এর টান জোড়ালো। ঢের ঢের বেশি জোরালো।

চেনা-জানা সব মেয়ের চেয়ে সুধা আলাদা। সুধা অ-সাধারণ।

এক-আধটু খুঁত নাকি মেয়েদের সৌন্দর্য বাড়ায়, কিন্তু মারাত্মক খুঁত—যেমন বোবা কালা, কানা খোঁড়া—যে দেহকে কত সহজে চাঙ্গা করে সুধাকে দিয়েই সেটা মিহির বুঝে গেছে।

সুধার মত মেয়ের সাথে প্রেম করছে বলে বন্ধুরা টিটকারি দেয়। কী আসে যায় তাতে। এমন অঢেল খোরাক কোন বন্ধুর বউয়ের আছে? এমন গোগ্রাস গেলার মত খোরাক?

সুধা কুৎসিত? কিন্তু ডানা কাটা পরী বউয়েও অরুচি ধরে গেছে বলেই না অলক মাঝে মাঝে তেলকল বস্তিতে ঢু' মারে। রাবড়ি সন্দেশে মুখ মেরে যাওয়ায় তেলেভাজা খায়।

তা তেলেভাজায় অরুচি ধরলে মিহিরও না হয় মাঝে মাঝে রাবড়ি সন্দেশ খাবে। নগদ দামে খাবে।

'আসছে।' গোঁত্তা মেরে মিহিরকে সুধা ঠেলে দেয়।

হাঁফাতে হাঁফাতে মিহির 'আঁক!' করে ওঠে। কেননা গোঁত্তাটা বেশ জোরেই মারে সুধা। মিহিরের মত সে তো আর আঁচড়াতে খামচাতে খাবলাতে পারবে না? আর কোনভাবে শোধ নিতে পারবে না? বেহায়া হওয়ারও তো একটা সীমা আছে মেয়ে মানুষের?

চা দিয়ে বয় চলে যাচ্ছিল, মিহির থামায়।

'এবার কাটলেট খাবে? গুড দুটো কবিরাজী। পরে দু কাপ চা।'

কাটলেটের নামে পেট গুলিয়ে উঠলেও খেতে হবে। মিহিরের ইচ্ছে যখন! মিহিরই এখন ভরসা যখন!

চায়ে চুমুক দিয়ে মিহির সিগারেট বের করলে কচি খুকির মত, সুধা আব্দার জানায়, 'আমি ধরিয়ে দেব!'

'মুখ পুড়িয়ে দেওয়ার মতলব?'

'মুখ পুড়লে তো পুরুষের রূপ খোলে।'

'বটে! ক'জনের রূপ খুলিয়েছ?'

'ছ্যাঁকা দিয়ে দেব!'

'ওরে বাবা!'

'তোমাকে ছ্যাঁকা দেওয়াই উচিত। গুন্ডা! খুনে! দ্যাখো— রক্ত বেরোচ্ছে। গালে দাগ বসে গেছে কিনা কে জানে। বিয়ের পর তুমি যে কী করবে—'

'প্রথম রাত্তিরেই—'

'ঈশ! সাত দিন ছুঁতে পর্যন্ত দেব না।'

'সাত দিন! দরজা বন্ধ করার সাত মিনিটের মধ্যেই যদি না কেল্লা ফতে করি—'

'চ্যালেঞ্জ ?'

'চ্যালেঞ্জ !'

'তবে চলো, আজই রেজিস্ট্রি করি। এখান থেকে সোজা ওয়েলিংটন স্কোয়ার—আজই প্রমাণ হয়ে যাক।'

'অ্যাঁ!' চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে দিব্যি খুনসুটি করছিল, সুধার প্রস্তাবে আঁতকে উঠে মিহির বিষম খায়।

ষাট ষাট বলে তার মাথা থাবড়াতে থাবড়াতে সুধা বলে, 'আজ তো রেজিস্ট্রি করার কথাও ছিল বাপু। বারীনবাবু নিশ্চয় আমাদের জন্যে অফিসে ওয়েট করছেন। চলো।'

রেজিস্ট্রি! আগে ভাগে রেজিস্ট্রি!

বারীনকে কী ভাবে ফাঁসাল প্রীতি। দুজনে মিলে চাকরি করে সোনার সংসার গড়ে তুলবে ভড়কি দিয়ে সিক্‌থ্ ইয়ারে রেজিস্ট্রি করে বারীন চাকরি পাওয়া মাত্র সংসার ফেঁদে সেই যে মা হওয়া শুরু করেছে এখনও কামাই নেই।

বারীনের এখন ভিক্ষে চাই না কুকুর সামলাও অবস্থা।

'কী, কথা বলছ না যে ?'

'তোমার চাকরিটা—'

'চাকরি হবে না ? তুমিই না বললে সাত দিনের মধ্যে—'

বলেছে। মিহির কবুল করে। একাধিকবার বলেছে। গলা বাজিয়ে বলেছে। হায়, কে জানত, সেই বলার এমন গ্যাঁড়াকল! নিজের জালে নিজেই ফেঁসে যাবে।

'সাত দিনে না হোক, এক মাস, দুমাস, তিন মাস—ছ মাসেও হবে না ?'

'তা তা তা আর হবে না।' মিহিরের তোতলামি এসে যায়।

'আমার প্রায় পনের ভরির গয়না ছিল, বিয়ের জন্যে বাবা গড়িয়ে রেখে ছিলেন—নিয়ে এসেছি।' ভ্যানিটি ব্যাগটা সুধা মিহিরের কোলে ফেলে দেয়। 'আজই ওগুলো বিক্রি করে দাও। চাকরি হলে না হয় ফের গড়িয়ে নেব।'

'গয়না নিয়ে এসেছ ?'

'বারে, কথা ছিল না আজ রেজিস্ট্রি হবে। তারপর মা বাবাকে গিয়ে প্রণাম করব। তখন যদি ওরা দরজা থেকেই ভাগিয়ে দিতেন ?'

'খুব হিসেবী তো !'

সুধা বাহাদুরের হাসি হাসে। হিসেবী যেন মিহিরই কিছু কম। তবু মিহিরের বেহিসেবী হওয়া সাজে। পুরুষ মানুষ যে। কিন্তু হিসেবী না হলে মেয়েদের ঠকতে হয়। দরকার মত বেহায়া না হলেও। বেহায়ার বেহদ্দ না হলেও।

'তুমি বরং এখান থেকেই বারীনবাবুকে একটা ফোন করে দাও।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু ?' সুধা ক'কিয়ে ওঠে, 'আমার চাকরি হবে তুমি বিশ্বাস করো না !'

'না না—বি-এ পাশ মেয়ের—'

'তাহলে ? তাহলে আপত্তি কিসের ? আমায় বিয়ে করতে ? আমি দেখতে খারাপ বলে সুধা ফুঁপিয়ে ওঠে।

'ছি সুধা— ছি ছি—ওসব কথা—?' সুধাকে সান্ত্বনা দেবে-কি নিজেই মিহির অসহায় বোধ করে। দিশেহারা বোধ করে।

'তাহলে ?' মিহিরের কোলে সুধা হাত রাখে। তাহলে···?

'ব্যাগটা পড়ে গেল।'

পনের ভরির গয়না ভর্তি ব্যাগটা তোলার জন্যে মিহির উবু হলেও ডান হাত সুধা সরায় না, বরং বাঁ হাতে মিহিরকে জড়িয়ে ধরে পিঠে গাল রাখে।

'আজই আজই আজই! আমি আর পারছি না গো ! আমারও তো রক্ত মাংসের শরীর ?

নিজের ওপর অকথ্য ঘেন্নায় মিহিরের পিঠে সুধা প্রাণপণে মুখ ঘষে। মিহিরের পিঠটাকে ঝামা ভেবে ঘষে। নর্দমা ভেবে ঘষে।

কুকুরটা

রাতে একফোঁটা ঘুম হয় নি। তারপর দাঁত না মেজে ডবল ডিমের মামলেট-টোস্ট, কাপ পাঁচেক চা, বিনা স্নানে গাণ্ডেপিণ্ডে রুটি-মাংস সাঁটিয়ে ভরদুপুরে ডালহৌসি থেকে সাঁতরাগাছি হেঁটে আসা।

চটপট স্নান সেরে খালি মেঝেয় চিৎ হয়ে কোমরের লুঙ্গি তুলে ফুল স্পীড ফ্যানের তলায় একঘুমে কোথায় সন্ধ্যে কাবার করে দেবে, তার বদলে কিনা—

কান্না পায়। বীরেনের কান্না পায়। দুহাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কান্না। মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ডাক ছেড়ে কান্না।

কিন্তু সে কাজটা বৌ আগেভাগে শুরু করে দেওয়ায়, বাড়িওয়ালার বৌ আর বোন হরদম উস্কানি দিয়ে দিয়ে কান্নাটাকে অবিরাম করে তোলায় বীরেন বোধ করে বড়ই অসহায়।

সরমার কান্নার অবশ্য যুক্তি আছে। গয়নার বাক্স লোপাট হয়ে গেলে কাঁদবে না?

কিন্তু লোকসানটা শুধুই কি সরমার? বাহ্যত বৌয়ের হলেও স্বামীই তো মালিক গয়নার? ব্যাংকে টাকা রাখার মতোই না বৌয়ের গয়না গড়ানো?

গয়নায় সুদ না মিলেলও বৌ ভাবে থাকে। মাঝে মাঝে গয়নাগাটি পরলে, পরালে বউকে পরস্ত্রী ঠেকে।

বেচতে গেলে যেমন পানমরা বানি বাদ যায়, তেমনি সোনার দামও বাড়ছে হু হু করে। ঐ গয়নাগুলির ভরসাতেই মা মেয়ের জন্য পাত্রের টোপ ফেলছিল। শোকটাকে সুতরাং এমন একচেটে করে দেবার কোনো মানে হয়। কি স্বার্থপর! কি স্বার্থপর!

"পরলে ক্ষয়ে যাবে। এখন? এখন?" মুখ ঝামটা দিয়ে সরমা ফুঁপিয়ে ওঠে। তা দশ গাছা চুড়ি এক জোড়া বালা তিন ছড়া হার চারটি

নাকছাবি আর গোটা সাতেক কানের গয়না পরে থাকলে, চোরকে খালি হাতে ফিরতে হত সন্দেহ নেই।

"এখন হল তো ? খুশি হয়েছ তো ?" চুরিটা যেন বীরেনই করিয়েছে। চোরের সুবিধার জন্য আপিসে কেটে পড়েছে স্ট্রাইকের অজুহাতে।

"সারাটা জীবন আমায়—" চোখের জল আর নাকের সিকনিতে থকথকে বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গুচ্ছের কেঁচো বীরেনের মাথার মধ্যে কিলবিলিয়ে ওঠে।

রমা বলে "আজকাল বাড়িতে গয়না রাখা রিস্কি, আমি তাই এখানে এসেই লকারে—"

বটে ! তুমিইনা লকার থেকে গয়না আনার সময় না-থাকায় সতু চৌধুরীর নাতনীর বিয়েতে যাওয়া বাতিল করে স্বামীর সাথে কুরুক্ষেত্র করেছিলে, কালই আমার গয়না এনে দাও বলে মাঝরাত্তিরে পাড়া জাগিয়ে আবদার করেছিলে।

"দাদা বলছিল থানায় একটা ডাইরি—"

"ডায়েরি করে কোনো লাভ নেই"

"তা ঠিক। তবু নিয়ম যখন"

"কিন্তু থানা তো সেই শিবপুরে।"

"তা অবিশ্যি দাদাও তাই বলেছিল।"

বীরেন ঠাওর করতে পারে না মোদ্দা কথাটা কি দাঁড়াল, কি বলেছে জগদীশ ? ডাইরি করবে, না করবে না।

"জগদীশদা···জগদীশদা কেমন আছে।"

"একটু ভালো।"

"দেখা করে আসি—"

"নেই, এই একটু আগে বেরুল"

"আচ্ছা।" গত দুদিন ধরে যে লোকটা জ্বরে মাথার যন্ত্রণায় ছটফটিয়েছে, কাল সন্ধ্যাবেলা বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল, এই রোদ্দুরে সে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

আহা, জগদীশ তো জানত না দুপুরে বীরেন আচমকা ফিরে আসবে। জানলে কি এমন কাঁচা কাজ করত।

বোকাচো···। আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে বীরেন গালাগাল দেয়। আমি শালা একটা আস্ত বোকাচো···।

বিপ্লবী জগদীশদা স্ট্রাইকার হতে অসুখের অজুহাতে দুদিন আগে থেকে ডুব মারল। আমি বানচোৎ আগের রাতেই অফিসে গিয়ে মজুত থেকেছি।

ওদিকে দালাল বনলাম।

স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট হবে দশ টাকা—আর লোপাট হয়ে গেল হাজার চারেক টাকা।

ঘামে ভেজা পাঞ্জাবি খুলতে গিয়ে চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেলে। মীরা "ওকি বাবা! ওকি বাবা?" করে উঠলে কটমট করে তার দিকে তাকায়, তারপর জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। বাঁকানো রডটা দুহাতে খামচে ধরে হাঁকে "লুঙ্গি দে।"

"ওই তো লুঙ্গি" মীরা জানান দেয় চড়া গলায়।

রমা বলে "আপনার কুকুরটা—"

"কুকুর বলো না জেঠিমা, কুকুর বলো না, ও হল বাবার ছোট ছেলে, আদরের ডাকু, ডাকু সোনা, ডাকু মানিক।"

কী বিষ গলায়, কী আক্রোশ। মা টায়ার্ড হয়ে পড়ায় মেয়ে এগিয়ে এসেছে।

"বাড়ীতে কুকুর থাকতে—"

"আবার কুকুর, হপ্তায় ছদিন মাংস, বেস্পতিবার বন্ধ না থাকলে—"

মাংস নয়, মাংসের ছাঁট, চার আনা···মীরাই এই ব্যবস্থা করে। নইলে বীরেন তো ডালভাতই অভ্যেস করাতে চেয়েছিল।

কিন্তু সে কথা এখন তুলে লাভ নেই, ডাকুকে যেমন মেয়ে ভালোবাসে হিংসেও করে তেমনি ছোটভায়ের মতো। বাপের ভালোবাসা নিয়ে হিংসে। সেই হিংসের আগুনে এখন ভালোবাসা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

"উঠতে বসতে ডাকু, কত সোহাগ কত আদর।"

তা সোহাগ ডাকুকে করে বইকি, আদর করে ছুটির দুপুরে ওকে জড়িয়ে ধরে মাদুরে শোয়, সরমার আড়ালে বিছানাতেও তোলে।

হপ্তায় দুদিন নিজের হাতে স্নান করায়। রোজ ব্রাশ করে পাউডার মাখায়।

ভালোবাসে যে। ভালোবাসার প্রমাণ এগুলি। মীরাকেও ভালোবাসে, কিন্তু তার প্রমাণ দিতে বিশ বছরের মেয়েকে তো আর ছানা-ছানি করা যায় না, জড়িয়ে ধরে শোয়াও যায় না। স্নান করানো পাউডার মাখানোও যায় না।

পাত্র বুঝে ভালোবাসা প্রমাণের রকমফের ঘটে না ?

মীরা তো যখন তখন ডাকুর মাথা বুকে চেপে ধরে পাছায় চড় মারে। চিৎ করে ফেলে পেটে কাতুকুতু দেয়। ভায়ের মতো ভালোবাসা বলে, কিন্তু ভাইটা আঠারো বছরের জোয়ান হলে পারত দিতে ভালোবাসার এমন প্রমাণ ?

"পাহারা দেবে, ওর বাপ-মা নাকি বাঘের বাচ্চা।"

"সত্যি, ডাকু গেল কোথায় ?"

"কে জানে কোন চুলোয় পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে।"

"পাহারা দিচ্ছে ! মানুষ তবু বিয়ে করে, কিন্তু ওরা কক্ষনো না। শুনবে সে লেকচার যদি শুনতে অতসী পিশি।"

লেকচার কিন্তু মেয়েও কম দেয় নি। এর চেয়ে একটা মানুষের বাচ্চা পুষলে উপকার হত বলে সরমার আপসোস। সামাল দিতে বাপের সাথে সুর মিলিয়েছিল মেয়ে।

দেখতে কালো হলেও বুদ্ধি-সুদ্ধি তো কম নয়। ভাই মরে যাওয়ার মাস পর থেকেই মায়ের মানুষের বাচ্চা পোবার সাধ চাড়া দেওয়ার মানে না বোঝার কথা নয়।

আসলে সবাই তো স্বার্থপর। ছেলে মেয়ে বউ, সবচেয়ে বেশি ছেলেটা। নইলে যে ছেলের মুখ চেয়ে বুক বেঁধেছিল, সেই ছেলে কিনা সরকারের বিরুদ্ধে লড়ার নাম করে বাপকে ফাঁসিয়ে গেল। খবরের কাগজে জোর পাবলিসিটি পেল। আগে পিছে হাজার কয়েক লোক নিয়ে, দামী খাটে শুয়ে, আগাপাছতলা ফুল-মুড়ি-দিয়ে শ্মশানে চলে গেল। শ্মশান থেকে চিতায় চড়ে আগুনে পুড়তে পুড়তে স্বর্গে।

শহীদের বাপ বলে ইউনিয়নের পাণ্ডারা তার পিঠ চাপড়ায়, কর্তাদের মুখ হয়ে যায় গোমড়া।

কি গ্যাঁড়াকলেই যে পড়ে গিয়েছিল। ছেলেটা তো নিজে মরেনি, সঙ্গে

সঙ্গে বাপের বুক থেকে আশা ভরসা ছিনিয়ে নিয়েছে। বিশ্বাসের গলা টিপে মেরে রেখে গেছে। বিবেককে খুন করে গেছে।

নিজে শহীদ হয়ে বাপকে দালাল বানিয়েছে।

"মিতা লাকির মাসতুতো ভাই। যাও না বাবা ওকে দিয়ে ভাঙ ট্রাঙ্কের গন্ধ শুঁকিয়ে নিয়ে—"

মরা ছেলের ওপর অকথ্য আক্রোশে বুকে প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসায়, জানলার নিচে ধপ করে বসে পড়েছিল। মেয়ের কথায় চড়াক করে উঠে দাঁড়ায়।

হন হন করে ঘর থেকে বেরোয়। সিঁড়ির তলায়, ঘুঁটে কয়লার মধ্যে মুখ গুঁজে ডাকু পড়ে আছে। বীরেনকে দেখে মাথা তুলে বারেক লেজ নেড়ে আবার মুখ গোঁজে। পেটে কৃমি হয়েছে। পেটটা ওয়াশ করানো দরকার। রববার যোগমায়ার কাছে কুকুর-হাসপাতালে নিয়ে যাবে ঠিক করেছিল।

আচমকা কয়লা ভাঙা হাতুড়িটা তুলে নেয়। হাসপাতালে নিয়ে যাবে! হাসপাতালে। হাসপাতালে।

এক ঘায়েতেই মাথাটা ফুটিফাটা হয়ে যায়। কিন্তু বীরেনের হাত তবু থামে না।

"বাবা!" বলে গলা চিরে ফেলে মীরা। অতসী রমা মীরা হল্লা তোলে। ওপর থেকে রমার তিন ছেলেমেয়ে দুদ্দাড় করে নেমে আসছিল।

"পালা পালা—"

অতসী আর রমা লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙে। কী খুনে মানুষ রে বাবা—কী সর্বনেশে কাণ্ড।

রান্নাঘরে ঢুকে সরমা দড়াম করে দরজা দেয়। ভয় পেয়েছে। ঘিলু আর রক্তে হাত বুক মুখ বীরেনের মাখামাখি। ভয় পাবে না।

"—একি করলে বাবা, একি করলে!"

কিন্তু মেয়েটা ভয় পেল না কেন? থেঁতলানো মাথা ডাকুর ওপর মেয়েটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল কেন? সত্যিই তবে ভালোবাসত? সাচ্চা ভালোবাসা!

যমুনা ঘরে ঢোকা মাত্র সবাই চুপ।

আরতি তাস সাপলে শুরু করে. ইলা ঝুঁকে পড়ে খবরের কাগজে। চিন্ময়ী প্রাণপণে সুপুরি কুঁচোয়, মুকুল টেনে নেয় পানের বাটা। আর তরুবালা করে কি, কিছু করার না পেয়ে ঘুমন্ত ছেলের পাশে শুয়ে পড়ে হাতড়াতে থাকে ব্লাউজের বোতাম।

অবাক যমুনা বলে, ব্যাপার কি ?

রা নেই কারো মুখে।

কিরে ইলা ?

খবরের কাগজের ছবি দেখে ইলা বেহুঁশ।

অ চিনুদি ?

আচমকা তাকিয়ে ফেলেই চিন্ময়ী মুখ নানায়।

বা বাব্বা ! একে একে যমুনা সকলের ওপর চোখ বুলোয়। এ কী নাটুকে কাণ্ড ! বেশ তো জমাট আসর বসেছিল, আমি আসতেই— এই আরতি ! বলে আরতির পাশে সে ধপ করে বসে পড়ে। হাত থেকে আরতির তাস ছিনিয়ে নেয়। কী হয়েছে ভাই ? কেন তোরা—

গম্ভীর ভাবে আরতি বলে. তাস দাও।

আগে তুই—

দেবে কিনা ?

উঁহু। লীলায়িত হাসে যমুনা। যতক্ষণ না তুই—

বেশ। সঙ্গে সঙ্গে আরতি উঠে দাঁড়ায়। চলি তরুদি। কেন যে ঘুম ভাঙিয়ে ইলা আমায় ডেকে আনলি !

চোখ উল্টে ইলা বলে, বাঃ রে ! তরুদি বলল বলেই না—

তরুদিই বা কেন যে—!

মুকুল ফোঁস করে ওঠে, তরুদি তোমায় যেতে বলেছে ? তরুদির ঘর। উনি যদি না—

কী জানি ভাই! আরতি আড় ভাঙে। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, তায় হতকুচ্ছিত! কার ঘরে কে সর্দারি করে—যাকগে, আমি চললুম আর কক্ষনো যেন—

আরতি পিছন ফিরছিল, খপ করে তার আঁচল চেপে ধরে মুকুল আমার তাস দিয়ে যাও ভাই—হঁ!

তাস তো তরুদির ঘরেই রইল।

সে আমি বুঝি না বাপু। তুমি আমার হাত থেকে নিয়েছ, আমার হাতে দেবে, বাস।

তোকে আমি নতুন তাস কিনে দেব।

নতুন তাস কে চায়! এ আমার পয়া তাস। আমার তাস দিয়ে যাও। নইলে কিন্তু, চোখ পাকিয়ে মুকুল বলে, এ নিয়ে আমি কুরুক্ষেত্র করে ছাড়ব—হঁা! তখন কিন্তু আমার কোনো দোষ থাকবে না—হঁা!

ঠিক! ঠিক! সাথে সাথে টিকটিকির মতো সায় দিয়ে ওঠে ইলা, চিন্ময়।

বাঃ! মৃদু হেসে যমুনা বলে, এই তো দিব্যি কথা ফুটেছে এতক্ষণ তবে বোবা হয়ে ছিলে কেন?

বোবা হোক বাচাল হোক—আমার ঘরে হয়েছে!

মানে? যমুনা হকচকিয়ে তরুবালার দিকে ফিরে তাকায়। এ কথার মানে কি তরুদি?

মানে বোঝাবার গরজ দেখায় না তরুবালা।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে যমুনা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে তুমি আমায় অপমান করলে তরুদি! তোমার ঘরে এসেছি বলে—বলতে বলতে হঠাৎ-আবেগে গলা তার বুজে যায়।

ভ্রূক্ষেপ নেই কারো। ইলা ফের বেহুঁশ খবরের কাগজে। চিন্ময় সুপুরি কুঁচোয় প্রাণপণে। মুকুল একটার পর একটা পান চিরে চলে। তরুবালা ঘুমন্ত ছেলের মুখে মাই গুঁজে ধরে। এবং মুকুল আঁচল ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও স্থির হয়ে আরতি দাঁড়িয়ে থাকে। তীব্র চোখে যমুনার দিকে চেয়ে।

আরতি! ধরা-গলায় যমুনা সুধায়, আমি কী এমন দোষ করেছি ভাই যে তরুদি আমায়—

চিবিয়ে চিবিয়ে আরতি বলে, হিংসেয় লো হিংসেয় !

হিংসে ?

হবে না ? হিংসে হয়, ভয় হয়।

আমাকে ?

তবে ! শুধু তরুদি কেন, আমারও হয় : আমাদের সব্বার হয়। মুকুলের হয়, ইলুর হয়, চিনুদির হয়। তাই না চিনুদি ? এনাকে দেখে তোমার—

হয় না আবার ! সংগে সংগে চিন্ময়ী মুখিয়ে ওঠে, ছাটাইয়ের ভয়ে যে-মানুষ পাগলপারা হয়ে আছে, সে কিনা রাস্তায় ওর পিছু নেয়। বিচ্ছিরি ভাবে তাকায়। বাসে একদিন—

এই কথা ! যমুনার দুই চোখে এবার হাসির ঝিলিক দেয় আমি ভাবলুম কী না কী। আশ্চর্য ! ইলুটা ঠাট্টাও বোঝে না।

ঠাট্টা ! ইলা ফেটে পড়ে, যখন-তখন উনি তোমার ঘরে উঁকি-ঝুঁকি মারেন—এর নাম ঠাট্টা ?

খিলখিল করে হেসে ওঠে যমুনা, তুই একটা আস্ত আহাম্মক মুকুল। ইলুকে তুই ওকথা বলতে গেলি কী বলে ?

কী করব বলো ! নিরুত্তেজ গলায় মুকুল বলে, দেখলুম, আমার কপাল তো ভেঙেইছে—যার সোয়ামী হ্যাংলার মতো পরের বউয়ের পেছনে ঘুরঘুর করে তার কপাল ভাঙার আর বাকি কী ! ভাবলুম ইলুটাকে অন্তত সময় থাকতে সাবধান করে দি।

সে কীরে মুকুল ! সরোজবাবু আবার কার পেছনে—

ন্যাকামি করিস নি যমুনা, ন্যাকামি করিস নি ! তড়বড় করে তরুবালা উঠে বসে। ওকথা আমাকে তুই বলিস নি ? বলিস নি যে সরোজ ঠাকুরপো—

উনি ঠাট্টা করেছেন গো তরুদি ! চিন্ময়ী ফুট কাটে। তোমরা ঠাট্টাও বোঝ না !

ঠাট্টা ! কুৎসিত মুখখানাকে কুৎসিততম করে আরতি বলে, বটঠাকুরের নামে বলে কিনা—অমন শিবতুল্য মানুষ—তিনি নাকি কোল থেকে খোকাকে সেদিন নিতে গিয়ে—এর নামও ঠাট্টা !

ছি ছি ছি !

সবাই ছি ছি করে ওঠে—ইলা, মুকুল, চিন্ময়ী, আরতি, তরুবালা। চোখ দিয়ে সকলের আগুন ঠিকরোয়।

গলা চিরে সবাই নালিশ জানায়, হতে পারে যমুনা ভীষণ রূপসী, ডানাকাটা পরী। কলেজে-পড়া, নাচগান-জানা। তাই বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করবে ?

ইলার স্বামী জগদীশ, মুকুলের স্বামী সরোজ, চিন্ময়ীর স্বামী রমেশ, আরতির স্বামী যতীন আর তরুবালার স্বামী পটল দত্তর নামে যা-তা বলবে ? এত বড় সাহস ! আস্পর্ধা।

রূপের দেমাক। শরীরে মোচড় দিয়ে ওঠে আরতি। রূপসীর ঠাট্টা !

মানুষটা মা বলে ডাকে, আর বলে কিনা—পারে তো থুক করে এক দলা থুতু ছিটোয় তরুবালা। যমুনার চোখে-মুখে।

ঠাট্টা ! ইচ্ছে করে অমন ঠাট্টার—! ইচ্ছেটার হদিস না পেয়ে খবরের কাগজটাকে দুমড়ে দুমড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে ইলা।

এ কি তোর-আমার ঠাট্টা রে ইলু। মুখ ভেঙিয়ে চিন্ময়ী বলে, এ হল গিয়ে রূপসোহাগীর ঠাট্টা ! সব শাড়িই যাকে দারুণ মানায় আবার উদোম ন্যাংটো থাকলেও যাকে—

বাপকে নিয়ে ঠাট্টাও যাকে দারুণ মানায় ! মানাবে না—রূপসী যে। পানের বাটা উল্টে দিয়ে নাচের ঢঙে হাত নেড়ে ওঠে মুকুল।

দুই কান যমুনার ঝাঁ-ঝাঁ করে, তবু সে বজায় রাখে হাসি মুখ ঃ কথাগুলি যেন তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে না, শোনানো হচ্ছে শুধু। কিন্তু নিছক শ্রোতা হলেও মেয়েমানুষের মুখে মেয়েমানুষের নামে এসব কথা শুনলে কান মেয়েমানুষের করবে না ঝাঁ-ঝাঁ ?

চেঁচামেচির চোটে ঘুম ভেঙে ছেলেটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করছিল, 'চুপ কর হারামজাদা !' বলে তরুবালা ঠাস করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দেয়।

বাঁ গালটা যমুনার জ্বলেপুড়ে যায়।

ইলা বলে, রমেশবাবুর কথা শুনে আমি অত ইয়ে করি নি, কিন্তু যেদিন বলল পটলদা—

তাই ! মুকুল বলে, জগদীশবাবুর কথা শুনে ভাবলুম, জামাইবাবু

বলে ডাকে, ইয়ার্কি-ফাজলেমি করে—নিশ্চয় কানকে ধান শুনেছে। কিন্তু ওমা! সেদিন বলে কি—

চিন্ময়ী বলে, আমার কিন্তু প্রথমেই খটকা লেগেছিল।

আরতি বলে, আমি কখনও পাত্তা দিইনি। তিনদিনের ভাড়াটে—এ বাড়ির কর্তাদের আমার চেয়ে ও বেশি চিনবে? নেহাত ইলা কথাটা আজ তুলল বলেই—

পাত্তা দেয় কে? আমি দিয়েছি? সংসারে আর কাজ নেই—বসে বসে পরের সোয়ামীর কেচ্ছা! অবিশ্যি দিনরাত পটের বিবিটি হয়ে থাকতে পারলে—

যা বলেছ তরুদি। ওই যে বলে না—

তাজ্জব হয়ে যায় যমুনা। তবে কি সে এতদিন যা দেখেছে, শুনেছে, জেনেছে—স-ব মিথ্যে? 'রমেশবাবুর কথা শুনে আমি অত ইয়ে করিনি।'—তাই নাকি ইলারানী? তবে 'মানুষটা ভারি হ্যাংলা, দেখিস না আমি দাদা বলে ডাকি তবু আমার সাথে কেমন—' বলতে বলতে কার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল রে?

'নিশ্চয় কানকে ধান শুনেছে।'—বটে? কিন্তু 'এ আর আশ্চর্য কি! যেমন দেবী তেমনি দেবা হবে তো।' ঐ কথা কে বলেছিল ভাই মুকুল?

তোমার প্রথমেই খটকা লেগেছিল, না চিনুদি? আরতি, পাত্তাই দিস নি তুই? তা ঠিকই তো—সংসারের কাজকর্ম ফেলে বসে বসে পরের সোয়ামীর কেচ্ছা কে করে!—ঠিকই বলেছ তরুদি। কিন্তু 'বউটা বছর-বিয়োনী হলে পটলবাবু করে কি! বুড়ো বয়েস হলেও'—এই বলে ফিক করে কে হেসে ফেলেছিল চিনুদি? 'যা বলেছিস ভাই।' বলে কে সায় দিয়েছিল আরতি? যতীনবাবু ঘরে খিল দিয়ে মদ খায়, শালীর সাথে জগদীশবাবুর ইয়ে আছে, নাইট ডিউটির অছিলায় সরোজ বাইরে রাত কাটায়, মোটা রমেশ মেয়েমানুষ দেখলেই ছোঁক-ছোঁক করে—এ বাড়িতে আসার সাত দিনের মধ্যে এসব আমি কার কাছ থেকে জেনেছিলুম তরুদি?

নানানবয়েসী সখিদের মুখগুলি ফের যাচাই করে যমুনা। বেকসুর বেকুব বনে গিয়ে।

তরুবালা বলে আসুন আগে, আজই যদি না এর হেস্তনেস্ত করি—!

চিন্ময়ী বলে, আমি কিন্তু ওকে কিছু বলতে পারব না—যা গোঁয়ার—শুনেই হয়তো জুতো হাতে করে তেড়ে যাবে!

ইলা বলে, তোমায় কিছু বলতে হবে না চিনুদি। রমেশদাকে যা বলার আমি বলব।

আরতি বলে, আলাদা আলাদাভাবে বলার কী দরকার। সবাইকে জড়ো করে—

মুকুল বলে, সেই সঙ্গে বলাইবাবুকেও ডাকাতে হবে। পষ্ট জানিয়ে দিতে হবে—তিনি এক ভাড়াটে চান, না পাঁচ ভাড়াটে চান। যদি আমাদের চান—

যমুনা উঠে দাঁড়ায়। শান্ত গলায় বলে, সালিশ করতে চাও, বেশ. ভালো কথা। খুব ভালো কথা। কিন্তু, মুখ টিপে হাসে যমুনা, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে শেষে সাপ বেরিয়ে পড়লে আমায় দুষো না?

মুখ নেড়ে ফের কথা!

ভালো ভেবেই বলছি। সালিশ নিশ্চয় দু-পক্ষের কথা শুনবে। আর তখন—রহস্যময় হেসে নাটকীয় ভাবে যমুনা বেরিয়ে যায়।

রহস্যময় এই হাসিতেই কাজ হয়েছিল শাঁখারিটোলায়। ঘাবড়ে গিয়েছিল বউ দুটি।

ঘাবড়ানো স্বাভাবিক—কোন কথায় কী উঠে পড়ে—বলা যায়? এসব কথার মজাই এই—প্রাণভরে যদি শুনতে চাও, তোমাকেও কিছু শোনাতে হবে। পরের স্বামীর কেচ্ছা শুনতে কোন মেয়ে না চায়? এবং সেই শোনার তাগিদে আবার কেই বা কম-বেশি না তালহারা হয়ে যায়?

বউ দুটি অকথ্য আক্রোশে ফুঁসছে। যথারীতি তার জের পোয়াতে হয়েছে গোবেচারা স্বামী দুটোকে।

শিবপুরে রহস্যময় হাসির দরকার হয় নি, শালখের বাসাটা আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল বলে।

শালখেয় অবশ্য রহস্যময় হাসিতেও কাজ হয় নি, স্বামীকে টানতে টানতে এনে হাজির করেছিল জ্যোৎস্না।

কী, তুমি নাকি রূপসীর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাক? হাসছ যে বড়—জবাব দাও।

অমায়িক হেসে সাধন বলেছিল, এমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপের থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকা যায় ? শুনেছি আমার মা-ও নাকি—

থতমত খেয়ে গিয়েছিল জ্যোৎস্না।

সাধন দেব বলেছিল, আহা ! পায়ের পাতা দুটি অবধি কী সুন্দর ! দেখলেই হাত দিয়ে ছুঁতে সাধ যায় !

কিন্তু ও কি ভেবেছে জানো ?

থতমত খেয়েও জ্যোৎস্না উসকে উঠেছিল, সাধনের সরল স্বীকারোক্তিতে, একেবারে দমে যায়, ভাবা কিছু অন্যায় নয়। উনি কি করে বুঝবেন যে ওঁকে দেখলে আমার মরা মায়ের কথা কেবলি মনে পড়ে যায় !

জ্যোৎস্না দমে গেলেও, তার দমে যাওয়ায় অস্বস্তিকর একটা অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেলেও—মনে মনে ভয়ানক চটে গিয়েছিল যমুনা। অমন তাগড়াই জোয়ান মানুষটা এমন ন্যাকা স্বরে কথা কয় ! এমন ন্যাকামিকে লাই দেয় !

ধরো, সত্যি সত্যিই সাধন যদি যখন-তখন তার দিকে চেয়ে থাকত— অন্যায় হত কি ? সেজন্যে মরা মাকে টেনে আনার কী দরকার ?

মায়ের কথা মনে পড়ে ! ধরো, জ্যোৎস্নার বদলে যদি সাধনের সাথে বিয়ে হত যমুনার ? তেমন যোগাযোগ ঘটলে হওয়া তো কিছু অসম্ভব ছিল না ? তাহলে ?

যাকে দেখে এখন মায়ের কথা মনে পড়ে, তাকেই কি তখন নিজের ছেলেমেয়ের মা বানিয়ে ছাড়ত না ?

সাধনের ওপর গায়ের জ্বালাতে সাধনের মরা মায়ের ভেক ধরে থাকার অকথ্য অস্বস্তির হাত এড়াতেই শালখের বাসা ছাড়তে হয়েছিল। নইলে নিজের ছোট মনের জন্যে হাতে ধরে জ্যোৎস্না কম অনুতাপ করেনি। পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে পর্যন্ত গিয়েছিল।

কিন্তু ব্যাটাছেলেরা যদি নেকার বেহদ্দ হয়, মেয়েরা তবে অবুঝের একশেষ। তা না হলে সামান্য ব্যাপারে অমন কাণ্ড করে বসে বেলেঘাটার ইন্দুমতী ? পনেরো থেকে ছাব্বিশ বছর অবধি একের পর এক পাত্রের কাছে হাজির দিয়ে যার বাহাত্তুরে এক বুড়ো জুটেছে—সেও বোঝে না রূপের দাম ?

ইন্দু কেন—কোনো মেয়েই বোঝে না। বোঝে না যে, বিয়ে ব্যাপারটা নিতান্তই এক যোগাযোগের ব্যাপার। একটা আকস্মিক ঘটনা দুর্ঘটনা।

সেই দুর্ঘটনার ফলে অনায়াসে রমেশ কি সরোজ, যতীন বা জগদীশ—এমন কি পটল দত্তর সঙ্গেও যমুনার বিয়ে হয়ে যেতে পারত।

মেয়ে-দেখার দোকানে পাশাপাশি চিন্ময়ী, মুকুল, আরতি, ইলা, তরুবালা আর যমুনাকে সাজিয়ে রাখলে--কাকে বেছে নিত রমেশ, সরোজ, যতীন, জগদীশ বা পটল দত্ত ?

তরুদি, কেন তোমরা বোঝ না যে সোয়ামী নিয়ে আদিখ্যেতা করাটা বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছুই নয় ? সোয়ামীর ভালবাসা ? কোনোদিন ভেবে দেখেছ কি আরতি—কী করে জন্ম হল এই ভালোবাসার ? যে-সোয়ামী আজ তোমায় নিয়ে মত্ত—সে কি যমুনার সোয়ামী হতে পারত না মুকুল ? আর তখন—শুধু হাঁ করে চেয়ে থাকা নয়, সব সময় ছোঁক-ছোঁক করা নয় রাস্তায় পিছু নেওয়া নেয়, কোল থেকে ছেলে নেওয়ার ছলে গায়ে হাত দেওয়াও নয়—সকলের চোখের সামনে যমুনাকে টেনে নিয়ে দড়াম করে বন্ধ করে দিতে পারত ঘরের দরজা। দিতও।

কেন তোমরা এত অবুঝ তরুদি ! আয়নায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে যমুনা : বিয়ের বাহাদুরি বোঝ না !

তাই বলো ! মুখের কাছে তুলেও চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে গুরুদাস। তাই দত্তমশাই বলছিলেন আমার সাথে কি কথা আছে।

ওই বুড়োই তো সবচেয়ে বজ্জাত। সেদিন করেছে কি -

খোকাকে নেবার ছলে—

মানে ! থমকে যায় যমুনা। তার পরেই চাপা চিৎকার করে ওঠে। আমার কথা তুমি বিশ্বাস কর না ?

সর্বনাশ ! সঙ্গে সঙ্গে গুরুদাস ভুল বুঝতে পারে। জেনেশুনে সাপের লেজে পা দিয়ে বসল ! তাড়াতাড়ি সে মুখে গোটা তিনেক লুচি পুরে দেয়।

তুমি কি ভাবো আমি বানিয়ে বানিয়ে—?

চায়ে চুমুক দিয়ে বিষম খায় গুরুদাস। তবু ঘন ঘন মাথা নাড়ে—

না না—এমন কথা সে ভুলেও ভাবে না। পাগল! এমন কথা ভাবা যায়!

মাথা নাড়া চালিয়ে যায় গুরুদাস: আগে ভাবত বটে, এখন আর ভাবে না। ভাবে না ডাক্তার সেনের কথা শোনার পর থেকে।

নিশ্চয় তুমি ভাবো আমি বানিয়ে বানিয়ে বলি! গলা থরথর করে যমুনার। পরের নামে আমি মিছে কথা বলি! আমি—

গুরুদাস বলবে নাকি সেনের কথাটা?—না, এতে কোন দোষ নেই যমুনার। এর ওপর তার কোনই হাত নেই। শিশুরা সত্যি ভেবে যেমন অনর্গল মিছে বলে যায়, কোনো কোনো বয়স্ক মানুষও তেমনি—

তুমি তো আমার সম্পর্কে অমন ভাববেই। ভাববে না! গলা যমুনার ভেঙে যায়। যে-সে আমায় অপমান করবে, সেকথা মুখ ফুটে বলতে পারব না। দুই চোখ যমুনার জলে ভরে আসে। দুপুরবেলা দল বেঁধে সবাই ঘরে এসে যেভাবে আমায় অপমান করে গেল—

যমুনা ফুঁপিয়ে ওঠে। অপমানিত হওয়ার সময় যে হাসি মুখ বজায় রেখেছে, ঘরে ফিরে এসেও অবুঝ তরুদের কথা ভেবে যে মনে মনে হেসেছে—অপমানের কথা বলতে গিয়ে কান্না এখন তার উথলে ওঠে। বালিশ আঁকড়ে সে উবুড় হয়ে পড়ে।

সেরেছে! জলখাবারের প্লেট সরিয়ে রাখে গুরুদাস। টিউশনি আজ মাথায় উঠল!

আপস না করে উপায় নেই। নইলে শুধু টিউশনি বরবাদ হবে না, রাতের খাওয়াও বাতিল। ঘুমের দফা গয়া। কালও অফিস কামাই।

এবং নতুন বাড়ি না মেলা অবধি উদয়াস্ত টহল দিতে হবে তামাম কলকাতা।

শ্যামপুকুরে গোঁ দেখাতে গিয়েই জন্মের মতো তার আক্কেল হয়ে গেছে।

গুরুদাস বিছানায় এসে বসে। বসে স্ত্রীর মাথায় হাত রাখে। স্ত্রীর বাহারী খোঁপায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, পাগলি! এমন বোকা! জানো না পুরুষদের পতঙ্গ বলে? এমন আগুনের মতো রূপ হলে—

যমুনা দ্বিগুণ তেজে ফুঁপিয়ে ওঠে।

ওদের আর দোষ কী আমারই বলে একেক সময়—বলে কেতামাফিক স্ত্রীকে সোহাগ জানাতে যায় গুরুদাস—ছিটকে সরে যায় যমুনা।

যত সব বজ্জাত মাগী। এদের সাথে আমায় থাকতে হবে? একেকটার কথা শুনলে—

তাড়াতাড়ি দরজার দিকে তাকায় গুরুদাস। বন্ধ যদিও কিন্তু এমন সুরে কথা বললে কি কল ঘর থেকেও শোনা যাবে না?

হঠাৎ যদি দল বেঁধে সবাই ঢুকে পড়ে? 'কিছু মনে করবেন না—ও'র মাথায় একটু ছিট আছে। আপনাদের কাছে আমি মাপ চাইছি। এ মাসেই আমি উঠে যাচ্ছি।' এতগুলি কথা বলার সুযোগ পাবে কি? মুখ কাঁচুমাচু করে? এবং যমুনার কান বাঁচিয়ে?

নইলে যমুনা যদি সেকথা শোনে, বাড়ি তো ছাড়তেই হবে—ও-ও না তার পরে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়।

অবশ্য বদ্ধ উন্মাদ হওয়া এর চেয়ে ঢের ভালো। ঢের ঢের ভালো। তাহলে আর যাই হোক এমন লুকোচুরি করে চলতে হবে না। চব্বিশ ঘণ্টা চোর বনে থাকতে হবে না। চাই-কি, গলায় ফাঁস লটকে ঝুলে পড়াও চলবে: অমন রূপসী বউ পাগল হয়ে গেলে জীবনে বিতৃষ্ণা আসতে পারে না মানুষের?

কিন্তু এমন বউকে ছেড়ে মরার কথা কি কল্পনাও করা যায়? তাহলে আজ যাবা তার স্ত্রীভাগ্যে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরে কালই যে তারা তার স্ত্রীর নামে যা-তা রটাবে. সবজান্তা সেজে তার জন্যেও সহানুভূতি বিশেষ। এমন সাজানো সংসার, সুখের সংসার -

কালই আমি শ্রীরামপুর চলে যাবো। হঠাৎ উঠে বসে যমুনা।

তাই ভালো!

তাই ভালো! চিবিয়ে চিবিয়ে যমুনা বলে, আমার হাত থেকে রেহাই পেলেই তুমি বাঁচো, না? উঁহু, আমি যাব না—কক্ষনো না! কক্ষনো না!

রেহাই পাবার কথা ভাবছ কেন যমুনা। আমি বলছিলুম কি—

কী বলছ তুমি? তুমি আবার কী বলবে?

একসাথে দু-দুটো প্রশ্নের থাপ্পড় খেয়েও সহজ সুরে গুরুদাস বলে,

বলছিলুম কি—সুবিধে মত একটা বাসা না পাওয়া পর্যন্ত কদিন না হয় শ্রীরামপুরে গিয়ে থাকো। মনমতো বাসা পাওয়া তো চাট্টিখানি নয়। তিরিশ টাকার বাড়ি ভাড়া আজ পঁচাশিতে এসে ঠেকেছে—এর বেশি—

টাকার খোঁটা দিচ্ছ ?

খোঁটা দিচ্ছি না হিসেবটা বোঝাচ্ছি—মাইনে আর মাস্টারিতে পাই মোট আড়াই শো। এর থেকে যদি বাড়ি ভাড়াতেই—

বেশ। বাড়ি ভাড়ার টাকা এখন থেকে আমি দেব।

চাকরি করবে ?

পারি না ভেবেছ ? টান-টান হয়ে বসে যমুনা। বুক উঁচিয়ে। স্বামীর মুখোমুখি তাকায়। ভাবো কি আমায় তুমি ? অপদার্থ ? আই.এ. পাশ করেছি রূপ দেখিয়ে ? নাচগান শিখেছি রূপের জোরে ? রূপ ছাড়া কোন যোগ্যতা নেই আমার ? বিয়ের আগে প্রতিটি সার্টিফিকেট যাচাই করে দেখ নি ? মনে নেই ?

গুরুদাসের ভয় হয়, 'না' বললে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বউটা। দুই মুঠিতে তার চুলের গোছা আঁকড়ে ধরবে। 'ওরে মিথ্যেবাদী ? এত বড় মিথ্যুক ধাপ্পাবাজ তুমি ! বলে ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠবে।

ঘুমের ঘোরে, মাঝে মাঝে যেমন করে ওঠে।

চটুল হেসে গুরুদাস বলে তুমি চাকরি করলে অপিস-পাড়া অবিশ্যি বর্তে যাবে। কিন্তু আমার দশা কি হবে ভেবে দেখেছ ? দুর্দশার একশেষ। অপিস থেকে ফেরা মাত্র তোমায় দেখতে পাব না, তোমার হাতের চা পাব না, কোনোদিন যদি অপিসে মন না টেকে, হুট করে চলে আসতে পারব না। তারপর ধরো—

বলতে বলতে থমকে যায় গুরুদাস : মুখখানা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে যমুনার, জল-ধোয়া দুই চোখের মণি ঝকঝক করে জ্বলছে, দপদপ করছে নাকের বাঁশি, জুড়ে এসেছে ভুরু, কুঁচকে যাচ্ছে ঠোঁট।

থামলে কেন ? তারপর ? তারপর কি ? যমুনা হিসিয়ে ওঠে।

তারপর ? না, আর তারপর নেই। তারপরে আর কিছু নেই। গুরুদাস চোখ ফেরায়। ও চোখের দিকে চেয়ে থাকা অসম্ভব। বিছানা

থেকে নেমে যায়। ও চোখের কাছাকাছি থাকা অসম্ভব। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় গুরুদাস।

জানালার দুই রড ধরে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

মিনিটের পর মিনিট কাটে। গুটিগুটি পায়ে বিকেলের আলো-ঘর থেকে সরে পড়ে। অদৃশ্য অন্ধকার সুযোগ পেয়ে এগিয়ে আসে। বাইরে তরুবালার ছেলে কাঁদে। চিন্ময়ীর মেয়ে গলা সাধে। ইলার রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক আওয়াজ ওঠে কলঘরে মুকুল কাপড় আছড়ায়। স্বামীর সাথে গলা ছেড়ে আরতি হাসাহাসি করে।

কিন্তু এ সবই বাইরের ব্যাপার। এঘরে তখনও স্থির হয়ে আছে দুটি ছায়াশরীর—একটি জানালায়, একটি বিছানায়।

দুজনেই চুপ। স্বামী এবং স্ত্রী। বড় জটিল এক ধাঁধাঁয় দিশেহারা দুজনেই।

প্রথম স্তব্ধতা ভাঙে স্বামী!

আস্তে আস্তে বলে, তুমি আমায় ডাইভোর্স কর যমুনা।

বটে!

হ্যাঁ, যমুনা। এখন তো আইনই হয়েছে। আমার জন্যে কেন তুমি অনর্থক—

হা হা করে হেসে ওঠে যমুনা। চকিতে ফিরে তাকায় গুরুদাস। ছুটে আসে।

যমুনা!

আর যমুনা! যমুনা হাসে প্রাণ খুলে, মনের সাধে। হাসতে হাসতে যমুনা লুটোপুটি যায়। হাসির দমকে যমুনার খোঁপা খুলে যায়, শাড়ি লুটোয়। শরীরে যমুনার নাচের দোলা জাগে। যমুনা! স্ত্রীর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দেয় গুরুদাস। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? যমুনা! স্ত্রীকে গুরুদাস জড়িয়ে ধরে।

পাগল হই নি গো, পাগল হই নি। স্বামীর বুকে নিজেকে সঁপে দিয়ে আরেক প্রস্ত হেসে ওঠে বউ। স্বামীর গালে ঠোনা দিয়ে বলে, মাগো! এমন ঠাট্টাও তুমি করতে পার!

ঠাট্টা আমি করি নি, যমুনা!

না করে নি! হিঁদুর মেয়ে আমি, হিঁদুর বউ আমি—নারায়ণ সাক্ষী করে আমাদের—

না, যমুনা ঠাট্টা আমি সত্যিই করি নি।

অ্যাঁ! যমুনা এবার আঁতকে ওঠে। হঠাৎ যেন ভূত দেখেছে—আচমকা স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে। ওগো, না না না! লোকলজ্জা, সমাজ-সংসার—

এই, ছাড়ো ছাড়ো—

আগে বলো, তুমি ঠাট্টা করেছ। আগে বলো—

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! যমুনা—ছাড়ো—আমায় ছেড়ে দাও—

আগে তুমি বলো—আগে বলো যে আমার সাথে তুমি ঠাট্টা করেছ। ভয়ংকর ঠাট্টা করেছ। এমন ভীষণ ঠাট্টা যে—

দুই মৃণাল ভুজকে সাঁড়াশি করে স্বামীর গলা পেঁচিয়ে ধরে যমুনা, দম বন্ধ হয়ে মরে যায় যাক—কিন্তু স্বামীর মুখ থেকে আজ এই স্বীকৃতিটুকু সে আদায় করে ছাড়বেই।

তোর বৌ এখনো এলো না রে!'

'তাই ত!' আদিত্য সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। দু' পা গিয়েই ফিরে আসে। 'বুঝেছি!'

অমিত অবুঝের মত চেয়ে থাকে।

'লজ্জা পাচ্ছে, বুঝলি না!'

'লজ্জা? আমার সামনে—'

'সকলের সামনেই।' আদিত্যও খানিক লজ্জা পায়। 'অ্যাডভান্সড্ স্টেজ—বুঝলি না।' ফিক করে হাসির পিক ফেলে।

মাথাটা অমিতের দপ করে ওঠে। আচমকা এক চড় হাঁকিয়ে আদিত্যের হাসি ছরকুটে দেবার জোরালো সাধ চাড়া দিয়ে ওঠে।

প্রাণের বন্ধু আদিত্য।

তবু আদিত্য সম্পর্কে এ-ধরণের সাধ অমিতের এই প্রথম না।

কেমেস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বকুল হাই সেকেণ্ড ক্লাস। বিয়ের পর একসাথে রিসার্চ করবে, ডক্টরেট হবে, ফরেনে যাবে, ফিরে এসে লেবরেটরী বানাবে, দেশের জন্যে দশের জন্যে—

কত প্ল্যানই এঁটেছিল! তাক-লাগানো কত প্ল্যান!

আর এখন?

প্রফেসর আদিত্য এখন রিসার্চ চালাচ্ছে বৌকে বছর-বছর মা-বানানোর!

একদা প্রফেসর বকুলমালা এখন ব্রেশিয়ার পরারও ফুরসৎ পায় না!

রাস্কেল! বাপ-ঠাকুর্দার জীবনই যদি কাটাবি, কি দরকার ছিল বকুল বাগচিকে বিয়ে করার? ব্রিলিয়াণ্ট একটা মেয়ের কেরিয়ার বরবাদ করে দেওয়ার?

শুধু কেরিয়ার? একটা বিইয়েই হাড়-গিলে হয়ে পড়ে। এটা পাঁচ নম্বর। সাত বছরে পাঁচ নম্বর।

এখনকার হাল নিশ্চয় অকথ্যের একশেষ! লোকের সামনে বেরোতে বকুলের সাথেই লজ্জা!

॥ খ ॥

'বলিস কি অমিত'

বসন্ত প্রায়-ঘাবড়ে গেছে! স্বাভাবিক। 'আমার কিন্তু এখনও—' বিশ্বাস হচ্ছে না! স্বাভাবিক স্বাভাবিক! অমিতকে যে জানে হুট করে বিশ্বাস করা তার পক্ষে শক্ত বৈকি।

'তুই শেষ পর্যন্ত—'

সোমনাথ মেয়ে দেখলেই ছোঁক-ছোঁক করে। ভুপাল প্রেমের নামেই বিয়ের জন্যে কোমর বাঁধে। অমিত সোমনাথ নয়। অমিত ভুপাল নয়। অথচ পরিমল তাকে—

'প্রেমে পড়লি!'

সোমনাথ-ভুপালের শামিল বানিয়ে দিয়েছে!—

'বিয়ে করছিস!'

কথাটা তার শোনামাত্র 'আমি জানতাম! আমি জানতাম!' বলে খুশির তোড়ে দিশা হারিয়ে বাসের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সীন করেছে!

'সত্যিই তুই—'

'বাঃ!' অমিত মানানসই হাসছিল, গম্ভীর হয়ে যায়। 'প্রেমে পড়েছি, বিয়ে করব না!' বুক চিতিয়ে বসে। 'আমি অনাদি নই, ঢাক পিটিয়ে প্রেম করি না। অময় নয়—একটা বৌয়ের জন্যে ডজন-ডজন মেয়ে বাছি না।' সিগারেটে চড়চড় টান দেয়। 'কিন্তু—'

'তা বটে! তা বটে!' বসন্ত চটপট মাথা নাড়ে। 'তোর সঙ্গে কার তুলনা! আমাদের ব্যাচের মধ্যে তোর মত—'বন্ধুরা অনর্গল তারিফ করে। আধুনিক কবি হিসেবে নামডাক আছে। চমৎকার বলিয়ে-কইয়ে। খাশা চেহারা। পাকা চাকরি। মাথার ওপরে ভাই, পেন্সনওলা বাবা অমিতের সঙ্গে কার তুলনা!

'আমাদের মধ্যে সবার আগে তোরই তো প্রেমে পড়ার এক্তিয়ার ছিল রে! প্রেম করে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার। তোর মত সৌভাগ্য—'

কথাটা বসন্ত শেষ না করে ভোঁস করে শ্বাস ফেলে।

বন্ধুর সৌভাগ্যে মুখখানা বন্ধুর যার-পর-নাই করুণ-কাতর হয়ে ওঠে।

বেচারা বসন্ত!

মীরাকে বিয়ে করলে ওর বাপ-মা কি পরিমাণ কষ্ট পেত, অমিত জানে না। কিন্তু, শাস্ত্রমতে বিয়ে-করা অগ্নিসাক্ষী ওর বৌটা যে শ্বশুর-শাশুড়িকে দিনরাত চোখের জলে নাকের জলে করাচ্ছে।

পাড়াশুদ্ধ সবাই জানে।

কাপুরুষ বসন্ত! কাপুরুষ বসন্তর জন্যে বুকটা অমিতের টনটন করে।

॥ গ ॥

গলা নামিয়ে, যদিও ঘরে কেউ নেই, হীরেন শুধায়, 'মেয়েটি কে রে? আমি চিনি?'

অমিত হাসে দেখন-হাসি। যে-হাসির মানে হ্যাঁ-না দুই-ই হয়।

'চাকরি-বাকরি?'

চাকরে মেয়ে ছাড়া অমিত রায় প্রেম করতে পারে না? বিয়ে করার মত প্রেম?

'এক জাত?'

প্রেমে জাত বিচার? খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেই আজকাল আকছার ইণ্টারকাস্ট চলছে না?

'বাড়িতে আপত্তি উঠবে না?'

'উঠবে না? প্রেমের বিয়েতে আপত্তি উঠবে না!'

'দু' পক্ষেই?'

'ভীষণ!' অমিত মুখ খোলে। ভীষণের ভীষণতা বোঝাবার জন্যে টেনে টেনে শব্দটা উচ্চারণ করে। যথোচিত মাথা দোলায়।

যদিও জানে—ঘাড়ের বোঝা নেমে যাওয়ার দরুণ লাবণ্যর মাসি বর্তে যাবে এবং নিজে পছন্দ করে বৌ আনতে পারল না বলে মা অভিমান করলেও বিয়েতে কানাকড়ি মিলল না দেখে বাবা গুম হয়ে গেলেও, বৌদি সবদিক ম্যানেজ করে নেবে।

রূপে-গুণে লাবণ্য তার থেকে অনেক নীরেস বলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ম্যানেজ করে নেবে।

আহ্লাদে আটখানা হবে দাদাও। আর সব দিকে দিলেও বৌয়ের ব্যাপারে ভাই তার ওপর টেক্কা দিতে পারল না বলে হবে।

সবই অমিত জানে।

কিন্তু দু'পক্ষেই আপত্তি না উঠলে মান থাকে প্রেমের বিয়ের ?

বিয়ের পরেই বৌ নিয়ে বোম্বাই পাড়ি দেওয়ার কারণ থাকে ?

'কি করবি তা হলে ?' বসন্ত ভয়ে ভয়ে শুধায়।

'ওরা সারেণ্ডার করে ভালো—'

'সারেণ্ডার ! প্রথম প্রথম সারেণ্ডার করে। তারপর উঠতে-বসতে—সে যে কি অশান্তি রে !'

'একসাথে থাকলে তো ! বিয়ে করেই বোম্বাই চলে যাব। ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।'

'বাড়ি ছাড়বি ? গুড। ভেরি গুড। সাবাশ ! তুই, তুই-তুই—'

গুড ! ভেরি গুড ! সাবাশ ! তুই—তুই—তুই

কি বলতে চেয়েছিল ? বাপকা বেটা তুই ?

গা অমিতের রি-রি করে হীরেনের উচ্ছ্বাসের আদিখ্যেতায়।

বাপের ঔরসে কার জন্ম নয় ? তুই তোর বাপের ব্যাটা নস ?

কিন্তু নিজের পায়ে নিজে যদি কেউ কুড়ুল মারে, লোকে কি করবে ?

তোর বাপের মত বুঝসুঝ বাপ আজকাল ক'জনের হয় ? বৌ-বরণ করেই না বৌকে তোর মা ঘরে তুলেছিল ?

তা তুই কেন বৌকে অমন নাই দেওয়া শুরু করলি ? নাই দিতে দিতে মাথায় তুলে দিয়ে তার চাকরি ছাড়ায় সায় দিয়ে বসলি ?

অভাবের সংসারে এমনিতেই খিটিমিটি বাধে। তার ওপর তোর বৌটা না-ঘরকা না-ঘাটকা। চাকরিও করবে না, ঘর-সংসারের কুটোটিও নাড়বে না। সব সময় নবেল নিয়ে শুয়ে থাকবে। লেখাপড়া জানা মেয়ে যে ! হুটহাট বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। মডার্ন মেয়ে যে !

অমন বৌয়ের ওপর শাশুড়ি-ননদ চটবে না ? চটে গেলে পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটবে না ? জাত তুলে গালাগাল দেবে না ?

স্বজাত হলে বাপ তুলে দিত।

কিন্তু কালই বৌকে ফের চাকরির জোয়ালে জুতে দে, মাস মাস টাকা এনে শাশুড়ির পায়ে রেখে প্রণাম ঠুকুক, শ্বশুরের জন্যে হরলিক্সটা, লেবুটা, ননদদের জন্যে এটা-সেটা এনে দিক—দেখবি, বৌমা-বৌমা করে বৌদি-বৌদি করে আদর-সোহাগের বান ডেকে যাবে।

সংসারে সুখশান্তি থই-থই করবে।

।। ঘ ।।

দুই চোখ বড় বড় করে চারু বলে, 'ওমা! তাই নাকি! পেটে পেটে এত!'

বিপিন বলে, 'বিয়ের চান্স আছে বুঝলে মেয়েরা আজকাল প্রেম করতে তেড়ে আসে।'

'তোমায় বলেছে!' চারু মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, 'দ্যাখ না একবার চেষ্টা করে।'

'স্কোপ কোথায়! হত শ'খানেক বছর আগে—গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ, মরাইভরা ধান, ঘরভরা বৌ—।'

আফসোস করছে বিপিন। কিন্তু নির্জলা আফসোস!

হেসে খানখান হচ্ছে চারু।

বিপিনের মত সুখী সংসারী বন্ধুদের মধ্যে কেউ নয়।

আই-এ পাশ করে চাকরিতে ঢোকে। চাকরির বছর পুরতে বিয়ে। আটটি ছেলে-মেয়ে। এখনও হয়। নিম্নমধ্যবিত্ত অবস্থা। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। মোটা ভাত-কাপড় জুটে যায়।

এই ঘরে সোফা-কৌচ নেই। ফ্লাওয়ার ভাস-ই নেই তা রজনীগন্ধা। রবীন্দ্রনাথ ছেলেমেয়ের পাঠ্যপুস্তকে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত পাশের বাড়ির রেডিওতে।

এই ঘরে ইনটেলেকচুয়াল আড্ডা জমানো চলে না। এই বৌ নিয়ে সংস্কৃতি-সম্মেলনে যাওয়া চলে না।

কিন্তু সেজন্যে বিপিনের কোন নালিশ নেই। বিয়ে যে জন্ম-জন্মান্তরের ব্যাপার! বিধিলিপি।

বিপিন ভগবান মানে। ভাগ্য মানে। ভগবান যা করাবেন, ভাগ্যে যা থাকার—তাই হবে। সাধ্য কি মানুষের তার বাইরে পা দেয়।

তাই ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে বিপিন কোনদিনই কোন প্ল্যান আঁটে নি, ছক কষে নি। কেন না যা হবার তা হবেই যখন, অনর্থক অশান্তি ডেকে আনা কেন?

বিপিন তার বিশ্বাস নিয়ে শান্তিতে আছে। সেই শান্তির ছাপ ওর

বোকা-সোকা চোখে-মুখে। নেয়াপাতি-ভুঁড়ি চেহারায়। জীবনে যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি পেয়েছে।

এই পাওয়াটাই আসল। কেউ প্রেম করে পায়। নিজের হাতে জীবনকে তৈরি করে নিয়ে পায়। যেমন সুধাময়।

কেউ পাঁজির দৌলতে পায়। নিজেকে জীবনের হাতে সঁপে দিয়ে পায়।—বিপিন।

কিন্তু সবাই পায় না। পাওয়ার শখ ষোল আনা থাকলেও পাওয়াটা আদায় করে নেওয়ার নামমাত্র মুরোদ থাকে না বলে পায় না। —বসন্ত।

যৌবনের সাধ-স্বপ্নের বেলুনটা নিজেরই অপদার্থতায় চুপসে গেলে অবিরাম কেউ হাহাকার করে।—হীরেন।

না-পাওয়াটা কেউ আবার টেরও পায় না—আদিত্য।

আধময়লা বিছানায় পেট-ফাটা পাশবালিশটা জাপটে ধরে অমিত আরাম করে বসে।

বিপিনের কব্জির ওপরে সোনার চেনে সোনার তাবিজ। কিন্ত কই, এখন তো গা গুলিয়ে উঠছে না। বিপিনের নাকে একটি নোলক পরিয়ে দেওয়ার সাধ তো জাগছে না।

অথচ প্রভাতকে দেখামাত্র জাগে। শুধু নোলক-পরানো নয়, পরানোর পর হ্যাঁচকা টানে সেই নোলক নাক ছিঁড়ে খুলে নিলে গলগল রক্তে মুখ মাখামাখি হয়ে গেলে সুট-টাই-পরা কেতাদুরস্ত প্রভাতকে কেমন দ্যাখাবে, তাই দেখার জন্যে প্রাণটা কাটা-ছাগলের মত ছটফটিয়ে ওঠে।

বিপিনকে দেখে মনে হয়, তাবিজ ছাড়া ওকে মানাতই না।

চারুকে যেমন মানাত না নাকচাবি ছাড়া।

অথচ নাকচাবি দূরের কথা, নাকে শুধু একটা ফুটো আছে বলে পার্থর নাচ-গান জানা গ্রাজুয়েট বৌটাকে দেখেই কেমন আনকালচার্ড-আনকালচার্ড মনে হয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল তেলির মেয়ে। বংশে ওই প্রথম ইস্কুলের বেড়া ডিঙিয়েছে।

বিপিন বলে, 'অ্যাদ্দিনে তা হলে তোর থিয়োরিটা কাজকর্মে প্রমাণ করছিস? বেশ! বেশ!'

বিপিন খোঁচা দিচ্ছে বুঝেও অমিত হাসে কৃতার্থের হাসি। বলে,—'দেখি।'

চারু শুধায়, কিসের প্রমাণ—হ্যাঁ গা ?'

'প্রেম সম্পর্কে অমিতের—,

'এই !'

'একটা থিয়োরি—মানে ইয়ে আছে। সাধেই এত বছর অব্দি বিয়ে করে নি। কবি মানুষ—যাকে-তাকে তো বৌ করতে পারে না, আগে আগপাশতলা যাচাই করে—'

'আঃ !'

'প্রেম। প্রেমের পরে বিয়ে। মেয়েটি হওয়া চাই রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।'

'তা কে না চায় বাপু। ও'র মত পাত্র—'

'খাবে কম দুধ দেবে বেশী !'

'আহা, কি কথার ছিরি !'

'নইলে কেতকীর মত মেয়েকে—'

'বিপিন !'

কথাবার্তায় বিপিনটা চিরকালই মেঠো। মুখের রাখঢাক নেই। কিন্তু—

খাবে কম দুধ দেবে বেশী !—ভালগার শোনালেও কথাটা কি সত্যি নয় ?

রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী !—তা কে না চায় বাপু। চারু কি মিথ্যে বলেছে ?

বিয়ের চান্স আছে বুঝলে মেয়েরা আজকাল তেড়ে এসে প্রেম করে ! —লাখ কথার এক কথা।

কিন্তু মেয়ে হলেই হল ? অমিত রায় তো শুধু কবি নয়, জীবনশিল্পীও। যে-কোন মেয়ের সাথে সে প্রেম করতে পারে ? বিয়ে করার মত প্রেম ?

তেমন মেয়ে কি নেই ? আছে। গণ্ডায় গণ্ডায় না হলেও আছে। কিন্তু সে-মেয়ে অমিত রায়কে পাত্তা দেবে কেন ? কবি হিসেবে নামডাক থাকলেও, চেহারাটা চৌকশ হলেও মাইনে তো সাকুল্যে শ' তিনেক ?

ধরা যাক, তবু ছিল। বাজার চালু উপন্যাসের মত দুম্‌ করে একটা মোটর অ্যাকসিডেণ্ট ঘটে গেল। তার জীবনে অমন একটি মেয়ের আগমন নয়, আবির্ভাব ঘটল। প্রেম হল। জমল। বিয়েও হল।

তারপর? ছুঁচিবেয়ে মা, সেকেলে বাবা, টাকা-আনা পাইয়ের হিসেব-কষা দাদা, গেঁয়ো বৌদি—ওদের সঙ্গে পাড়ায় সেই বৌ নিয়ে—

ভাবলেও বুক হিম হয়ে আসে।

আলাদা বাসা? ওই বৌ নিয়ে তিন শো টাকায়?

ভাবার আগে বুক হিম হয়ে আসে।

বৌ লটারির টাকা নয় যে পেলেই কেল্লাফতে। দাম্পত্য হল গিয়ে দস্তুরমত একটা আর্ট। প্রতিদিন তাকে সৃষ্টি করতে হয়।

খোরাক না পেলে কিছুই বাঁচে না। সার-জলের অভাবে দুর্দান্ত প্রেমের চারাও শুকিয়ে যায়।

অভাবের সুখ প্রেমের নটেও মুড়িয়ে দেয়।

॥ ৬ ॥

কেতকী আছে শুনেই অমিতের টনক নড়ে। সেরেছে!

'আসুন!'

'আমি না হয়—অসুবিধে হলে'—অমিত আমতা আমতা করে।

'আপনাকে বসতে বললেন।'

উপায় নেই। সামনের দিকে পা অগত্যা বাড়াতেই হয়। দুই হাঁটু ঠক-ঠক করে। বুক ঢিপ-ঢিপ।

কেন এল কেতকীর কাছে! কেন এল! এখানে আসার কথা তো ঘুণাক্ষরেও আজ ভাবে নি।

আজ ভাবে নি। বন্ধুদের নেমন্তন্ন করার জন্যে সকালে যখন বাড়ি থেকে বেরোয়, তখন ভাবে নি।

কিন্তু কাল? না না, কাল নয়—পরশু? পরশু সকালে লাবণ্যর মুখে কথাটা শোনার পর—

শোনামাত্র হকচকিয়ে যায়। না না না, এ হতে পারে না, ইম্পসিবল্‌ ইম্পসিবল—প্রাণপণে চিৎকার করে উঠতে চায়। কিন্তু চিৎকার করে গলা চিরে ফেললেও তো বাস্তবটা আদৌ বাতিল হয়ে যায় না।

পরশু সারারাত ঘুম হয় নি। অনেক কথা মনে পড়েছে। অনেকের কথা মনে পড়েছে।

সবচেয়ে বেশি মনে পড়েছে কেতকীর কথা। বারবার মনে পড়েছে।

কিন্তু কাল সকালেই না কেতকীকে মন থেকে চেঁচে মুছে ফেলে? আপসোস অনর্থক বুঝে। বাস্তবের মোকাবিলা করার জন্যে কোমর বাঁধে? ভরাডুবি থেকে বাঁচার জন্যে?

তবু কেন—

ওই বিপিন! বিপনেটা মনে করিয়ে দিল বলেই—

'আপনি? বসুন বসুন! কি সৌভাগ্য আমার—'

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল, ধপ করে অমিত বসে পড়ে। নিজের ব্যবহার নিজের কাছেই বেখাপ্পা মনে হয়।

'আমি ত' ভাবতেও পারি নি—'

এ-পাড়ায় এসেছিলাম, ভাবলাম—'

'ভাগ্যিস এ পাড়ায় এসেছিলেন! গরিবের কথা মনে পড়ল।'

কেতকী হাসে। দাঁত দেখা যায় না কিন্তু গালে চমৎকার টোল খায়।

এখন আর মুখখানা এনামেল করা নয়, তবু ঝকঝক করছে। পরনে ছাপা ভয়েল! কটকি ব্লাউজ। কানে রিঙ। গলায় সরু হার। হাত খালি। এলো খোপা। কি ছিমছাম। রুচিস্মিতা!

অমিত মুগ্ধ হবে-হবে করছিল, কিন্তু কেতকী অপলকে তাকে দেখছে টের পেয়ে সামলে নেয়।

'অসময়ে এসে আপনার—'

'ভদ্রতা হচ্ছে! তা ভালো। অপিসে তো আমাদের মানুষের মধ্যেই—'

'ছি ছি, কি যে বলেন! আমি কখনো—'

'চা খাবেন? কফি? না কি শরবৎ? এক মিনিট—'

সেই কোন্ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কোন বন্ধুর বাড়িতে কিছু মুখে দেয় নি। চায়ের পিপাসায় গলা শুকিয়ে এসেছিল।

কিন্তু চায়ের বদলে শরবৎ যে এত আরামদায়ক কে জানত!

শরবৎ খেয়ে শরীর জুড়িয়ে যায়, মনটা খচ-খচ করে। কেন এল কেতকীর কাছে? কেন এল! কেন এল!

ওই তো দেড়খানা ঘর। কিন্তু কি টিপটপ। সোফা-কোচ নেই বটে, কিন্তু বাক্সের ওপর শান্তিনিকেতনী চাদর বিছিয়ে চমৎকার বসার জায়গা। জানালায়-দরজায় পর্দা। বুক-সেলফ। সেতার। ড্রেসিং টেবিল। আলমারি। টিপয়। টেবিল ল্যাম্প।

একটি ঘরের মধ্যে সব, জ্যামিতিক নিয়মে সাজানো।

শুধু মামুলী চা নয়, বাড়িতে কফিও থাকে। শরবতের জন্য সিরাপ। ফিনফিনে কাচের গেলাস।

অথচ চাকরি তো সামান্য স্টেনোর!

বিধবা মাকে নিয়ে চাকর রেখে ওই চাকরি করেও এইভাবে বেঁচে আছে। কম বাহাদুরি!

বড্ড বেশি সাজগোজ করে বলে সবাই টিটকারি দেয়। কিন্তু কেন সাজবে না? সাজা মানে যখন নিজেকে আরও সুন্দর করে তোলা?

সুন্দরের সৃষ্টিই না শিল্প?

শিল্পী কেতকী শুধু অফিসে নয় বাড়িতেও।

শুধু বাইরে বেরোবার সময় নয়, সব সময়েই সুন্দর হয়ে থাকতে হয়। শুধু বৈঠকখানা না, গোটা বাড়িটাকেই সুন্দর করে রাখতে হয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সুন্দর করে তুলতে হয়। তবেই জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে।

অমিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জীবনশিল্পী অমিত রায়।

পারবে তো লাবণ্য জীবনটাকে সুন্দর করে তুলতে? অমিতের ট্রেনিং পেলে পারবে তো?

॥ চ ॥

'কি রে, আবার এলি?' সুধাময় অবাক হয়ে যায়।

রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলা রগড়াতে রগড়াতে অমিত বলে, 'সবাইকে বলে এলাম!'

'বেশ করেছিস। কিন্তু ফের এলি কেন? বেলা বারোটা বাজে—'

'সেনসাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। বাড়িতে নেই।'

'সেজন্য অত ভাবছিস কেন। বললাম না ওটা হয়ে যাবেই।'

সেজন্যে অমিত ভাবেও না! পঞ্চাশ কেন, একশো টাকা অ্যালাউন্স দিলেও বোম্বাই কেউ যাবে না অমিতও জানে।

'একটা কথা—রেজিস্ট্রিটা তোর বাড়িতে হবে—'

'বাড়িতে ?' সুধাময় থমকে যায়। 'বাড়িতে যে—'

অমিত বাধা দিয়ে বলে, 'খরচ বেশি ? হোক। খরচের জন্যে তুই—'

'খরচ না—হাঙ্গাম। সাত ভাড়াটের বাড়ি—'

ভাড়াটে বাড়িতে বুঝি বিয়ে হয় না। প্লিজ, সুধা!'

অমিত মিনতি জানায়। খপ করে সুধাময়ের একটি হাত জড়িয়ে ধরে: 'তোর রেখার একটু অসুবিধে হবে বুঝেছি, কিন্তু বিপিনের বৌ খুব কাজের—ও হেল্প করবে। তা ছাড়া রেস্তোরাঁয় অর্ডার দেব। সন্ধ্যার পর রেজিস্ট্রেসান—রাত আটটার মধ্যে বাড়ি ফাঁকা। আপত্তি করিস নি ভাই।'

'কিন্তু কি ব্যাপার বল ত ? হঠাৎ মত বদলালি কেন ?'

'কারণ আছে। মানে—'

'দিনের বেলা বের করে আনা অসুবিধে ?'

'অ্যাঁ ! হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক ধরেছিস।'

চমকটা সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলে অমিত সায় দিয়ে ওঠে।

দিনের আলোয় বন্ধু-বান্ধবের সামনে যায় লাবণ্যকে বের করা ?

বাড়িতে আটপৌরে বেশে গেরস্থ মেয়ে বলে চলে যায়, কিন্তু সেজে-গুজে রাস্তায় বেরোলে কি জবরজং দেখায় ওকে দেখেছে তো !

আধময়লা রঙ, মাংসল শরীর, গোরুর মত ড্যাবডেবে চোখ, জবুথবু চাল-চলন, অচেনা লোকের সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতেও পারে না।

এই নাকি অমিতের প্রেমিকা ? প্রেম করে অমিত একে বিয়ে করছে !

ভাগ্যিস কেতকীর কাছে গিয়েছিল ! বিয়ের খবরটা কেতকীকে জানাতে পারে নি বটে, কিন্তু ওকে দেখেই না লাবণ্যের স্থুলত্বটা নতুন করে মনে পড়ে গেল !

রাতে অত খুঁটিয়ে কেউ নজর করবে না। তার ওপর সুধাময়ের বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই এবং এই বিয়েতে হ্যাসাক জ্বালানোর কথাই ওঠে না।

দেরি করে যাবে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। প্রাণপণে লাবণ্যকে

আগলে আগলে রাখবে। ভালো করে দেখার, কথা বলার চান্সই কাউকে দেবে না।

বিয়ের দু-চার দিনের মধ্যেই বোম্বাই। বোম্বাইয়ে কয়েকটা বছর।

বৌ লটারির টাকা পাওয়া নয় যে পেলেই কেল্লা ফতে! দাম্পত্য হল-গিয়ে দস্তুরমত একটা আর্ট। প্রতিদিন তাকে সৃষ্টি করতে হয়।

পাথর কেটে শিল্পী মূর্তি বানায়। কাদামাটি ছেনেও বানায়।

পাথর কেটে মূর্তি বানানোয় ভারি মেহনত। কব্জির জোর না থাকলে পাথরে চিড় ধরে। মূর্তি বরবাদ হয়। যেমন হয়েছে হীরেনের।

কেতকীকে বিয়ে করলে অমিতেরও যে হত না তার গ্যারাণ্টি আছে?

কাদামাটি ছেনে মনের মত মূর্তি বানাতে সব শিল্পীই পারে। যেমন পেরেছে সুধাময়।

প্রেমে পড়ে মাসতুতো বোনকে বিয়ে করে। ক্লাস নাইনের ছাত্রী। সাদামাঠা মেয়ে। টেঁপি না কি যেন নাম ছিল।

কিন্তু আজকের জ্যোৎস্না রায়কে দেখে কে বলবে এই সেই মেয়ে। পি-ইউ পাশ টেলিফোনে চাকরি, রবীন্দ্র ভারতীর গানের ডিপ্লোমা।

সুধাময় তার মাইনের বেশিরভাগ মাকে পাঠিয়ে দেয়, সে নিয়ে জ্যোৎস্নার কোন নালিশ নেই। অভাবের জন্যে একবারের বেশি মা হতে পারে নি, সে নিয়ে কোন অভিযোগ নেই।

সংসারের যাবতীয় কাজ জ্যোৎস্নাই নিজের হাতে করে। আবার ছুটির বিকেলে খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে স্বামীর সাথে বেড়াতেও যায়।

মাসে একটা করে প্রোগ্রাম। এখানে-ওখানে ফাংশান। কালচারকে কালচার, টাকাকে টাকা। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

রান্না-করা, বাসন-মাজা, ঘর ঝাট-দেওয়া। চাকরি করে টাকা আনা। রবিঠাকুরের গান গাওয়া বাড়তি উপায়।

আর কি চাই।

লাবণ্যও কাদামাটির তাল। সেই কাদামাটি ছেনে অমিতও তার মনের মত মূর্তি বানিয়ে নেবে।

বোম্বাই গিয়ে—সব সৃষ্টি-কর্মই নেপথ্যে চলে।

বকুলের মত ব্রিলিয়াণ্ট মেয়েকে আদিত্য মামুলী বৌ বানিয়ে ফেলেছে, লাবণ্যের মত মামুলী মেয়েকে অমিত—

অমিত বুক চিতিয়ে হাঁটে।

কেতকীও তখন লাবণ্যের কাছে হেরে যাবে। কেন না, কেটি মিত্তিরের চোখ-নাক-মুখ যতই ধারালো হোক, দেহে যে তার অনেক কিছুই কমতি আছে সেটা বোঝার জন্যে দূরবীণ লাগে না।

সেই হিসেবে লাবণ্য—

লাবণ্যর নরম-নিটোল শরীরখানি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে। সারা শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

লাবণ্য! লাবণ্য! লাবণ্য! বন্যা! বন্যা!

বন্যা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছধারা। তাহারি মাঝারে···তাহারি ···মাঝারে···তাহারি মাঝারে···

এক্ষুণি স্ফটিক জলের স্বচ্ছধারায় বেপরোয়া ঝাঁপ দিয়ে পড়ার জন্যে অমিত করে কি, হাতের সামনে খালি বাস পেয়েও ট্যাক্সি ডেকে বসে।

॥ ছ ॥

কলতলার পাশে উবু হয়ে লাবণ্য গুল দিচ্ছিল, বাড়িতে পা দিয়েই অমিত ইশারায় ডাকে, কিন্তু লাবণ্য আসে ঘড়িতে বেলা তিনটে বাজিয়ে।

'আশ্চর্য! কখন থেকে আমি—'

'আস্তে! বৌদি জেনে গেছে।'

'বয়ে গেল!' বলেও অমিত দরজার দিকে যায়। বাইরেটা উঁকি মেরে দেখে নিয়ে ফিরে এসেই লাবণ্যকে জাপ্টে ধরে।

'আঃ! ছাড়ো ছাড়ো—'

'তোমাকে না—!'

'মরে যাব যে!'

'তোমায় না আমি—।'

'মানুষের শরীর তো বাপু!' জোর করে নিজেকে লাবণ্য ছাড়িয়ে নেয়।

লাবণ্য বিরক্ত হয়েছে, অমিত বোঝে। কিন্তু বুঝলে তার অভিমান জাগার কথা। অথচ এখন মান-অভিমানের পালা চালিয়ে নষ্ট করার মত সময় নেই।

অমিত তাই গদগদ গলায় বলে, 'একটা দারুণ খবর আছে। তুমি শুনলে—'

'আমারও একটা খবর আছে। তা শুনলে তুমিও—'

'আমারটা আগে শোন—'

'না ; আমারটা আগে—'

'না আমারটা—'

'না আমারটা—'

'না—'

'না—'

'ননা।' আদুরে জিদ ধরে অমিত ফের এগিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি লাবণ্য পিছু হটে।

'বেশ শুনি।'

'সব ব্যবস্থা পাকা করে এলাম। সামনের রোববার—সন্ধ্যের পর। ভেবে দেখলাম, আর দেরি করা উচিত নয়। অমনিতেই—'

'এই খবর!' লাবণ্য ঠোঁট ওল্টায়। হেলাভরে বলে, 'এত তাড়াহুড়োর কোন দরকার ছিল না।'

'মানে ?'

'মানে—মানে!' লাবণ্য মুখ টিপে হাসে।

ভয়ানক এক ধাঁধার গ্যাঁড়াকলে পড়ে যায় অমিত। লাবণ্যর মুচকি হাসিতে চটেও যায়।

'দূর ছাই! ব্যাপারটা কি বলবে তো! তাড়াহুড়োর দরকার ছিল না—একথার মানে কি ?'

'আমি বলছি ছিল না।'

'তুমি বলছ, তুমি বললেই হল ?'

'বাঃ রে, আমিই তো বলব। আমারটা আমি না বললে কি পাড়াপড়শী এসে বলবে। অমন হাঁ করে দেখছ কি—হ্যাঁ।'

'তুমি—ঠিক—ঠিক—'

'আস্তে! বললাম না বৌদি জেগে আছে।'

'কিন্তু তুমিই তো পরশু সকালে—'

'কি করে বুঝব ! কখনও এমন হয় না। দুই-একদিন এদিক-ওদিক হলেও মাস দেড়েক—'

'লাবু ! লাবু ! লাবু !'

অমিত হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

কাল সকাল থেকে যত প্ল্যান-পরিকল্পনা এঁটেছিল, তাসের ঘরের মত ঝুর-ঝুর করে ঝরে পড়ে।

সোজা কথা ! গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানানো সহজ ব্যাপার ! অত মেহনত পোষায় অমিত রায়ের।

ভাগ্যিস বাড়িতে ছিল না সেনসাহেব।

বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঠাট্টা করেছি—বললেই ল্যাঠা চুকে যাবে। পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়। কিন্তু 'বসে'র সঙ্গে ঠাট্টা ! আজ বোম্বাই ট্রান্সফার করার জন্যে বাড়ি গিয়ে সাধাসাধি, কাল যাব না বলা।

ঘাড় ধরে বোম্বাই ভেজে দিত। নয়, পাছায় লাথি মেরে অফিস থেকেই হটাবার।

কিন্তু কলকাতা ছেড়ে অমিত বাঁচবে কি করে। তার পক্ষে চরে খাবার এমন জায়গা আর কোথায় !

চাকরি নট হয়ে গেলে যে সব লাটে উঠবে।

বন্ধু-বান্ধব দূরের কথা। বেকার অমিতকে কেতকীই কি পাত্তা দেবে।

কেতকী ! কেতকী ! কেতকী ! কেটি ! কেটি ! কেটি !

কেটি মিত্তির !

হে লাবণ্য, মোর লাগি করিও না শোক। আমার রয়েছে কর্ম··· কর্ম···কর্ম···

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে লাবণ্যও।

বাব্বা ! জোর বাঁচা বেঁচে গেছে। জবর আক্কেল হয়ে গেছে।

খিদের জ্বালায় লোভের বশে মানুষ অখাদ্য খায় তাই বলে জীবনভোর অখাদ্য গেলা !

ফোন নামিয়ে রাখা মাত্র চারদিক থেকে প্রশ্ন ওঠে : 'কী বলল ?' 'কেমন আছেন ?' 'পেনটা কি আরও বেড়েছে ?' 'বাড়া কিন্তু ভালো। নইলে—।' 'নইলে পেন যদি বন্ধ হয়ে যায়—।' 'পেন বন্ধ হয়ে গেলে—'

পেনের কথাটা জিজ্ঞেস করার সুযোগই হয় নি। 'ঘুমোচ্ছেন' বলেই নার্স কানেকশান কেটে দেয়। ঘন ঘন ফোন করায় চটে গেছে।

চটে মিহিরও। বারোয়ারি হাসপাতাল নয়। আজে বাজে নার্সিং হোম না। গুচ্ছের টাকা গুণে দিয়েছে। যত লাগে দেবে। কিন্তু এ কী ব্যবহার !

'মিহিরবাবু—।'

'মিহিরদা—!'

'কেন আপনি এত—।'

মিহির গুম হয়ে থাকে। ঘুমোচ্ছেন—মানে তন্দ্রা মত আর-কি। কাল সারাটা রাত শরীরের ওপর দিয়ে কম ধকল তো যায়নি।

'পেনটা কি আরও—।'

পেনের থেকে শরীরে ক্লান্তিটা নিশ্চয় বড় হয়ে উঠেছে। নইলে তন্দ্রা আসে ? পেন অতএব এখন না থাকার সামিল।

'এখনও যদি পেন—।'

কিন্তু পেন নেই বললে এত উদ্বেগ এত উৎকণ্ঠার কোন মানে থাকে এতগুলি লোকের এত উদ্বেগ এত উৎকণ্ঠার !

গভীর নিশ্বাস ছেড়ে মিহির বলে, 'বোঝা মুশকিল !'

সাধন সুধায়, 'তা কখন হতে টতে পারে কিছু বলল ?'

'হতে তো পারে যে-কোন মুহূর্তে।' পরিতোষ বলে, 'তিন দিন ধরেই ওরা এক্সপেক্ট করছে—তাই না মিহিরদা ?'

নন্দ বলে, 'তিন কেন, অনেকের পাঁচ সাত দিনও—কিন্তু বয়েসটা যে—'

'বয়েস !' অনিল কথা কেড়ে নেয়, 'এই বয়েসে কি হয় না ? বৌদির না সেদিন—।'

যোগেশের দিকে তাকায়।

যোগেশ বলে, 'আমার গিন্নির তো ফার্স্ট নয় হে। হয়ে হয়ে তেনার এখন—' খুক করে কেশে রসিকতাটা চেপে যায়। রসিকতা এখন বড্ডই বেমানান।

সেনগুপ্ত বলে, 'বয়েসের কথা অত ভাবছেন কেন মশায়। লাইফ বিগিনস্ অ্যাট ফর্টি।'

'তা বটে। তা বটে।' সঙ্গে সঙ্গে নন্দ সায় দেয়। বয়েসের কথাটা তোলা ঠিক হয় নি। গলা ছেড়ে সবাই ভরসা দিচ্ছে, আর সে কিনা বয়সের কথা তুলে ভড়কে দিতে চায়? বউ ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে তাকে না একদিন ছোট ব্রিস্টলে নিয়ে যাবে বলেছে? 'আপনি কিছু ভাববেন না, মিহির বাবু। ভাবনার কিছু নেই। দেখবেন ভগবানের দয়ায়—সিগারেট খাবেন? খান না।' চটপট একটি সিগারেট বের করে নন্দ মুখে গুঁজে দেয়। 'খান'। দেশলাই জেবলে ধরিয়ে দেয়।

মিহির সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লে নন্দ স্বস্তির শ্বাস ফেলে।

নন্দ দত্ত যেচে সিগারেট দিল? আস্ত সিগারেট? পরিতোষ তাজ্জব হয়ে যায়। কিন্তু তাজ্জব বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলে না।

অ্যাদ্দিন খোসামুদি করে পাঁচশো টাকার একটা পলিসিতেও রাজী করাতে পারেনি। কিন্তু ছেলেমেয়ে যাই হোক পাঁচ হাজারের করাবে কথা দিয়েছে।

পরিতোষ বলে, 'তুমি আজ কাজ করো না মিহিরদা। এমন ডিসটার্বড্ মন নিয়ে—দাও, ওই স্টেটমেণ্টটা আমি করে দিচ্ছি।'

পরিতোষের প্রস্তাবে যোগেশ আঁতকে ওঠে। এ-লেজার ও-লেজারে হিসেব তুলতেই হর্দম ভুল করে বসে—সে করবে ওই স্টেটমেণ্ট? ওতে ভুলচুক হলে আয়ার তাকে আস্ত রাখবে?

যোগেশ বলে, 'ওটার আজ দরকার নেই। কাল দিলেও চলবে। আজ থাক।'

'কিন্তু তখন যে বললেন,—'

'এখন বলছি—'

মিহির বলে, 'হয়ে গেছে যোগেশদা। শুধু ফরোয়ার্ডিং লেটারটা—'

'হয়ে গেছে?' সাধন অবাক। 'কী করে করলেন?'

'করলাম !'

করেছে নিশ্চয়, নইলে হয়ে যায় কী করে ? কিন্তু ওর বউয়ের কথা ভেবে সে একটা চিঠি অব্দি টাইপ করতে পারেনি, আর ও কিনা অত বড় স্টেটমেণ্টটা শেষ করে বসে আছে ! বউয়ের জন্যে মানুষটার দুর্ভাবনায় ভেজাল নেই তো ? অমন একটা বউয়ের জন্যে দুর্ভাবনায় !

সেনগুপ্ত বলে, 'কাল দিলেও চলবে যখন, থাক ওটা। আপনি চলেই যান মশায়।'

'চলে যাবো ?'

'যাবেন না ?' সেনগুপ্ত প্রায় ধমকে ওঠে। 'মিসেসের এমন অবস্থা—' চলে না গেলে আরও ক গণ্ডা ফোন করবে কে জানে। দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত না-না করেও গোটা দশেক হয়ে গেছে। এক ডিপার্টমেণ্ট থেকে দশ-দশটা প্রাইভেট কল ! অপারেটর কি খেয়াল করছে না। থাকলে আরও কোন্-না গণ্ডা দুয়েক করবে। পোনে পাঁচটায় সুলেখার অফিসে তার ফোন করার কথা। একটা ফোনের জন্যেই তখন না সে ফেঁসে যায়।

'চলেই যাও মিহিরদা।'

'হ্যা, চলেই যান। আয়ার এমনিতেই যা হয়ে আছে—'

কথাটা যোগেশেরও মনে ধরে। বোনাসের দাবি মেনে নিতে হওয়ায় ডিরেক্টর বোর্ড আয়ারকে দোষী করেছে। আয়ার এফিসিয়েণ্ট হলে কেরাণীরা সাহস পেত দাবি তুলতে ? গো-স্লো করে হাতে নাতে সেই দাবির তাগদ দেখিয়ে দিতে ?

ডিরেক্টরদের কাছে ধাতানি খেয়ে আয়ার এখন মরীয়া হয়ে এফিসিয়েন্সি দেখাচ্ছে। হরিপদবাবুর মত মানুষও একটা বছর এক্সটেনশন পেলেন না। করিডরে বিড়ির ধোঁয়া দেখা যাওয়ায় তিনটে বেয়ারা সাসপেণ্ড। তিরিশ নয়ার স্ট্যাম্পের হিসেব না মেলায় ডেসপ্যাচের টেম্পরারি ক্লার্কটির চাকরি নট।

মিহির যদি আজ ভুলভ্রান্তি করে, বউয়ের দোহাই দিয়ে পার পেয়ে যাবে কিন্তু হেড ক্লার্ক হিসেবে আয়ার তাকে—

জোরালো গলায় যোগেশ বলে, 'তুমি বাড়ি চলে যাও মিহির।'

'বাড়ি চলে যান মশায়।'

'বাড়ি চলে যাও, মিহিরদা।'

'বাড়ি চলে যাও।'

'বাড়ি যাও।'

'বাড়ি।' অনর্গল উপদেশে অসহায় মিহির এর-ওর মুখের দিকে তাকায়। নন্দ বলে, 'উঠুন তো। উঠলেন!'

হাত ধরে পরিতোষ টেনে তোলে; 'ওঠো মিহিরদা। যোগেশদা যখন যেতে বলছে—।' দরকার হলে মিহিরকে হাত ধরে রাস্তায় দিয়ে আসার জন্যে কোমর বাঁধে।

সেনগুপ্ত বলে, 'কিসের এত কাজের আঠা মশায়। যান, চলে যান।' তামাম ড্যালহৌসী পাড়াকে জানান দিয়ে তিন বছর প্রেম করে চলেছে—নিজেকে সেনগুপ্ত নায়ক নায়ক ভাবত। কিন্তু ইদানীং খটকা লাগতে সুরু করেছে। প'চিশ বছরের পুরনো প্রেমিকাকে বিয়ে করে লোকটা সোরগোল ফেলে দিয়েছে। এর ওপর টেক্কা দিতে তাকে তিরিশ বছর প্রেম চালাতে হবে নাকি? দিনকে দিন যেভাবে সুলেখার শরীর ভাঙছে, তিরিশ অব্দি কিছু থাকবে তো?

সাধন বলে, 'স্ত্রীর অমন অবস্থা—' অবস্থাটা কল্পনা করে সাধন ভোঁস করে শ্বাস ছাড়ে। বীণার থেকেও কমসে কম বছর দশেকের বড়। তবু কী ফিগার! কী বাঁধুনী! কী রঙ! ডানাকাটা পরী যাকে বলে। ডানাকাটা সেই পরী এখন কাটা ছাগলের মত দাপাচ্ছে। শায়া-বডিজ ব্লাউজ তো গেছেই, শাড়িটাও—। 'চলে যান মশায় চলে যান। আমিও সঙ্গে যাব?'

'আশ্চর্য লোক আপনি।' অনিল চটে ওঠে। এই ডামাডোলের মধ্যেও একটা স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট বাগিয়েছে। আরও বাগাবার তালে আছে? স্ত্রীর অমন অবস্থা সত্বেও অফিসের জন্যে জান লড়িয়ে দিয়ে? 'চলে যান।'

সকলের তাড়া খেয়ে মিহির উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েও ইতস্তত করে।

'ভেবনা মিহিরদা।'

'ভাবনার কিছু নেই মিহিরবাবু।'

'ভগবানের ওপর ভরসা রাখুন।'

'চলো, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।'

অগত্যা মিহির অফিস থেকে বেরোয়।

পরিতোষ ও সাধন রাস্তা পর্যন্ত আসে। নতুন করে ফের এক কিস্তি ভরসা দিয়ে ফিরে যায়।

কৃতজ্ঞতায় বুক মিহিরের টইটুম্বুর। সহকর্মীরা এত দরদী! এমন দরদী!

এ-দরদ অবশ্য শ্রীলার দৌলতে।

নইলে এই অফিসে কম দিন কাজ করছে না। পাক্কা তেইশ বছর। এতদিন কেউ তাকে পাত্তা দিয়েছে?

পাত্তা দেওয়া দূরে থাক, কৃপণ বলে কুনো বলে ঠাট্টা করেছে। কর্তৃপক্ষের তাঁবেদার বলে এড়িয়ে চলেছে।

আর আজ—

না, আজ নয়—বছরখানেক আগেই বুঝেছে, মিহির কৃপণ কুনো যাই হোক এই অফিসে ঢুকে হয়েছে। হয়েছে অবস্থার চাপে। আসলে মিহির আর-পাঁচজনের মত নয়। মামুলী কেরানি না। শ্রীলার মত মেয়ে কি সাধেই—

ট্রামে উঠতে গিয়ে মিহির পিছিয়ে আসে। বাড়ি গিয়ে লাভ? শ্রীলা-শূন্য বাড়ি গিয়ে!

তাহলে কি নার্সিং হোম? কিন্তু চারটের আগে সেখানেও ঢুকতে দেবে না। কড়া নিয়মকানুন। সকালে সাড়ে নটা বাজতে না-বাজতেই নার্সটা যে ভাবে তাড়া দিয়েছিল!

নার্সের তাড়ায় শ্রীলার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। বউকে ছেড়ে আসতে হচ্ছে ভেবে স্বামীর কষ্টের কথা ভেবে বউয়ের চোখে জল এসে যায়!

কাল সারা রাত অকথ্য যন্ত্রণায় নিজে দু'চোখের পাতা এক করতে পারে নি, তবু কেবলি ভেবেছে মিহিরের কথা। মিহিরের খাওয়াদাওয়ার অসুবিধার কথা। মিহিরের এক বাড়িতে থাকার অসুবিধের কথা। তার জন্যে মিহিরের দুর্ভাবনার কথা।

'তোমার কথা ভেবেই—'

আহা রে! ওই যন্ত্রণার মধ্যেও তার কথা ভেবে বউ কষ্ট পেয়েছে,

আর মিহির কিনা হোটেলে পরোটা মাংস সাঁটিয়ে এক ঘুমে করেছে রাত কাবার! কী অকৃতজ্ঞতা! কী অকৃতজ্ঞতা!

নয় অকৃতজ্ঞতা? তারই জন্যে না শ্রীলার এই দুর্ভোগ, নইলে শ্রীলা তো মা হতে চায় নি। মিহিরেরই মুখ চেয়ে চায়নি।

মা হওয়া মানে এদিক-ওদিকে মাস চারেকের ছুটি। দুমাস ফুল পে, এক মাস হাফ, এক মাস উইদাউট। তার ওপর এক কাঁড়ি খরচ। কী করে মিহির সামলাবে?

'তার চেয়ে এই তো আমরা ভালো আছি গো। এতকাল পরে—'

এতকাল নয়, মনে হয় কত যুগ। যুগ যুগান্তর! স্বপন বলে মনে হয়। স্বপন স্বপন।

কিন্তু স্বপনও যখন সত্যিই হল, স্বপ্নের ষোলকলা পূর্ণ না হলে মন যে মানে না! বিয়ে ছাড়া প্রেম সার্থক হয় না, ছেলেপুলে না হলে বিয়ে সার্থক হয়?

শ্রীলাকে জড়িয়ে ধরে মিহির আব্দার ধরেছিল। এই বয়েসে মা হওয়া রিস্ক জেনেও অবুঝ আব্দার।

কিন্তু এখন যদি একটা ভালো-মন্দ কিছু ঘটে যায়?

মিহিরের বুক হিম হয়ে আসে।

কী বেআক্কেলে কাণ্ডই করে বসেছে! কি এসে-যেত শ্রীলা মা না হলে? শ্রীলাকে পাওয়াটাই কি পরম পাওয়া নয়? পঁচিশ বছর পরে শ্রীলাকে পাওয়া? মিহিরের পক্ষে?

হিমাংশুর ওপর টেক্কা দেবার রোখ চেপেছিল কেন? কেন লাই দিয়েছিল সেই রোখকে?

বিয়ের খবর হিমাংশুকে জানায় নি। জানায়নি কারণ, রেজিস্ট্রি না হওয়া পর্যন্ত নিজেই কি ব্যাপারটা সত্যি বলে ভাবতে পারছিল।

বিয়ের পর ঠিক করেছিল বউকে নিয়ে একদিন হাওড়া চলে যাবে। বিনা নোটিশে ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে হাজির হবে। হিমাংশুকে তাক লাগিয়ে দেবে।

কিন্তু হিমাংশু যদি ভেবে বসে কোন মেয়েকে বউ সাজিয়ে নিয়ে এসেছে? অ্যামেচার কোন অভিনেত্রীকে? হিমাংশুর থিয়োরিটা মিথ্যে প্রমাণ করতে? হিমাংশুকে নিয়ে মজা করতে?

ভুলটা অবিশ্যি ভেঙে দেওয়া শক্ত হবে না, কিন্তু ওর মনে করাটাই কি অপমানজনক নয়? শ্রীলার সামনে ও রকম মনে করাটা?

তখন মতলব ভাঁজে হিমাংশুকে বাড়িতে একদিন নেমন্তন্ন করবে। অকুস্থলে এসে দেখে যাক রাসকেলটা প্রেম কাকে বলে। হাতেনাতে প্রেমের প্রমাণ পেয়ে যাক। সত্যিকারের প্রেমের। যে প্রেম গরীব বড়লোক মানে না। যে প্রেম অজর অমর অবিনশ্বর। তেইশ বছরের অদর্শনেও অম্লান যে প্রেম।

কিন্তু বাড়িতে নেমন্তন্ন করার আগে বাড়িটা বদলানো দরকার। শ্রীলার মত বউ দেখাতে ও বাড়িতে কোন বন্ধুকে নেমতন্ন করা যায় না। সাত ভাড়াটের এই বাড়িতে।

শ্রীলার ইসকুলের কাছাকাছি পছন্দসই একটা ফ্ল্যাট পেতে পেতে মাস আড়েক কেটে যায়।

তখন বেঁকে বসে শ্রীলা। ইসকুলে যাচ্ছে, যাচ্ছে। পুরনো ইসকুল, সবাই চেনাজানা। কিন্তু এই অবস্থায় মিহিরের কোন বন্ধুর সামনে সে বেরোতে পারবে না। হিমাংশুর সামনে তো নয়ই। যেমন মুখকাটা মানুষ! চোখে কখনও না দেখলেও শুনেছে তো!

তা অবিশ্যি। হিমাংশুর চোখের চাউনিটা এমনিতেই বড় ধারালো। তার ওপর ছোটলোকদের সাথে মিলে মিশে মুখেরও কোন লাগাম নেই। শ্রীলার মত মার্জিত রুচির মেয়ে—

যাক তবে আরও কটা মাস। নার্সিং হোম থেকে শ্রীলা ফিরেই আসুক। ম্যাডোনা হয়ে তখন সামনে দাঁড়াবে। সার্থক প্রেমের সার্থক বিয়ের মূর্তিমতী সাক্ষী হয়ে। হিমাংশু আর টুঁ শব্দটি করতে পারবে না।

এতদিন রাস্কেলটা অনেক লেকচার দিয়েছে। তেলে-জলে মিশ খায়না, গরীব-বড়লোকে প্রেম হয়না। টাকা আনা পাইয়ের কষ্টিপাথরেই—

হিমাংশুর কথাগুলিকে মিহিরও একদিন সত্যি বলেই ভাবত। হোক ম্যাট্রিক পাশ, এবং বয়েসে তার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট, তবু জীবনকে ও তার চেয়ে ঢের বেশি চেনে। হাড়ে হাড়ে জানে।

ঠিকই বলে হিমাংশু—তেলে-জলে মিশ খায়না। নইলে রাতারাতি সে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও শ্রীলা একটা খোঁজখবর নিল না?

মিহির বেঁচে না মরে কৌতুহলটাও জানাল না? ছাত্র-আন্দোলন নিয়ে এতই ব্যস্ত? প্রেমের চেয়ে পলিটিক্স বড়?

অথচ কে না জানে শ্রীলা মজুমদারের পলিটিক্স মিহিরের জন্যে। রায়বাহাদুর এস এন মজুমদারের নাতনী ও বারিস্টার আর কে মজুমদারের মেয়ে মিহিরকে ভালোবেসেই ছাত্র ফেডারেশনকে ভালোবেসেছে ছাত্র মহলে কে না জানে।

আর সেই শ্রীলা কিনা—

কোথায় মিহির আর কোথায় শ্রীলা! ইউনিভার্সিটির বাইরে দুজনের মাঝে এত ফারাক কে জানত? এমন আসমান জমিন ফারাক?

মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা আচমকা হার্টফেল করলে সংসারের সাজানো বাগান রাতারাতি শুকিয়ে যায় কে জানত?

বিধমা মা, সাত বোন পারুল, এক ভাই চম্পা।

শ্রীলা যে মোটরে আসত সেটা বেচলে তিনটি বোনের গতি হয়ে যায়। শ্রীলা যে শাড়ি পরে আসত তার দাম পনের দিনের বাজার খরচ।

হিমাংশু ঠিকই বলে। গরীব বড়লোকে প্রেম হয় না! হয় না! ও নেহাতই পোশাকী ব্যাপার।

ভাগ্যিস বাপের অফিসে চাকরিটা সংগে সংগে জুটে যায়। জীবনে একটি চুমো না খাওয়া হয়ে উঠলেও জীবন বহাল থাকে, কিন্তু পেটের খোরাক দিন কয়েক না মিললেই ফৌত। চুমোর চেয়ে ডাল-ভাত অনেক বেশি জরুরী। অনেক অনেক বেশি!

চারটি পারুল পার করা হলে মা মাঝে মাঝে বিয়ের কথা তুলত। সংগে সংগে বাকি তিনটির জন্যে দুর্ভাবনাটাও পেশ করে রাখত। সেই দুর্ভাবনা নিয়েই বাবার কাছে মা চলে যায়।

পঞ্চম পারুল নিজের বিয়ের পর দাদার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বাকি পারুল দুটি কিন্তু বৌদির হাতে আইবুড়ো বোনদের নাজেহাল হওয়ার নানান দৃষ্টান্ত দেয়। আড়ালেই দেয়, তবে দাদাকে শুনিয়ে শুনিয়ে।

ছোট পারুলের বিয়ের পর সাত পারুল অবিশ্যি চম্পাদাদার বিয়ের জন্যে কোরাস ধরে: এখন তো আর কেউ রইল না। বাড়ি খালি। কে দেখাশোনা করবে। দাদার নিজের মশারিটা পর্যন্ত দাদা—

'আমি মেসে চলে যাব।'

'মেসে চলে যাবে!' কোরাসে সাত পারুল চমকে ওঠে।

স্বাভাবিক। যুক্তিযুক্ত এই চমকানি। মিহিরের মেসে চলে যাওয়া মানে বাপের বাড়ির পাট উঠে যাওয়া।

বাপের আসল বাড়িটা যদিও অনেক আগেই গেছে, পারুলদের পারানি হিসেবে গেছে, তবু মিহির থাকলে ভাড়াটে বাড়ির এই ঘর দুখানা বজায় থাকবে। বিয়ে না করলেও রান্নাবান্নার একটা লোক মোতায়েন থাকবে।

নিজ নিজ সংসার নিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়লে বোনগুলি দিনকতক জিরোতে আসার জায়গা পাবে। মাঝে মাঝে জামাইগুলি সম্বন্ধীর ঘাড় ভেঙে চর্বচোষ্য মেরে যেতে পারবে। মামাবাড়ির মজার ভাঁড়ার ভাগেন-ভাগ্নিদের জন্যে মজুত থাকবে।

'তোমার যা খুঁতখুঁতি দাদা!'

'ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তুমি—'

'খেতে পারনা দাদা!'

'তোমার আবার আমাশার—'

'ধাত দাদা!'

'মেসে তোমার শরীর টিকবে না দাদা।'

'একেই ইদানীং তোমার শরীরটা—'

মিহির হেসে বলে, 'এবার গেলেই বাঁচি।'

'ষাট ষাট ষাট!'

'বয়েস কত হল জানিস?'

'হয়েছে, তোমায় আর কুঁড়তে হবে না।'

'তাই না তাই!'

'কী কথার ছিরি!

'এবার একটি বিয়ে কর দাদা।'

'হ্যাঁ দাদা।'

'দাদা!'

'এবার বিয়ে তোমায় করতেই—'

'বিয়ে?' মিহির ঠা ঠা করে হেসে ওঠে। 'এই বয়েসে বিয়ে?'

পারুলেরা কিন্তু যারপরনাই গম্ভীর। ব্যাটা ছেলের আবার বয়েস কী? পটাপট উদাহরণ দেয়—চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, প'য়ষট্টি, মায় সত্তরেও যারা টোপর পরেছে নামধাম তাদের মুখস্ত বলে চলে।

'সে তো অন্তর্জলী গিয়েও—'

'কী যা তা বলছ!'

বিয়ের বয়েস পেরিয়ে যায়নি, মিহিরও জানে। কিন্তু বিয়ে? বিয়েটা অ্যাদ্দিনে তামাদি হয়ে যায় নি? সাত সাতটা বোনের বিয়ের মাশুল জোগাতে মুলতুবি তার বিয়েটা?

বিয়ের কথা ভাবা দূরে থাক, ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর চোখ তুলে কোন মেয়ের দিকে তাকিয়েছে কখনো? সেই শ্রীলা মজুমদারের পরে—

'প্রেমে পড়োনি তো দাদা?'

প্রেম! হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। পরের বউ না হয়ে গেলে সেজর গালে ঠাস করে একটা চড়ই হয়ত কষিয়ে দিত।

'তাহলে অবিশ্যি বলার কিছু নেই। আমার বড় ভাশুরও—'

সেজর বড় ভাশুর এক বেজাত বিধবার প্রেমে পড়ে সারা জীবন বিয়েই করল না। অথচ ভালো চাকরি করে। সংসারেরই সব দেয়। দু ভাই, দু ভাইয়ের দুটি বউ আট দশটি ছেলেমেয়ের কাছে তার ভারি খাতির। সবাই ধন্য ধন্য করে তার প্রেমকে।

মিহিরও যদি অম্নি প্রেমে পড়ে বিয়ে না করে জীবন কাটায়—তার প্রেমকেও বোনেরা ধন্য ধন্য করবে?

মেসে চলে গেলেও করবে তো? প্রেমে পড়েও বিয়ে না-করা বাবদ ডিভিডেন্ড না পেলেও করবে কি?

ঠিকই বলে হিমাংশু। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্রেফ স্বার্থের। স্বার্থের স্বার্থের স্বার্থের।

তার জীবন-যৌবনের সমস্ত রস নিংড়ে নিয়ে ছিবড়ে করে ছেড়েছে, তবু রেহাই নেই। সম্পর্কের জের টেনে চলতেই হবে।

হিমাংশু যে বলে—

মোটরের হর্ণে মিহির আঁতকে ওঠে!

ড্রাইভার মুখ বার করে গাল দিয়ে চলে যায়।

রাসকেল ! দাঁতে দাঁতে ঘষে মিহির রাস্তা পেরোয়।

হিমাংশুটা একটা রাসকেল। ছোটলোক নিয়ে কাজ কারবার, চিন্তা ভাবনাও তাই ছোটলোকের মত। সব ব্যাপারেই এক যুক্তি। টাকা আনা পাইয়ের যুক্তি।

তেইশ বছর পরে শ্রীলার সাথে মেট্রোর সামনে হঠাৎ ওভাবে দেখা হয়ে গেছে, হিমাংশু বিশ্বাসই করবে না। বলবে এমন নাটুকে যোগাযোগ উপন্যাসে মানায়। তাও বাজার চালু উপন্যাসে। কিম্বা সিনেমায়। বোম্বাইয়া ফিল্মে।

যোগাযোগটা নাটকীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষের জন্মও কি মস্ত বড় একটা যোগাযোগের ঘটনা নয় ? রায় বাহাদুরের নাতনী ব্যারিস্টারের মেয়ে হয়ে শ্রীলার জন্মানোর মধ্যে কোন যুক্তি আছে ? অপূর্ব রায়ের ছেলে হয়ে মিহিরের জন্মানোর মধ্যেও ?

অসময়ে অপূর্ব রায়ের মরে যাওয়ার কোনো যুক্তি? গুতগুলি বোনের দাদা হওয়ার মিহিরের কোন যুক্তি ?

বাপের ছোট ছেলে, সংসারের ঝক্কিঝামেলা নেই। সারাটা জীবন হিমাংশু দিব্যি ইউনিয়ন করে কাটিয়ে ছিল। কিন্তু মিহিরের অবস্থা হলে কী করত ?

দেশকে মিহিরও কিছু কম ভালোবাসত না। দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে সে-ও চেয়েছিল। কিন্তু জন্মের ওই বিচ্ছিরি যোগাযোগের জের টানতেই না দেশের জন্যে ভালোবাসাটা খারিজ করে দিতে হল ?

শ্রীলার সাথে হঠাৎ দেখা হওয়ার নাটকীয় যোগাযোগটা হিমাংশু বিশ্বাস করবে না। আর তাই যদি না করে তবে তাকে দেখেই শ্রীলার চোখমুখ ঝল-মলিয়ে ওঠা, জোর করে তাকে রেস্তঁরায় নিয়ে যাওয়াটাও বিশ্বাস করবে না।

বিশ্বাস করবে না শ্রীলা তাকে আজও—

শ্রীলার কোন কথাই রাসকেলটা বিশ্বাস করবে না। শ্রীলার মত মেয়ে পলিটিকসের জন্যে বাড়ির সাথে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিল, দেশের জন্য জেল খেটেছিল, দেশ স্বাধীন হলে পলিটিকস ছেড়ে দেয়, ইস্কুলে মাস্টারি

নেয়—তবু আত্মমর্যাদা বজায় রেখে বাড়িতে আর ফিরে যায়নি—বিশ্বাসই করবে না হিমাংশু।

বিশ্বাস করবে না যে পলিটিকসের নেশায় মিহিরকে ভুলে গেলেও পলিটিকস ছাড়ার পর থেকে কেবলি তার মিহিরকে মনে পড়েছে। দিনের পর দিন মিহিরের দেখা পাওয়ার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে, রাতের পর রাত মিহিরকে স্বপন দেখেছে।

মিহিরের প্রতি অন্যায় করেছে বলে আজও শ্রীলার অনুতাপের অবধি নেই বিশ্বাস করবে না হিমাংশু।

কারণ শ্রীলা যে বড়লোকের মেয়ে! বড়লোকের মেয়ে কি গরীব ছেলেকে ভালোবাসতে পারে। ওদের চাকরি শখের চাকরি। মুখে যাই বলুক শ্রেণী স্বার্থ—

শ্রেণী স্বার্থ! যত্ত সব ধরতাই বুলি। তোদের পীর পয়গম্বর মার্কস-এংগেলস কোন্ প্রলেটারিয়েট ছিল রে? তোদের সুরে সুর মেলালে মহারাজ কুমারেরও শ্রেণী স্বার্থ উবে যায়? রাসকেল কাঁহাকা।

মানুষকে গরীব বড়লোকে ভাগ করার কোন মানে হয়? মানুষ, মানুষ। ভালো খারাপ সব মানুষের মধ্যেই আছে। বড়লোকেদের মধ্যে আছে, গরীবদের মধ্যেও আছে। বড়লোক মাত্রই শয়তান না, গরীব মাত্রেই যুধিষ্ঠির না।

এবং প্রেম হল গিয়ে সর্বত্রগামী। প্রেমের কাছে ছোট বড় উঁচু নিচু ভেদাভেদ নেই। থাকলে, পৃথিবীর তাবৎ কাব্য সাহিত্য বরবাদ হয়ে যেত। অনেক ইতিহাস মিথ্যে হয়ে যেত।

প্রেম মানুষের হৃদয়কে উদার করে। মনকে মহান করে। জীবনে বাঁচার প্রেরণা আনে প্রেম।

জীবনে প্রেম ছিল না বলেই না জীবনটাকে মিহিরের এতকাল বোঝা মনে হত। মায়ের পেটের বোনদের শত্রু মনে হত। অপিসের সহকর্মীদের দূরে দূরে রাখত। পৃথিবীটাকে কুৎসিৎ ভাবত।

আর আজ? সুন্দর সুন্দর। পৃথিবীর সবাই সুন্দর। পৃথিবীর সব কিছু সুন্দর।

এই সৌন্দর্যের স্রষ্টা প্রেম।

বেচারা হিমাংশু ! দুঃখ হয় ওটার জন্যে। সারাটা জীবন বনের মোষ তাড়িয়ে গেল। জীবনের রূপরস গন্ধবর্ণের কোন স্বাদই পেল না। তাই ওর মনটা অত স্থূল। বিকৃত।

হিমাংশুকে সে হাতে নাতে দেখিয়ে দেবে নারাণদার মত সেও—

বুক ধড়াসকরে ওঠে : বাচ্চা হতে গিয়ে নারাণদার বউটা মরার দাখিল হয়েছিল। টুকরো টুকরো বাচ্চা বের করে কোন মতে ডাক্তার তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

শ্রীলারও যদি অমি কিছু হয় ? নারাণদার বউয়েরই বয়সী তো। বাচ্চাকে হাজার টুকরো করেও বউ যদি না ফেরত পাওয়া যায় ?

তখন কি হিমাংশু আর বিশ্বাস করবে ? ম্যারেজ রেজিস্টারের সার্টিফিকেট খানা মেহগিনির ফ্রেমে বাঁধিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেও করবে বিশ্বাস ?

বিয়েটা হয়ত করবে, কিন্ত এই পঁচিশ বছরের প্রেমের কথা ? এই ডটার অব আর কে মজুমদার যে বিরাট বড়লোক ব্যারিস্টারের মেয়ে রায়বাহাদুরের নাতনী ইউনিভার্সিটির সেই কুইন অব লাভ অ্যাণ্ড বিউটি শ্রীলা মজুমদার, তা ও তো সার্টিফিকেটে লেখা থাকবে না।

চাই কি, ও সার্টিফিকেট হয়ত মিহিরের বিরুদ্ধেই যাবে। হিমাংশু ধরে নেবে মাঝ বয়সে বিয়ের জন্যে দিশেহারা হয়ে মিহির বিয়াল্লিশ বছরের এক বুড়ীকে বিয়ে করে বসে। মা হতে গিয়ে সেই বুড়ী টেঁসে গেছে। মান বাঁচাতে দিব্যি এক প্রেমের গল্প ফেঁদে বসেছে।

সারাটা জীবন হিমাংশু তাহলে ··

মিহির ট্যাক্সি ডেকে বসে।

চারটের আরও আধ ঘণ্টা, কিন্তু মিহিরের আর তার সয় না।

'কত ?'

'দেড় টাকা'।

ট্যাক্সিওয়ালার হাতে দু টাকার একটা নোট গুজে দিয়েই হন হন করে এগোয়।

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙে।

দোতলায় সিঁড়ির মুখেই ডক্টর সেনের সঙ্গে দেখা।

'ডক্টর সেন!'

'এই যে মিস্টার রায়। ভেরি গুড নিউজ। এই মাত্র—'

'ও কেমন আছে ডক্টর সেন? ও কেমন—'

'নাউ ইউ আর প্রাউড ফাদার অব এ বোনি সন। কনগ্র্যাচুলেশনস্!'

'ও কেমন—'

'কোয়াইট ওকে। আপনি বড্ড নার্ভাস মশায়।'

'মানে—বেশি বয়েসে কিনা—' মিহির লজ্জা লজ্জা হাসে।

'তাতে কি!'

'মানে' – হাসির মাত্রা বাড়ায়। 'লোক বলে বেশি বয়েসে মা হওয়া—'

'সে তো ফার্স্ট ডেলিভারি হলে।'

'আজ্ঞে' হাসি থমকে যায়।

'বলছি বেশি বয়সে প্রথম ছেলেমেয়ে হওয়া রিস্ক। কিন্তু মিসেস রায় তো—'

'আজ্ঞে!' হাসিটা মুখোশ হয়ে মিহিরের মুখে এঁটে বসে।

খসড়া প্রস্তাব

ফেরা মাত্র গালাগালির চোটে ব্যাটার বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে বলে সকাল থেকে দমভর মহড়া দিতে থাকলেও কুলগাছের গোড়ায় হাসিমুখ ব্যাটাকে দেখা মাত্র পাছা থেকে পিঁড়িটা খুলে নিয়ে তেড়েমেরে ছুঁড়ে মারতে গিয়ে নিজেই বাপটা দাওয়া থেকে পড়ে মরে যায়।

হঠাৎ-উত্তেজনার ধাক্কায় না হাত-দুই-উঁচু-দাওয়া-থেকে-আচমকা-পড়ে-যাওয়ার চোটে প্রাণটা রসিকের বেরিয়ে গেল সুনীল তাপসরা সেই তকরারে জয়হিন্দ কেবিন সরগরম করে, ঘরের মধ্যে শ্বশুরের তরে নয়ন কাঁদে বিনিয়ে বিনিয়ে, ভাইপোকে দুর্দম শাপশাপান্তর মাঝে থেকে থেকে নিস্তার ডুকরে ওঠে।

আর কাঠের ঘাটতিতে আধপোড়া বাপকে খালের জিম্মা করে দিয়ে এসে ভোলাকে পাশে নিয়ে কুলগাছের গোড়ায় ন্যাড়া হয়ে থাকে গুম।

মরে গেল! বাপটা মোর মরে গেল!

নব্বুই বস্তা চাল ধরা সত্ত্বেও খালি পেটে মরে গেল!

খালি পেটে বাপের মরে যাওয়ার দরুন আপসোসের কারণ আছে দস্তুরমত।

খবর শুনেই দোকানের ঝাঁপ ফেলে দৌড় দিয়েছিল।

দেবে না দৌড়? বাজারে এক দানা চাল নেই আর সাধু মোড়লের বাড়ি মন মন মজুত শুনলে দেবে না!

বাবুদের সাথে রাতভর বাড়ি আগলেছে। জিন্দাবাদ-মুর্দাবাদ করে তাড়িয়েছে।

এদিকে তার আশায় আশায় বাপটা ঘরবার করেছে রাতভর।

করবে না ঘরবার? শাকপাতা গিলে হাগার রোগ বাধিয়ে উপোস করে থেকে হঠাৎ যদি শোনে ব্যাটা হদিশ পেয়েছে মন মন চালের তামাদি খিদেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না!

আর সেই চাল কিনা—

ইকি কাণ্ড বিল্টু ?

মাইরি ! কাণ্ডের কোন কিনারাও বিল্টুও পায় না।

চাল ধরেও ফল হলনি !

মাইরি !

বাপটা মোর খালি পেটে মরে গেল !

মাইরি !

ঝাঁপ দোকানের ফেলাই থাকে।

ভোলাকে সাথে নিয়ে ন্যাড়া সারা বাজার টহল দিয়ে ইস্টিশনে গিয়ে হাজির হয়।

মানকে ! চাল ধরেও—

তখুনি বলেছিনু বাবুদের তালে নাচিসনি। সওয়ারি সেজে বিড়ি ফুঁকছিল, রিকশা থেকে নেমে সবে-ধরানো বিড়িটা মানিক এগিয়ে ধরে।

বস্তা বস্তা চাল—

বেল পাকলে কাগের কী ! ন্যাড়া হাত না-বাড়ানোয় বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলেই 'যাঃ সালা !" বলে ক'কিয়ে ওঠে।

বাপটা মোর খালি পেটে—

কপাল ! কপাল ! ধুলো ঝাড়ার ছলে সিটকে কষে থাপ্পড় হাঁকায়।

নব্বুই বস্তা চাল। এক বস্তায় যদি দু মন থাকে তাহলে হল গিয়ে একশো আশি মন। একশো আশি মন মানে কত সের ? কত পোয়া ?

মোদের যদি সেরটাক করেও দিত পতিতদা !

অডার নেই যে !

একপো করে দিলেও—

অডার নেই যে !

বাপটা মোর খালি পেটে—

চ্ চ্ চ্ চ্ !

ন-খুড়ো, বাপটা মোর খালি পেটে—

বেঁচে গেল বাবা বেঁচে গেল !

বাপটা মোর খালি পেটে মরে গেল বটাদা !

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলি !

নব্বুই বস্তা চাল ফস্কে যাওয়ায় হাভাতে মানুষগুলোর কারো ধাঁধা লাগে, কেউ দেয় কপালের দোষ, কেউ পাড়ে অর্ডারের দোহাই।

কারো আপসোস জাগে রসিকের মরে বেঁচে যাওয়ার জন্যে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলার জন্যে কারো।

কিন্তু মনটা ন্যাড়ার কোন-কিছুতেই বুঝ মানে না।

বাপটা মোর খালি পেটে মরে গেল! খালি পেটে মরে গেল!

বেয়াড়া হিক্কার মত কথাটা তাকে উস্তনকুস্তন করে।

সুনীলবাবু—

ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝছ না ন্যাড়া। চাল ধরলেই যে—

তাপসবাবু—

সুনীল ঠিকই বলেছে ন্যাড়া। মজুত উদ্ধার মানে তো—

অমলবাবু—

আশ্চর্য! তুমি কেন শুধু এই গাঁয়ের কথা—

বাপটা মোর খালি পেটে মরে গেল বাবু!

চা খাওয়া মুলতুবি রেখে বাবুগুলি চোখমুখ প্রাণপণে করুণ করে তোলে।

সরকার বদল হলেও আইনকানুন বদলে যায়নি, বাবুরা সমঝে দিয়েছিল, ও চাল সুতরাং ছোঁয়ার এখতিয়ার নেই। যদি টের পাও বস্তা বস্তা চাল পুকুরে পায়খানায় পাতকুয়োয় পাচার হয়ে যাচ্ছে তবু কিছু করা হবে আইনের বরখেলাপ।

সন্ধেবেলা পুলিশকে খবর দিয়েও তাই শেষ রাত অব্দি বাড়ি ঘিরে থাকতে হয়। হা-পিত্যেশ করে থাকতে হয়।

দু মাইল দূরে থানা। কম দূর!

আইন মোতাবেক গোরুর গাড়িতে চালের বস্তা উঠলে দূর থেকে দ্যাখো আর জিন্দাবাদ-মুর্দাবাদ করে গলা ফাটাও।

পরের দিন যে থানা থেকে লরি বোঝাই হয়ে চাল চলে যায় তাও ষোল আনা আইন মোতাবেক।

সাধুমোড়ল মুর্দাবাদ! খাদ্য কমিটি জিন্দাবাদ!

বাপটা মোর—। লরি আড়াল হতে ন্যাড়া গুমরে ওঠে। ভোলাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে থাকে

সরকার বদলের পরেও ফোঁপানো ?

বাবুবৃন্দ বেকুব বনলেও ন্যাড়া অনর্গল ফোঁপায়।

গুয়োর ব্যাটা ! দোকান লাটে তোলার মতলব !

পিসি ! বাপটা মোর খালি পেটে—

তোর মত সুপুত্তুর—

মোরাও মরব। অমন সোয়ামি যার—

নয়ন !

থাক থাক আর মুখ নেড়নি !

বাপটা মোর—

ঢং ! ব্যাটাছেলের ঢং দেখলে—

কাঁচা শোকটা দগদগিয়ে ওঠায় নিস্তার পিছু হটলেও নয়ন হামলে পড়ে।

বাপটা মোর—মানকে !

ধেত্তোর ! ওদিকে সাধু মোড়ল বেকসুর শুনিচিস ?

আইন মোতাবেক সাধু মোড়ল বারবাড়ির মালিক নয়। গাঁয়ে কখনো পা না দিলেও আইন মোতাবেক মালিক মেজকর্তা।

বারবাড়িতে মজুত চালের জন্যে মেজকর্তাই দায়ী আইন মোতাবেক।

এখন যা হবে আইন মোতাবেক।

সরকার বদল হলেও আইনকানুন তো বদলে যায়নি। অতএব—

সুনীলকে থামিয়ে দিয়ে তাপস বলে, যুক্তফ্রণ্ট বলে তবু রক্ষে। কংগ্রেস থাকলে—

তাপসকে থামিয়ে দিয়ে অমল বলে, তুমি নাকি নাওয়াখাওয়া—

অমলকে থামিয়ে দিয়ে নিশীথ বলে, চা খাবে ন্যাড়া চা খাবে ? সেই সাথে—

নিশীথকে থামিয়ে দিয়ে অনুপম বলে, কুকুরটাকে নিয়ে সব সময় ঘোরো কেন। এই সব স্ট্রিট ডগ—

অনুপমকে থামিয়ে দিয়ে মনোতোষ বলে, তুমি নাকি দোকান খুলছ না ? তোমার পিসি বলছিল—

বাপটা মোর—

মরা মানুষ তো ফিরে আসবে না ভাই! কোরাসে সবাই বলে।

বাপটা মোর খালি পেটে—

সিঙ্গাড়া খাবে?

একেই ভাই, তার ওপর সিঙ্গাড়া!

জয়হিন্দ কেবিন থেকে লাফ দিয়ে ন্যাড়া হনহনিয়ে হাঁটা শুরু করে।

খালপাড়ে চাঁদু এক ঠোঙা মুড়ি তেলেভাজা নিয়ে গিয়েছিল।

বেগুনিতে কামড় দিয়েই খেয়াল হয় খালি পেটে বাপটা চলে যাচ্ছে। জন্মের মত চলে যাচ্ছে!

চটপট উঠে গিয়ে চিতাকে ঠোঙাটা ধরে দেয়।

পরশু উনোনই ধরেনি।

কাল গমভুষির রুটি দিয়ে হবিষ্যি করতে বসে প্রথম গেরাস তুলতে গিয়েই আঁতকে ওঠে—

এই দাওয়া থেকে পড়েই না বাপটা মরে গেছে? চোখের সামনে মরে গেছে! খালি পেটে মরে গেছে!

পেটে পাক দিলে থুতু তৈরি করে কোঁৎ কোঁৎ করে গেলে।

তোর খিদে পেয়েছে ভোলা?

আদরে ভোলা লেজ নাড়ে।

তুই মোর ব্যাটা ভোলা।

কুঁই কুঁই কুঁই! ভোলা মুন্ডু দোলায়।

বাপটা মোর খালি পেটে মরেছে ভোলা। আম্মো তাই খাচ্ছিনি। তোকেও খেতে দিবুনি।

জিভ লকলকিয়ে ভোলা গা চাটতে আসে।

কিন্তুক তুমি বানচোৎ খাওয়ার তরে ছোঁক ছোঁক করছ। নন্দীদের আস্তাকুঁড়ে কাল কেন সেঁইধেছিলি?

দুম করে এক লাথি কষিয়ে ভোলাকে ছিটকে দিয়েই ন্যাড়া হায় হায় করে ওঠে।

বাপ হয়ে ব্যাটাকে লাথি মারল? না খাইয়ে রেখে লাথি মারল!

ভোলাকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে তার মুখ ঘষে।

ভেবেছিস কী ? বলি কী ভেবেছিস ?

ভোলার পেটে হাত বুলোতে বুলোতে দাওয়ায় বসে খালি পেটে বাপের মরার কথা ভাবছিল, ঘাড়ে নিস্তার রুদ্দা মারায় খুঁটি আঁকড়ে পড়া সামলায়।

এই দাওয়া থেকে খালি পেটে পড়ে বাপ মরে গেছে। ব্যাটার মরণও সেই ভাবে ?

নব্বুই বস্তা চাল ধরেও খালি পেটে মরে যাবে ? বাপ ব্যাটা দুজনেই ? অথর্ব বাপ জোয়ান ব্যাটা দুজনেই ?

পিসি !

বাপ যেন আর কারুর—

তুই থাম বৌ। নজ্জা করে না শাউড়ির সামনে সোয়ামিকে চোপা করতে ! নয়নকে চোটপাট করে ঢিমে তালে নিস্তার বলে শোন বাছা, চাদ্দিন উনুন জ্বলছেনি—

পিসি !

মতিকগতিক তোর ভালো নয়। বাপ খালি পেটে মরেছে বলে মোদেরও না খাইয়ে মারবি ?

পিসি !

না খেয়ে মরতে পারবুনি। বউকে বাপের বাড়ি পাঠ্যে—

বাপের বাড়ি পাঠ্যে ! মরে যাই !

বৌ !

বাপকে গে বলব সোয়ামি খাওয়াতে পারলানি বলে এনু ? বাপ মোর নবাববাদশা ?

তালে তুইও চ কলকেতা।

কলকাতা ! তড়াক করে ন্যাড়া উঠে দাঁড়ায়। তোমরা কলকেতা যাবে পিসি ?

পেটের দায়ে—

কলকাতায় রেশন আছে। বাঁধা দরে হপ্তায় হপ্তায় চাল মেলে গম মেলে। কলকাতা বলে কথা ! দেশের মাথা কলকাতা !

সেই কলকাতার রেশনে নাকি টান পড়েছে। নব্বুই বস্তা চাল নিয়ে লরি দুটো কি তাই কলকাতার পথে পাড়ি দিল ?

সুনীলবাবুরা কি তবে কলকাতার দালাল? কলকাতাকে ভরপেট খাওয়াতে আমাদের দিয়ে চাল ধরাল? আমাদের খালি পেটে রেখে কলকাতায় চাল পাঠিয়ে দিল?

বাবুরা তবে কলকাতার আড়কাঠি?

চাল জোগাবার মেয়েছেলে যোগান দেওয়ার আড়কাঠি?

ও বছর পেট ভরাতে কলকাতা গিয়ে চাষী পাড়ার দুটো আইবুড়ো মেয়ে আর একটা বউ পেট বাধিয়ে ফিরে আসে সুনীলবাবুদেরই গ্যাঁড়াকলে?

মতলব বোঝা ভার বাবুদের। নয়নকে নিয়ে কলকাতার বাবুদের ফুর্তি করার তাগদ বাড়িয়ে দিতেই গাঁয়ের বাবুরা আগে ভাগে চাল পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা বোঝা ভার!

খবদ্দার কেউ কলকাতা—

বুক চিতিয়ে ন্যাড়া গর্জে উঠতে চায়. বিষম খেয়ে বুক খামচে ধরে।

বাবুদের হদিশ পাওয়া দুষ্কর।

চাল চাল করে হামলায় আবার চার-পাঁচ টাকা সের চাল কিনেও খায়।

মেয়ের বিয়েতে মাথায় হাত দিলেও লুচি-পোলাও ঠিকই খাওয়ায়। বউয়ের গয়না বেচে খাওয়ায়। জমিজিরেত বেচে খাওয়ায়। ধার করে খাওয়ায়।

বেচার কত গয়না থাকে বাবুদের বউদের। বেচার মত বাপকেলে জমি জিরেত থাকে। ধার দেওয়ার মত লোকজন থাকে।

বাবুদের সাথে তুলনা?

সাধু মোড়ল মুর্দাবাদ করে করে বাবুরা গলা চিরে ফেলে আবার সামনাসামনি দেখা হলে সাধুদা সাধুজ্যাঠা সাধুকাকা মোড়ল মশায় বলে গদগদ হয়ে ওঠে। ভদ্রলোক যে! বাবুরাও ভদ্রলোক যে!

গাঁয়ের গরিবগুর্বোকে ভাতে মারছে যে মানুষটা সে এখন তাই দিব্যি মাথা উঁচিয়ে বেড়ায়। আদালতে কচু হবে বলে বড়াই করে বেড়ায়।

বাবুরা কিন্তু আদালতের ভরসা দিয়ে চলেছে একনাগাড়ে।

নিজেকে ন্যাড়ার মনে হয় বড়ই কোণঠাসা।

বউ পিসি তাকে বোঝে না। বাবুদের সে বোঝে না। মানকেরা যে-যার ধান্ধায়।

নিজেকে বোঝাতে না পারার, পরকে বুঝতে না পারার, দলছুট হয়ে পড়ার তেমুখো টানাটানিতে হিমশিম খেতে খেতে নিজের ওপর জাগে অকথ্য আক্রোশ। পাঁচ দিনের হন্যে খিদেটা আক্রোশকে করে তোলে দিশেহারা। সাধু মোড়লের পুকুরে চাল; সাধুমোড়লের পাতকুয়োয় চাল। সাধু মোড়লের পায়খানায় চাল।

আর বাপটা মোর—

পুকুরে পাতকুয়োয় পায়খানায় বস্তা বস্তা চাল পচছে অথচ—

ভোলা! ভোলা! ভোলা!

কুঁই!

পুকুর থেকে একটা বস্তা গায়েব করার মতলবে ভোলাকে নিয়ে বাঁশবাগানের দিক দিয়ে ঢুকেছিল।

ঘাটে ছিপ-হাতে সাধু মোড়লকে পুকুর পাহারা দিতে দেখে লোকটার পা জড়িয়ে ধরে মাপ চেয়ে নিয়ে সেরটাক চাল ভিক্ষে চাইবে ভাবতে ভাবতে গুটি গুটি এগিয়েছিল।

কিন্তু হাত কয়েক পিছনে এসে সাধু মোড়লের ঘাড়েগর্দানে নধর দেহটি দেখেই ন্যাড়া করে-কি আচমকা গোরুবাঁধা খোঁটাটা তুলে নিয়ে দুহাতে প্রাণের সাধে আচ্ছাসে তার মাথায় এক বাড়ি হাঁকড়ায়:

তাল-পড়া একটা শব্দ হয়। ঝপাস করে একটা শব্দ হয়।

গল গল করে রঙ বদলায় ঘাটের জল।

তোলপাড় করে। বিশ-পঁচিশটা কাতলা যেন ডাঙায় ওঠার তরে দাপাদাপি লাগায়।

বাড়িটা তবে পুরোপুরি মজবুত হয়নি? পাঁচদিনের উপোসী বলে যুৎসই হয়নি?

সাতাশ বছরের জোয়ান হওয়া সত্ত্বেও—

খোঁটা ফেলে দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এক পা গলায় এক পা দাবনায় রেখে সাধুমোড়লকে জলের মধ্যে ঠেসে ধরে।

ঘেউ! ঘেউ! ঘেউ!

ভোলার ডাক শুনে তার ছটফটানি দেখে উবু হয়ে সাধু মোড়লের বিচি দুটো উপড়ে এনে ছুঁড়ে দেয়।

নে। খা।

অশ্লীল

চেনাচেনা, এত চেনাচেনা, এত বেশি চেনাচেনা মনে হচ্ছে—অথচ করে, কোথায়, কী উপলক্ষে দেখেছে কিছুতেই সত্যসুন্দর ঠাওর করে উঠতে পারে না। তাই গলায় কাঁটা বেঁধার মত অকথ্য একটা অস্বস্তিতে মনে মনে সে ছটফটায়। আঁতিপাতি করে অতীত হাতড়ায়ঃ কে? কে এই মেয়ে?

'আপনার কাজের বড্ড ক্ষতি করলুম। লেখার সময় আসাটা—'

অন্য সময় হলে রাখালের এই ন্যাকামিতে গা জ্বলে যেতঃ কাজের ক্ষতি করলুম। জাঁকিয়ে বসে ভদ্র বুলি কপচানো! সত্যসুন্দর কি প্রথমেই বলে পাঠায়নি যে সে এখন ব্যস্ত? তা সত্বেও সাক্ষাৎকারের আর্জি জানিয়েছিল কেন? জরুরী প্রয়োজন বলে?

কিন্তু গা জ্বলে যাবে কি সত্যসুন্দরের এখন পাগল হবার জো। লেখা কাগজগুলোয় পেজ মার্ক দিতে দিতে গুছোয় আর আড়ে আড়ে তাকায় একবার রাখাল একবার তার বউয়ের দিকে। তাকায় অবশ্য উদাস চোখেই, শিল্পীজনোচিত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে।

'পুজোর সময় আপনার যা ডিমাণ্ড!' আপ্যায়নের সুরে রাখাল বলে 'এখন প্রতিটি মিনিট—'

সত্যসুন্দরের ইচ্ছে হয় বলে, দাঁত বার করে যাই বলো কথাটা ষোল আনা সত্যি। তোমাদের কাছে চরম রিয়াকশনারি হলেও সারা বাংলা আজো সত্যসুন্দরকে চায়। নেহাৎ চক্ষুলজ্জায় তোমরা আসতে পারোনা, কিন্তু পুজোর মরশুমে আদর্শবাদের বুকনি তোমরাও শিকেয় তুলে রাখ। পুজো সংখ্যায় যা সব লেখা তোমার ছাপ! যাদের লেখা ছাপ!

ইচ্ছেটা মনে ঘাই দিয়ে উঠলেও মুখ ফুটে কিছু বলেনা সত্যসুন্দরঃ সত্যসুন্দর চাটুয্যে হেন মানুষের মুখে কি এরকম কথা মানায়? বলা সাজে? প্রাকৃত জনের মত কথা কইতে পারে সত্যসুন্দর? ছিঃ!

তাছাড়া, কাজের ক্ষতি করছে শুনলে রাখাল যদি 'আজ তবে আসি

দাদা' বলে বউ নিয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে যায়? সমস্যাটার কিনারা তাহলে হবে না। এবং তা না হলে লেখারও বেজে যাবে বারোটা।

'কাজ তো সব সময়েই আছে রে।' স্বর্গীয় হাসি হাসে সত্যসুন্দর, 'কাজ আর কাজ, ভগবান কাজের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। জীবন মানেই কর্ম, কর্মহীনতাই মৃত্যু। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—' বলতে বলতে লেখা কাগজপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে সিগারেটের টিনটা তুলে নেয়, 'কাজ থাক এখন। তোর খবর কি বল? অনেকদিন পরে এলি। অবশ্য এ-বাড়ি তোদের কাছে আউট অব বাউন্ডস—'

'না না ওকি বলছেন দাদা।'

'বলি কি সাধে রে! তোদের পার্টি—যাকগে নতুন কি লিখছিস? অনেকদিন তোর লেখা দেখিনা। বড় কিছুতে হাত দিয়েছিস নাকি? ইদানীং যা রেওয়াজ হয়েছে—'

রাখাল বাধা দিয়ে বলে, 'লেখাটেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি দাদা।'

'ছেড়ে দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'হুম।' বুক ভরে সিগারেটের ধোঁয়া নেয় সত্যসুন্দর। তারপর নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, 'এই হয়! এই হয়! রাজনীতি এই ভাবেই সাহিত্যকে গ্রাস করে। নইলে তোর যা হাত ছিল—'

রাখাল বলে, 'রাজনীতি করেও দিব্যি সাহিত্য করা যায় দাদা। আর রাজনীতি বর্জনের রাজনীতি করতে পারলে তো সোনায় সোহাগা।'

সত্যসুন্দর গুম হয়ে যায়।

'তা আমি সাহিত্য ও রাজনীতি দুই-ই ছেড়ে দিয়েছি।'

মনে মনে রাখালের মুন্ডপাত করে সত্যসুন্দর: সাহিত্য ও রাজনীতি দুই ছেড়ে দিয়েছিস বটে কিন্তু মনটা তোর আদৌ বদলায়নি। নইলে বাড়ি বয়ে এসে খোঁচা দিয়ে কথা? তোর দাদারা যা কাগজে কলমে বলে তুই কিনা তা মুখের ওপর বলতে সাহস পাস?

'দেখলাম', হালকা সুরে রাখাল বলে, 'সবকিছুরই একটা সীমা আছে, তার বাইরে যাওয়া উচিত নয়। আমার লেখার যেটুকু ক্ষমতা ছিল শেষ হয়ে গেছে, রাজনীতি করার সামর্থ্যও। অবশ্য পেশাদার লেখক হলে

স্মৃতির জাবর কেটে বাকি জীবনটা বেশ চালাতে পারতুম। কিন্তু সে আমার ধাতে সইল না। তাই বিয়ে-সাদী করে সংসারে মন দিলাম। বুদ্ধিমানের মত কাজ করিনি, দাদা ?'

হারামজাদা! কাষ্ঠহাসি হেসে দেয় সত্যসুন্দর। মেয়েটির দিকে মুখ ফেরায়।

মেয়েটি এতক্ষণ সত্যসুন্দরের দিকেই চেয়ে ছিল, এবার দেওয়ালে গান্ধীজীর দিকে চোখ মেলে দেয়।

ওকি! সত্যসুন্দর চমক খায়ঃ তিল? বাঁ গালে তিল! অতি পরিচিত—অতি পরিচিত—কিন্তু—

মুখের আদল, চোখ-নাক-মুখ, তারপর ওই তিল! এখন আর শুধু চেনা চেনা নয়, মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই চেনে। ভালো করেই চেনে। কিন্তু কবে, কোথায় কী উপলক্ষে—

গলায় কাঁটা বেঁধা সেই অস্বস্তিটা ফের চাড়া দিয়ে ওঠে। যে-সত্যসুন্দর কোন্ শিশুকালে তিলের নাড়ু কামড়াতে গিয়ে জিভে কামড় খাওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার হুবহু বর্ণনা দিয়ে আত্মজীবনীর পাক্কা একটি ফর্মা ভরিয়েছে সে কিনা আজ—

আত্মগ্লানিতে সত্যসুন্দরের মন ভরে যায়। ভাবে, তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়, ঘরের মধ্যেই চরকির মত ঘুরপাক খায়, পটাপট মাথার কয়েকটা চুল ছিঁড়ে ফেলে কিম্বা কোন অজুহাতে গিন্নির সাথে ঝগড়া বাধায়, কি ছেলেমেয়েদের বকাঝকা করে বাড়ি মাথায় তোলে। নিদেন ছোকরা চাকরটার পিঠে অন্তত ঘা কয়েক হাঁকিয়ে দেয়। তবে যদি—

কিন্তু উঁহু, গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে সমস্যার সমাধান ওভাবে হলেও রক্ত-মাংসের এই মেয়েটির ক্ষেত্রে কি প্রক্রিয়াটা কার্যকরী হবে? না অমন নাটকীয়তা এখন সম্ভব সত্যসুন্দরের?

বারেক মেয়েটির দিকে তাকায় সত্যসুন্দর—গান্ধীজীর বদলে এখন অরবিন্দের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। এরপর বুদ্ধদেবের পালা। বুদ্ধদেবের পর বাকি মহাপুরুষদের।

মহাপুরুষ দর্শন সাঙ্গ হলে চারপাশের আলমারি বোঝাই বই, আলমারির মাথায় পোড়ামাটির পুতুল।

কস্তুত দুহাত দূরের সত্যসুন্দর ছাড়া ঘরের সব কিছুই এখন ওর দ্রষ্টব্য হয়ে উঠবে। হাতল-ভাঙা ধূপদানিটাকে পর্যন্ত আশ্চর্য এক কিওরিও ভেবে বসবে।

তাই হয়। সত্যসুন্দর জানে, এই স্বাভাবিক। দর্শনার্থীরা এই ঘরে ঢুকেই অভিভূত হয়ে পড়ে। এমনিতে সত্যসুন্দরের চেহারা অতি সাধারণ, কিন্তু জানলা-দরজা বন্ধ ঘরে শেড দেওয়া আলোয় ফ্যানের একটা কিচমিচ আওয়াজে আর ধূপের ধোঁয়ায়, পরণে গেরুয়া লুঙি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, উলঙ্গ উর্ধাঙ্গে যজ্ঞোপবীতের বেষ্টনী, বাহুমূলে সোনার তাবিজ ও মাদুলীর তোড়া—সত্যসুন্দরকে আরেক জগতের অধিবাসী বলে মনে হয়।

হতেই হবে। কেননা বাইরে বাধ্য হয়ে আধুনিকতার ভেক ধারণ করতে হলেও ব্যক্তিগত জীবনে সত্যসুন্দর আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয় আদর্শের পূজারী। শুধু তাঁর বই পড়ে নয় চাক্ষুষ তাঁকে দেখেও এর প্রমাণ সকলে পাক। পেয়ে আরও বেশী তাঁর লেখার ভক্ত হোক।

তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেলেও—যে-রকম বাতে ধরেছে বন্ধ একদিন হবেই, সাহিত্যাচার্য বলে দেশবাসী যেন মাথায় করে রাখে। এই সত্যসুন্দরের অন্তিম কামনা।

মেয়েটি তেমনি মুখ ফিরিয়ে আছে। যেচে কথা না বললে কথা ও বলবে না। ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে, যাওয়ার সময়েও নিঃশব্দে প্রণাম করে চলে যাবে। বড় জোর সেকেণ্ড কয়েক বেশী সময় পা ছুঁয়ে থাকবে। সত্যসুন্দর জানে, মেয়েরা ভারি নার্ভাস! বড্ড লাজুক অথচ প্রতিভা সম্পর্কে কৌতুহল ওদেরই সীমাহীন। চিঠিপত্রে ওরা বেহদ্দ বাচালতা করতে পারে কিন্তু সামনা সামনি বোবা হয়ে যায়।

'তোমার নাম কী মা,' সত্যসুন্দর গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে।

মেয়েটি মুখ ফেরায়। কিন্তু তার হয়ে জবাব দেয় রাখাল।

'সুচরিতা।'

'সুচরিতা! বাঃ, সুন্দর নাম! এই নামটি গুরুদেবের বড় প্রিয় ছিল। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—

কথার খেই হারিয়ে ফেলে সত্যসুন্দর: সুচরিতা? কই, জীবনেও এই নামের কোন মেয়ের সান্নিধ্যে এসেছে বলে তো মনে পড়ে না। অথচ—

'নামটা আমি দিয়েছি দাদা।' রাখাল আগ্‌বাড়িয়ে বলে, 'বিয়ের আগে অন্য নাম ছিল।'

সত্যসুন্দর বলে, 'বিয়ে হলে মেয়েদের পদবী বদলায় জানি, কিন্তু তুমি—'

'তেমন তেমন বিয়েতে সব কিছু বদলায় দাদা।' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসে রাখাল।

দুই চোখে তীব্র ভৎর্সনা হেনে মুখ নীচু করে সুচরিতা।

এবং রাখালের বেহায়াপনায় আগাপাশতলা রী রী করে ওঠে সত্য-সুন্দরের: লাভ করে বিয়ে করেছে, হয়ত অসবর্ণ বিয়ে—কিন্তু কী ভীষণ ভয়ংকর এক বাহাদুরীর ব্যাপার যেন! দেশের চিরন্তন রীতিনীতি ভাঙা যেন মহা গৌরবের কাজ। সাধেই কি দেশের লোক ওদের দেশদ্রোহী বলে! অনাচার ও উচ্ছৃংখলতা ওদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

তা ছাড়া, লেখক সুবাদে না হয় দাদা বলেই ডাকে, কিন্তু বয়সে রাখাল তার ছেলের বয়সী নয়? সাহিত্য আলোচনায় প্রেম নিয়ে, নরনারীর যৌন সম্পর্ক নিয়ে বেপরোয়া বাক্যালাপ চললেও বাস্তবে তার জের টানা উচিত? নাকি ওরা জীবন ও সাহিত্যকে অভিন্ন মনে করে বলেই এই বেলেল্লাপনা? নাকি বেলেল্লাপনার সুবিধের জন্যেই জীবন ও সাহিত্যকে অভিন্ন মনে করা? সত্য শিব সুন্দরের শুধু মাত্র কদর্থ সত্যকে মাথায় তুলে নাচার নামই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা?

মনে মনে গজরায় সত্যসুন্দর, সিগারেটে মুহুর্মুহু টান দিতে দিতে।

মনে মনে গজরানো ছাড়া উপায়ই বা কী! মুখ খুললেই রাখাল তর্ক ফেঁদে বসবে। তর্কে ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা দুষ্কর। যুক্তি ছাড়া যারা কিছু মানে না—

'ও আপনার লেখার ভীষণ ভক্ত দাদা।'

'তাই নাকি!' সত্যসুন্দর দেখন-হাসি হাসে: তার লেখার ভক্ত হওয়াটা তাজ্জব খবর। মাসান্তে যার বইয়ের এডিশন হয়, দিল্লির কর্তারা যাকে সমীহ করে, দেশবিদেশে হর্দম যার অনুবাদ হচ্ছে—রাখাল তালুকদারের বউও তার লেখার ভক্ত! তবে আর কি—সত্যসুন্দরের চোদ্দ পুরুষ এতে উদ্ধার হয়ে গেল!

'কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে ওর একটা নালিশ আছে দাদা।'

'থাকবে বই কি!' হও আমার লেখার ভক্ত, ভীষণ ভক্ত কিন্তু রাখাল তালুকদারের বউ বলেই না? অতএব নালিশ আমার বিরুদ্ধে অবশ্যই থাকবে। না থাকলেও গজিয়ে উঠবে।—সত্যসন্দর মাথা দোলায়। সুচরিতার দিকে না তাকিয়ে টের পায় স্বামীকে সে কনুইয়ের এক খোঁচা দিল।

'কী নালিশ মা?'

'ন্ না!'

'লজ্জা কি, বলো। আমি তো দলের জন্যে লিখি না মা, আমি লিখি দেশের জন্যে। মানুষের মঙ্গলের জন্যে। তাই আমার লেখা সম্পর্কে প্রত্যেকের—'

'ও বলে কি জানেন দাদা—'

'আঃ!' রাখালকে ধমক দেওয়াটা আর সামলাতে পারে না সত্যসন্দর। কোন্ এক রাখাল তালুকদারের বউ তার লেখা সম্পর্কে কী নালিশ জানায় না জানায় বড় বয়েই গেল! ওর নালিশে কী আসে যায়?

সে কথা নয়, সলজ্জ ওই 'ন্ না! ভঙ্গিটাই চমকপ্রদ। পরিচিত, অতি পরিচিত এই ভঙ্গি। গলার স্বরটা ভালো করে একবার শুনতে পারলেই হয়ত সমস্যাটার কিনারা হয়ে যায়। মাঝখান থেকে তুই কেন রাখাল বাগড়া দিচ্ছিস? তোর কেন কর্তালি? বউ তোর কচি খুকি না, হাবাগোবা না, তোর মত ছেলেকে যে গেঁথে তুলেছে—মুখোমুখি দুটো কথা সে বলতে পারে না?

'আমার সব বই তুমি পড়েছ, মা?'

সবিনয়ে সায় দেয় সুচরিতা।

সত্যসন্দর নতুন করে চমক খায়।

'কোন্ কোন্ বই তোমার ভালো লেগেছে আর কোন্ কোন্ বই সম্পর্কে তোমার নালিশ মা?'

সুচরিতা আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়ায়। মাথা হেঁট করে।

আরেক কিস্তি চমকায় সত্যসন্দর: এই মুদ্রা দোষটাও অতি

পরিচিত। আঙুলে আঁচল জড়ানো মেয়ে মাত্রেরই একটা অভ্যাস বটে কিন্তু মাথা হেঁট করে ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলা ?

না, কোনও সন্দেহ নেই—এ মেয়েকে সত্যসুন্দর চেনে। অতি ভালো করে চেনে। অন্তরঙ্গ ভাবে চেনে।

কিন্তু কী করে ? কবে, কোথায়, কী উপলক্ষে দেখা হয়েছিল ?

'বলো মা বলো', সত্যসুন্দর অধৈর্য হয়ে ওঠে, 'লজ্জা কি, বলো ?'

'আশ্চর্য ! নালিশ জানাবে বলে এলে আর এখন—বলো', রাখালও স্ত্রীকে উৎসাহ দেয়।

'তোমার কথায় আমি কিছুই মনে করব না। তুমি তো রাখাল নও, দলের ফতোয়া মনে রেখে নিশ্চয় তুমি আমার লেখা পড়ো নি। আমার লেখা যখন তোমার ভালো লাগে—'

'এ কী বলছেন দাদা !' রাখাল গাঁইগুঁই করে ওঠে, 'আমি আপনার লেখা—'

'জানিরে জানি।' তিক্ত কণ্ঠে সত্যসুন্দর বলে 'তোদের দলের সঙ্গে যখন বনিবনা ছিল তখন আমি ছিলাম সেরা সাহিত্যিক। আমাকে তখন তোরা মাথায় করে নাচতি। কিন্তু যেই বিচ্ছেদ হল, সঙ্গে সঙ্গে আমার সব লেখাও বাতিল হয়ে গেল। তোদের টেকনিক আমার জানা আছে। থাক ও কথা—তুমি বলো তো মা, সত্যসুন্দর সোজা হয়ে বসে। 'বলো !' কাতর একটা ব্যাকুলতা তার গলার স্বরে ফুটে ওঠে।

'সু' গম্ভীর হয়ে যায় রাখাল, 'কেন ইতস্তত করছ। যা বলতে এসেছিলে বলো, তারপর ওঠা যাক। না শুনলে উনিও শান্তি পাবেন না। মিছি মিছি ওঁর সময় আর নষ্ট করো না।'

সুচরিতা স্বামীর দিকে তাকায়। ভীরু ভীরু দুই চোখ তুলে যেন মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেছে বেচারী কিন্তু নিরুপায়।

'আমার কথায় কিন্তু কিছু মনে করতে পারবেন না—আগেই বলে রাখছি হাঁ।' সুচরিতা মুখ খোলে, 'সাহিত্যের আমি কীইবা বুঝি ! পড়তে ভালো লাগে, তাই পড়ি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে—'

আস্তে আস্তে কথা বলে যায় সুচরিতা। একটানা।

সত্যসুন্দর হাঁ করে শোনে। আদুরে আদুরে সুর, সুরেলা স্বর।

অতি পরিচিত ! অতি পরিচিত ! গান জানে ? নিশ্চয়। নিশ্চয় গান জানে। হয়ত কোন সভার সভাপতি বা প্রধান অতিথি হিসেবে এর গান শুনেছে, শুনে মোহিত হয়ে গেছে, মুগ্ধ হয়ে গায়িকার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। তাই ! তাই মুখের আদল, চোখ-নাক-মুখ, গালের তিলটা অত চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।

—'আপনার আগেকার লেখা পড়ে মনে হয় সত্যিকারের জীবনের গল্প। কিন্তু এখনকার লেখা—'

'আচ্ছা তুমি গান গাইতে পারো, না মা ?'

আচমকা বাধা পেয়ে থতমত খায় সুচরিতা।

'গান ? আমি ?' বেকুবের মত সে মাথা নাড়ে।

'জানো না ? সত্যি গান জানো না ?' সত্যসুন্দর ভয়ানক দমে যায়। সভাসমিতিতে দেখা হয়নি, ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করতে আগে কখনও আসেনি, নিকট বা দূর-আত্মীয়ও নয়—তাহলে ?

অসহ্য ! সত্যসুন্দরের ইচ্ছে হয় গলা ফাটিয়ে এবার চিৎকার করে ওঠে—কে তুমি ? কেন তোমাকে আমার এত চেনা চেনা মনে হচ্ছে ? তবে কি আমি জাতিস্মর হয়ে গেলুম ? তবে কি আগের জন্মে তোমায় দেখেছিলাম ? পেটের গোলযোগের জন্য আমি যোগাভ্যাস করছি, যোগাভ্যাস কি মানুষকে জাতিস্মর করে তোলে ? নইলে—নইলে—শুধু ওই মুখের আদল, চোখ-নাক-মুখ, গালের তিল নয়—তোমার দেহের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগকে পর্যন্ত আমার চেনা চেনা মনে হবে কেন ? কেন মনে হবে যে—

—'আপনার এখনকার গল্প-উপন্যাস পড়ে মনে হয় আমাদের জীবন থেকে সমস্ত দুঃখ দুর্দশা যেন ঘুচে গেছে, বাস্তব কোন সমস্যাই আর আমাদের নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই ? দুমুঠো ভাতের জন্য যখন—'

কুণ্ঠায় যে-মেয়েটি খানিক আগেই মুখ তুলে চাইতে পারছিল না, এখন সে টান টান হয়ে উঠেছে। স্বর এখন আর সুরেলা নয়, সোচ্চার। প্রশ্রয় পাওয়া মাত্র অভিনয়ের মুখোসটা যেন ছুঁড়ে ফেলেছে। যে মেয়ে মধুর মিথ্যের বেসাতি করতে পারে আবার দরকার হলে ফুঁসে উঠতেও পারে—কে এ ?

প্রাণপণে দুই চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে থাকে সত্যসুন্দর : অবিকল এমনি ভাবেই একদিন একজন—কে যেন—কে যেন— ?

'অবিনাশবাবু এসেছেন।'

সত্যসুন্দর যেন হারানো মানিকের হদিশ পেয়েছিল একটু হলে—হাতেও পেয়ে যেত—হঠাৎ ফসকে গেল। সব তালগোল পাকিয়ে গেল। 'বসতে বল।' বিরক্ত কণ্ঠে সত্যসুন্দর বলে।

সঙ্গে সঙ্গে চাকর চলে যাচ্ছিল, সত্যসুন্দরের খেয়াল হয় সিনেমার কণ্ট্রাক্টফর্ম নিয়ে এসেছে অবিনাশ। ওকে বসিয়ে রাখা ঠিক নয়।

আর, এই সমস্যাটারও কিনারা এখন কোনমতেই হবে না। সমাধানটা একবার যখন হাতের কাছে এসেও ফসকে গেল উত্তেজনার মুখে আর তার পাত্তা মিলবে না। বরং সন্ধ্যার পর, রাত নেমে এলে, কিছুটা কারণ-বারি পেটে গেলে হলেও হতে পারে। সুতরাং এ দুটোর জন্যে আর সময় নষ্ট করা নিরর্থক। নিছক একটা সেন্টিমেণ্টকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়।

'শোন', চাকরকে ডেকে সত্যসুন্দর বলে, অবিনাশবাবুকে এখানেই পাঠিয়ে দে।' বলে সুচরিতার দিকে তাকায়, 'তুমি কি বলতে চাও বুঝেছি। আমার আত্মজীবনীর শেষ খণ্ডটা পড়ো, এর জবাব পাবে। সৎ সাহিত্য বলতে সত্যি কী বুঝায়—'

'আত্মজীবনীর পাঁচটা খণ্ডই আমি পড়েছি।'

'অ।'

'কিন্তু আমার মনে হয়েছে আপনি যেন আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন।'

'তাই মনে হয়েছে বুঝি ? হেঁ হেঁ হেঁ !' হাসা উচিত তাই হাসে, নইলে সত্যসুন্দরের সাধ জাগে মাথা দুটো পাকড়ে ধরে আচ্ছাসে ঠুকে দেয় স্বামী-স্ত্রীর। ওটাও কেমন ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছে ! 'তা এক কাজ করো, আরেকদিন আগে থেকে এনগেজমেণ্ট করে এসো, ধীরে-সুস্থে আলোচনা করা যাবে, কেমন ? আজ—ওই দেখ আরেকজন হাজির হয়েছে, ওকে বিদেয় করে ফের লিখতে বসব—আজ আর নাওয়া-খাওয়া—'

'তাই ভালো।' রাখাল বলে, 'আজ তবে আমরা আসি দাদা।'

'আয়।'

ঘরে ঢুকে রাখাল প্রণাম করেনি। কিন্তু এখন বউয়ের দেখাদেখি সে-ও উবুড় হয়! 'আরে থাক থাক' বলে সত্যসুন্দর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সুচরিতার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে।

এরা বেরিয়ে যায়, ঘরে ঢোকে অবিনাশ। আধা-উত্তেজিত হয়ে।

'মেয়েটা কে সত্যসুন্দরবাবু?'

'আমার এক ভক্ত।'

'ভক্ত? কী নাম বলুন তো?'

'কী ব্যাপার? মনে হচ্ছে আপনি—'

'আহা, নামটা বলুন না।'

'নাম সুচরিতা। সুচরিতা তালুকদার।'

'সুচরিতা?'

'বিয়ের আগে নাকি অন্য নাম ছিল।'

'তাই বলুন! বিয়ে করে সুচরিতা হয়েছেন! আচ্ছা, স্বামীটা বাউণ্ডুলে, না?'

'বাউণ্ডুলে ঠিক নয়। আগে একটু-আধটু লিখত, পার্টি করত।'

'এখন স্রেফ টিউশানী?'

'তা হবে।'

'বাঙাল?'

'সেটা জানি।'

'নোয়াখালিতে মেয়েটার সাথে ছেলেবেলায় ভাব ছিল—?'

'হতে পারে। প্রেমঘটিত বিয়ে বলেই মনে হল। তা আপনি এত সব জানলেন কী করে?'

'আচ্ছা সত্যসুন্দরবাবু, আপনার মত মানুষ কী বলে ওকে এই ঘরে ঢুকতে দিলেন।'

'মানে?'

'মানে ওই মেয়েটা ছিল রিফিউজী। কিছুদিন টালীগঞ্জ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে। দু-চারটে বইয়ে একস্ট্রার কাজও পায়। কিন্তু ভদ্রভাবে গরিব হয়ে বাঁচা ওদের পোষাবে কেন?'

'তারপর ?'

'তারপর আর কী ! ডুবে ডুবে জল খেতে খেতে শেষ অবধি খোদ পাড়ায় গিয়ে ডেরা বাঁধল ।'

'অ্যা !' যথাসাধ্য আঁৎকে ওঠার চেষ্টা করে সত্যসুন্দর। গলা দিয়ে তার ফ্যাসফ্যাসে একটা আওয়াজ বেরোয় শুধু ।

'ছেলেটা নাকি খোঁজ পেয়ে ধরে নিয়ে এসে বিয়ে করেছে। ছোকরার নিজের বলতে কেউ নেই, কিন্তু ওই ছুঁড়ির সংসার এখন ঘাড়ে চেপেছে। সে এক রাবণের গুষ্টি মশায় ।'

'ছি ছি ছি !'

'শেষ কালে একটা বেশ্যা এসে আপনার এই পবিত্র ঘরে—'

'থাক থাক, আর বলবেন না অবিনাশবাবু, আমাকে আর মনে করিয়ে দেবেন না ! আমি কি করে জানব যে—তারা ! তারা ! ব্রহ্মময়ী মা !'

কপালে দুই হাত ঠেকায় সত্যসুন্দর।

এবং মনে মনে ফেলে স্বস্তির শ্বাস : যাক, এতক্ষণে সমস্যাটার ফয়সালা হল ।

মনোরমার প্রশ্ন

'তোরা আমায় কি ভেবেছিস বল তো!' সেলাইকল থামিয়ে মনোরমা সোজা হয়ে বসে। 'কাল বিকেল থেকে একের পর এক—'

'নতুন-মা যে কেবলি তোমার কথা বলছেন।'

খবরটা নতুন। রমেনরা কেউ একথা জানায় নি। তারা শুধু বলেছে মনোরমার একবার যাওয়া উচিত।

'বলছেন? কী বলছেন রে?'

'বলছেন, যাঁর দয়ায় এ পাড়ায়—'

'ছি ছি ছি! দয়া কী বলছিস বাবা।'

কথাটা সন্তোষের নয়। বেশি ভাড়ার ভাড়াটে বসাবার মতলবে ছলে-বলে সতেরো বছরের ভাড়াটেকে উংখাত ক'রে কেন যে যোগেশ সেই চল্লিশ টাকাতেই ফের ভাড়াটে বসাল তার বৃত্তান্ত শুনে সুনীতিই বলেছে।

সন্তোষ বলে, 'মানে তোমার জন্যেই তো—'

'এটা কর্তব্য। বরং আমাদের পাড়ায় ওঁকে আনতে পেরেছি এই আমাদের মহা সৌভাগ্য—বলিস নি?'

সন্তোষ সায় দেয়। সে নিজে বলে নি বটে, বলার সুযোগ পায় নি ব'লে বলে নি, কিন্তু আর সবাই তো বলেছেন? 'পাড়ার সব্বাই গিয়ে দেখা ক'রে এসেছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে।'

'করবে বইকি, করবে বইকি।' পাড়ার লোকে তার নির্দেশ মেনেছে জেনে মনোরমা খুশি হয়, 'তা আমার কথা কী বললেন রে?'

'নাটুদা যখন বলল, 'আমাদের পাড়াতেও আপনার মতো একজন—উনি বললেন, জানি।'

'জানতেন? উনি জানতেন?'

'আগে থেকে জানতেন। ভাশুরের ছেলের কাছে শুনেছেন। সেই যে মাথায় টাকপড়া ভদ্রলোক—রমেনদার অফিসে কাজ করে—'

রমেন নিয়ে এসেছিল, মনোরমার মনে পড়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। মা ব'লে ডেকেছিল। নিজের কাকিমার কথা বলেছিল।

তার মুখে বাড়ির কষ্ট শুনেই মনোরমা গিয়ে যোগেশকে বলে। রমেনকে ভাগিয়ে দিলেও তার কথায় 'না' বলতে যোগেশ পারে নি।

কেউ পারে? মনোরমার কথায় 'না' বলতে? মনোরমা না পাড়ার মা।

'মনোরমা দুঃখ করছিলেন। দেশ ছেড়ে এসেছেন, এখানে কেউ চেনে না। মা ব'লে ডাকে না। নিজের ছেলেপুলে তো—'

'আহা!' মনটা টনটন ক'রে ওঠে। পেটের ছেলে তারও নেই। আজ নেই!

কিন্তু খোকনকে যখন লাল শালুর পতাকায় মুড়ে জন্মের মতো নাটুরা নিয়ে চ'লে যায় চারদিকে সবাই তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। কেঁদো না মা, কেঁদো না। আমরা আছি। আজ থেকে আমরা তোমার ছেলেমেয়ে তুমি আমাদের মা।—বলেছিল।

এক ছেলে হারিয়ে মনোরমা একশো ছেলেমেয়ে পেয়েছে। পাড়ার ছোট বড় সকলের মা। চাটুজ্যেমশায়ও মা ব'লে ডাকা শুরু করেছিলেন!

মনোরমার চোখ-মুখ ঝকঝক করে।

আর ভাবো দেখি সুনীতির কষ্টের কথা! ওর স্বামীও দেশের জন্যে—

'সবাই ওঁকে নতুন মা ব'লে ডাকছে তো, হ্যাঁরে সন্তু?'

সন্তোষ ঘাড় নাড়ে। 'তুমি বলেছ—'

ভাগ্যিস বুদ্ধি ক'রে বলেছিল! মনোরমা বড় তৃপ্তি পায়।

বলে, 'তুই কি এখন যাবি ওখানে?'

'দরকার আছে? কলেজে যাচ্ছিলাম—'

'একবার হয়ে যা না বাবা। বল, ঘণ্টা দুয়েক পরেই আমি যাচ্ছি। ব্লাউজগুলো কাটা হয়ে গেছে, সেলাইটা শেষ ক'রেই—কী কাজের চাপ দেখছিস তো বাবা।'

'সে আমি বলেছি মা পুজোর সময়—'

'তায় গোপালের জ্বর। বৌমার নিজের শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না—একটু যে সাহায্য করবে—'

'তাও বলেছি। উনি বললেন, আমি দুপুরে যাবো। দিদির পায়ের ধুলো নিয়ে আসবো।'

'আমার পায়ের—ছি ছি ছি! একথা কান পেতে তোরা শুনলি!'

মনোরমার পায়ের ধুলো অবশ্য পাড়ার সবাই নেয়। পাড়ায় নতুন বউ এলে শেতলাতলার পরেই আসে মনোরমার কাছে। পাড়ার ছেলে বিয়ে করতে যায় মনোরমার পায়ের ধুলো নিয়ে। মনোরমার আশীর্বাদ ছাড়া কোনো শুভ কাজই হতে পারে না।

চাটুজ্যে মশাই পর্যন্ত—

মনোরমা যদিও সংগে সংগে জিভ কেটে তিন পা পিছিয়ে যায়, বুড়ো মানুষটা তো মুখ ফুটে বলেছিল, 'আশীর্বাদ করো মা যেন সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করি। ছেলে যখন মাসে মাসে কিছু পাঠাবে বলছে শেষ কটা দিন বাবার পায়ে প'ড়ে থাকি। ভাইয়ের সংসার আর ভালো লাগে না। আশীর্বাদ করলি তো মা?'

একে বামুন তায় বাপের বয়সী। নিজেকে মনোরমার ভারী অপরাধী মনে হয়েছিল। তার গোপালের এতে কোনো অকল্যাণ হবে না তো? দিন কয়েক ভারী মুষড়ে ছিল। মা শেতলার থানে নাক-কান ম'লে মাপ চেয়েও মুষড়ে ছিল।

কিন্তু ঠিক তেরো দিনের মাথায় যখন খবর এলো দশাশ্বমেধ ঘাটে আহ্নিক করতে করতে চাটুয্যে মশাই মারা গেছে—ধুয়ে-মুছে যায় সব গ্লানি।

মা! সত্যিই সে মা, ছোট-বড় বামুন-কায়েত সকলের মা। মায়ের আশীর্বাদে সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূরণ না হয়ে পারে!

শহীদের মায়ের আশীর্বাদে!

সন্তোষ বলে, 'তুমি যদি না যাও, নতুন মা দুপুরে ঠিক চ'লে আসবেন।'

না না হোক, শহীদের স্ত্রী সুনীতি, মনোরমাই তাকে এ-পাড়ায় নিয়ে

এসেছে। তাকে নতুন-মা ব'লে ডাকতে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে সবাইকে ব'লে দিয়েছে। আর কাল থেকে আজ এই বেলা দশটা পর্যন্ত নিজে সে একবার গিয়ে দেখা ক'রে এলো না ?

তবে কি মনে মনে মনোরমা সুনীতিরও প্রণাম পাবার লোভে ব'সে আছে ? এই পৃথিবীতে সই ব'লে একমাত্র যে মানুষটির গলা জড়িয়ে ধরা যায়, যার বুকে মুখ রেখে বা মাথাটা যার বুকে টেনে নিয়ে দুদণ্ড সুখের কান্না কাঁদা যায় তার প্রণাম পাবার লোভে ?

মনোরমা উঠে দাঁড়ায়।

'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি বাবা। উনি আসুন না, রোজ আসুন, কিন্তু আমারই আগে যাওয়া উচিত, না কি বলিস ?'

গোপাল বায়না করছিল সাগু আর কিছুতেই খাবে না—ঠাস ঠাস ক'রে নিভা তার পিঠে কয়েকটা চড় বসিয়ে দেয়।

'মর মর মুখপোড়া।'

'বৌমা !'

নিভা ফিরেও তাকায় না। ছেলের কান্না ছাপিয়ে গলা চড়ায়, 'মরলে তোরও হাড় জুড়োয় আমিও গলায় দড়ি দিয়ে রেহাই পাই।'

গোপালটা তারই জন্যে মার খেলো। মনোরমার বুঝতে বাকি থাকে না। তাকে না আসতে দেখলে নিভা ষাটবাছা ক'রে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠিক ছেলেকে সাগু খাওয়াত।

সংসারে এই একটা মানুষ মনোরমাকে যে আমল দেয় না। শুধু আমল দেয় না নয়, সুযোগ পেলেই খোঁচা দেয়।

অথচ এই নিভাই একদিন মুখ তুলে তার সাথে কথা বলতে থতমত খেতো। আজকালকার মেয়ে শাশুড়ির এতো বাধ্য ! অবাক হয়ে যেতো সবাই।

'কেন ছেলেটাকে মারছো !'

'আমার আর সহ্য হয় না।'

মনোরমা প্রায় ধমক দিয়ে কথা বলে, নিভা সমান সুরেই জবাব দেয়।

নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে মনোরমা তার গায়ে-মাথায় হাত বুলোয়, 'কাঁদে না দাদু, কাঁদে না। মানিক আমার—ছেলে মানুষ করা কি অতো সহজ বৌমা। যে মা রোগা ছেলের বায়না সইতে পারে না—'

'আমারও মানুষের শরীর।'

দুপদাপ পা ফেলে নিভা উঠে যায়। হেঁসেলের দরজা হাঁ ক'রে রেখেই যায়।

'মা নয়, তুই রাক্ষুসী।' মাকে গোপাল মুখ ভেঙায়।

'ছি দাদু। গুরুজনকে ও কথা বলতে নেই।'

'না, বলবে না!' গোপাল ফোঁপাতে থাকে।

দিনকে দিন মেজাজ নিভার ক্রমেই তিরিক্ষি হয়ে উঠছে। মনোরমারই বলে একেক সময় ধৈর্য রাখা শক্ত হয়ে পড়ে।

সংসারের বিরুদ্ধে অতো নালিশ প্রাণে পুষে সংসার করা চলে! বিশেষ ক'রে সে নালিশের কোনো কিনারা যদি না থাকে?

স্বামীর শোক? কিন্তু নিভার স্বামী মনোরমার ছেলে নয়? নিভা যেমন স্বামী হারিয়েছে, বিধবা মনোরমা তেমনি একমাত্র ছেলে হারিয়েছে না? পাড়ার লোকের মা হয়ে মনোরমা বুক বাঁধতে পারে, নিজের পেটের ছেলের মুখ চেয়ে নিভা পারে না?

অভাব? কোন সংসারে অভাব নেই? চাকরে ব্যাটাছেলে থাকতেই এক-একটা সংসারের দুবেলা খাওয়া জোটে না সেই হিসেবে তারা বরং সুখেই আছে।

পাঁচজনের দুঃখে ভেবেই না নিজের দুঃখ ভুলতে হয়. পাঁচজনের দুঃখের জন্যেই না তার খোকন—

এমন জোরে গোপালকে মনোরমা বুকে চেপে ধরে যে ফোঁপানি থামিয়ে ককিয়ে উঠে গোপাল বলে, 'উঃ, লাগে দিদা, লাগে।'

'সাগুটুকু তুমি খেয়ে নাও দাদু।'

'না না। সাগু খেলে বমি পায় বিচ্ছিরি।'

'চোখ বুজে ঢকঢক করে খাও, সোনা। শুধু আজ খাও। আজ সাগু খেলে কালই জ্বর ভালো হয়ে যাবে। তোমার জ্বর ভালো হয়ে গেলে

দেখো না তোমায় কত কি খেতে দেব। মাছের পেটি দেব, ডিমের বড়া দেব—'

'আমার জ্বর ভালো হবে না, দিদা। ওষুধ না খেলে জ্বর ভালো হয়?'

জ্বরে ওষুধ খেতে হয়, মনোরমা জানে। কিন্তু সাধারণ সর্দিজ্বরে ডাক্তার ডাকার ওষুধ খাওয়ার মত বিলাসিতা পোষায় মনোরমাদের? যদুকে খবর দিলে অবিশ্যি ছুটে আসবে, বিনা পয়সায় ওষুধও পাঠিয়ে দেবে—কিন্তু সেটা কি অন্যায় সুযোগ নেওয়া নয়ঃ বোঝে না নিভা?

'জ্বরে ভুগে ভুগে আমি ঠিক মরে যাব, দিদা। মিতুর ভাই যেমন—'

'ষাট ষাট ষাট।' মনোরমা গোপালের মাথা থাবড়ায় থুতু দেয়।

এই কথা নিভা শিখিয়েছে। সব সময় এই কথা শুনিয়ে শুনিয়ে শিখিয়েছে।

এত বিগড়ে গেছে মনটা ওর! এত বিগড়ে গেছে! নিজের ছেলের মরার কথা ভাবে!

'আজ বিকেলে তোমায় আমি ওষুধ এনে দেব, দাদু। তাহলে কালই তুমি ভালো হয়ে যাবে। তারপর কাল বিকেলে ঘুঘনি, হরিদাসের বুলবুল ভাজা—গণেশের ফুলুরি—'

'আজ ওষুধ খেলে কালই—'

'নিশ্চয় ভালো হয়ে যাবে। এখন সাগুটুকু খেয়ে নাও কেমন? লক্ষ্মী ছেলের মত আজ কথা শোন, তবে তো।'

সাগু খাইয়ে গোপালকে কোলে করে মনোরমা ঘরে আসে।

হাত দিয়ে চোখ ঢেকে তক্তাপোষে নিভা শুয়ে আছে।

'তোমার কি আবার মাথা ধরল বোমা?'

'কী করতে হবে, বলুন?' হাত না সরিয়েই নিভা ফোঁস করে ওঠে। 'রান্না করতে হলে শুধু ভাত সেদ্ধ করে দিতে পারি। আনাজপাতি তেল-মশলা কিছু নেই—সে আমি আপনাকে কালই বলেছি।'

বলেছে। কালই বলে রেখেছে। মনোরমা গা করেনি। গোপাল সাগু খাবে। শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে বলে নিভা মুড়ি খাবে। শুধু

মনোরমার একার জন্যে রান্নার কোন মানে হয়? বিশেষ করে তেল-মশলা আনাজপাতি যখন বাড়ন্ত?

বাড়ন্ত না হলেও এই মুখ-ঝামটার পর ওর রান্না নামত গলা দিয়ে?

মনোরমা বলে 'রান্না তোমায় করতে হবে না বৌমা। আমিও এ বেলা দু গাল মুড়ি খাব—'

'বিকেলে মুড়ি কিন্তু আনতে হবে।'

শাশুড়ী মুড়ি খেলে মুড়িও বাড়ন্ত হবে বৌ জানিয়ে দিল।

'বটু দত্তর টাকা তিনটের সময় পাওয়া যাবে। আটটা ব্লাউজ আজ ডেলিভারী নিয়ে যাবে, তখন দেবে বলেছে।' গম্ভীর গলায় মনোরমা বলে। 'তুমি এই ক'টা সেলাই করে রাখো—সব কাটাই আছে। আমি একটু বেরুচ্ছি—'

'আমার সেলাই পছন্দ হবে?'

'কেন হবে না! আমার সেলাই পছন্দ হলে তোমারটা হবে না! সেলাইয়ের কী-বা আমি জানতাম! বুড়ো বয়সে শিখে নিয়েছি তো! দরকার পড়লে মানুষকে সব কিছুই—'

'বুঝেছি!'

'বুঝেছি না, মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ। কাল যদি আমি চোখ বুজি—'

নিভা উঠে বসে। চোখে চোখে তাকায়।

কথা বন্ধ হয়ে যায় মনোরমার। ও কী চাউনি?

মনোরমার মৃত্যুকে ঠাট্টা বলে মনে করে নিভা? ভাবে কি, নিজের ছেলেকে যে দেশের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে মিছিলে পাঠাতে পারে, ছেলের গুলি বেঁধা বুক দেখেও পাড়ার সকলের 'মা' ডাকে বুক বেঁধে সংসারের হাল ধরে দাঁড়াতে পারে—রক্ত মাংসের মানুষ নয় সে, রাবণের চিতা?

মনোরমা সন্তর্পণে শ্বাস ছাড়ে। খোকনের বউ তার সাথে এমন ব্যবহার করবে খোকন কি ভাবতেও পারত!

গোপালকে থামিয়ে দিয়ে মনোরমা পেছন ফেরে।

'আমিও তোমার সাথে যাব, দিদা।'

'না, দাদু, এই রোদে—'

'ছাতা নিয়ে যাব।'

'ছাতা তো আমাদের নেই, দাদু।'

'রিকসা করে চলো।'

'আমরা যে গরীব দাদু।' গোপালের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে নিভার দিকে তাকায়। ফের চোখ ঢেকে শুয়ে। রাখবে তো কাজগুলো এগিয়ে? 'তুমি জানালায় বসে রাস্তা দেখ, আমি যাব আর আসব। যদু ডাক্তারকে তোমার ওষুধের কথাও বলে আসব। মিতুর কাছ থেকে সুন্দর একটা ছবির বই নিয়ে আসব।'

'আমার চারটে গুলি মিতুর কাছে আছে, দিদা।'

'নিয়ে আসব তাও নিয়ে আসব।'

'মিতু আমার চাঁদিয়াল ঘুড়িটা ছিঁড়ে দিয়েছে, দিদা।'

'বকে দেব। মিতুকে খুব করে বকে দিয়ে আসব।'

'কিন্তু বকলে ছবির বই দেবে না, গুলিও দেবে না। ও যে ভীষণ দুষ্টু।'

'আগে তো বকব না! ছবির বই নিয়ে গুলি নিয়ে তারপর বকে দেব।'

গোপালের মুখে হাসি ফোটে।

যোগেশের বাড়ি না-না করেও পাঁচ মিনিটের পথ।

বাড়ির সদরে এসে মনোরমা যখন দাঁড়ায় বুকটা ঢিপ ঢিপ শুরু করেছে।

এই এক নতুন উপসর্গ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে সেলাই করতে পারে, চশমার দরকার আজও হয়নি—কিন্তু দু পা হাঁটলেই বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পাড়ে, দম বন্ধ হয়ে আসে।

'কে কে? কী চাই?'

জানাশোনা বাড়ি, পুবদুয়ারী ঘরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, হাঁকডাক শুনে মনোরমা থমকে দাঁড়ায়।

'কে তুমি? বলা নেই কওয়া নেই হুট করে--'

'আমি—?' মেয়েটির দিকে তাকায়। নিভার বয়সীই হবে। গায়ের রঙ নিভার থেকে কিছু ময়লাই হবে। চেহারাটা কিন্তু মাজাঘষা। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভুরভুর করে গন্ধ তেলের বাস ছাড়ছে।

'ভিখিরি?'

ভিখিরি? পাড়ার-মা মনোরমা ভিখিরি?

অতি দুঃখে হাসি পায়। তা মেয়েটি তাকে ভাবতে পারে বটে ভিখিরি। হাতে চুড়ি, গলার হার, কানে দুল, বাহারী ব্লাউজ, পাটভাঙা তাঁতের শাড়ি। আর মনোরমার পরনে কিনা আধময়লা জ্যালজেলে থান খালি গা।

এত বেলা অব্দি এক কাপ চা ছাড়া পেটে কিছু না পড়ায় স্নান না করায় মুখ চোখের যা ছিরি হয়েছে ভিখিরি ভাবা কিছু বিচিত্র না। এই মেয়েটির পক্ষে না!

'আচ্ছা মানুষ তো! কথার জবাব দাও না—হাসছ?'

মেয়েটির চিৎকারে এবার যোগেশের বউ বেরিয়ে আসে।

'ওমা! মা এসেছে।' চারুবালা তাড়াতাড়ি এসে পায়ের ধুলো নেয়। 'ইনিই আমাদের মা, লতাদি। যার কথা আপনাকে বলেছিলাম না—এসো মা এসো। ও পুটি ও মিতু দ্যাখ সে কে এসেছে।'

'ইনি! হায় ভগবান!' লতাও এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ছিল, দুহাতে মনোরমা তাকে জড়িয়ে ধরে।

'তুমি ভুল করোনি মা। আসলে তো আমি ভিখিরিরও অধম।'

'আমায় মাপ করুন, মা। না জেনে না বুঝে--'

'সবাই ভালোবাসে বলে মা বলে ডাকে। নইলে—'

প্রণাম করতে না পারলেও মনোরমার হাত দুটি লতা বুকে চেপে ধরে!

ততক্ষণে আরও অনেকে বেরিয়ে এসেছে! যোগেশের ছেলেমেয়ে, ভাগ্নি, পিসি। মা মা করে চারদিক থেকে সবাই ঘিরে ধরেছে।

সকলেরই গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে মনোরমা আদর জানায় আশীর্বাদ করে।

'আমার দিদি কোথায়, দিদি। দিদির পায়ের ধুলো নেব বলে ছুটে এলাম…'

লতা বলে, 'উনি এই মাত্র খেয়ে—'

'খাওয়া হয়ে গেছে?'

'খেয়ে শুয়েছেন।'

'শুয়েছেন?

'ডাক্তার সোম বলেছেন কিনা দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘণ্টা খানেক—একি, তুমি ঘুমোওনি কাকিমা?'

মনোরমা ফিরে তাকায়। সুনীতি এসে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছে।

লতা যেমন নিভার বয়সী, এ-ও তেমনি তার।

কিন্তু সুনীতির দিকে তাকিয়ে চোখে মনোরমার পলক পড়ে না। কী ঢলঢলে মুখখানা! চমৎকার স্বাস্থ্য! কে বলবে শুয়েছিল। মনে হয় সেজে গুজে কোথাও বেরোবে বুঝি।

এর অসুখ? এমনিই অসুখ যে দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘণ্টাখানেক শুয়ে থাকার জন্যে ডাক্তার বলেছে?

'একদিন না ঘুমোলে কিছু হবে না'। সুনীতি দরজা থেকে দু হাত বাড়ায়, 'আসুন দিদি। আপনার জন্য কাল থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি। আপনি আরেকটু পরে এলে আমিই যাচ্ছিলাম।'

সুনীতি দু পা বাড়ায়, মনোরমা দু পা এগোয়। তারপর দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে।

শহীদের বউ। শহীদের মা।

পরম সমাদরে মনোরমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সুনীতি খাটে বসায়। লতাও ঘরে ঢোকে।

লতার কোমর জাপটে একটি ছেলে। ফ্যালফ্যাল করে সে মনোরমার দিকে চেয়ে থাকে।

'ছেলে বুঝি, মা? কটি?'

'দুটি।' লতার হয়ে সুনীতি জবাব দেয়। 'কোলেরটি মেয়ে। মাস ছয়েকের। প্রণাম করলিনে. বাপি ইনি তোর মা হন, আয় আয়—'

মাকে ছেড়ে আসা দূরে থাক, মায়ের আড়ালে গিয়ে লুকোয় বাপি।

'আহা থাক থাক। এমনিতেই আমি আশীর্বাদ করছি—'

'নতুন দেখছে কিনা। নইলে অমন আদর-কাড়া ছেলে—'

গোপালেরই বয়সী হবে। নিত্য তিরিশ দিন রোগে না ভুগলে গোপালের মুখখানাও এমনি মিষ্টি দেখাত। চেহারাটাও এমনি নাদুস-নুদুস হত। নিভার কোলে ওকে দেখে মা-যশোদার কোলে গোপালের ছবির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল বলেই না নাতির নাম মনোরমা গোপাল রাখে।

'বাপি, দেখ দেখ—এক্ষুনি ফুল-দানিটা ভাঙছিলে।' বাপিকে সাবধান করে দিয়ে সুনীতি বলে, দেখছেন তো দিদি ঘরদোরের অবস্থা এখনও গোছগাছ করা হয়নি।'

তা দেখছে মনোরমা। কিন্তু হাজার গুছিয়ে রাখলেও এত মালপত্র এ ঘরে কী ভাবে ধরাবে বুঝে উঠতে পারে না।

'বৌমা একা আর কত করবে। বাড়ী বদলাতে চাকরটা আসতে রাজী হলনা। একটা ঠিকে ঝি অবিশ্যি—'

মালপত্র গোছগাছ করা না হলেও দেওয়ালের একটা মস্ত বড় ছবি টাঙানো হয়েছে। ছবিতে ফুলের মালা। কাগজের নয় টাটকা ফুলের মালা।

মনোরমাকে অপলক সেই দিকে চেয়ে থাকতে দেখে সুনীতি বলে, হ্যাঁ দিদি। যা ভেবেছেন।

সুনীতির স্বামী? অথচ মনোরমা ভেবেছিল গুরুদেব। রমেন বলেছিল, ইনি বেলুর মঠে কার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন। এ'রই কাছে হয়ত।

মনোরমা উঠে ফটোর কাছে যায়। দেশের জন্যে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। দিয়েছে কতদিন আগে! কোননা ত্রিশ-বত্রিশ বছর হতে চলল। ফটো নিশ্চয় তারও আগেকার। কিন্তু দেখে মনে হয় টাটকা ফুলের মালার মত ফটোও আনকোরা নতুন।

আর খোকন! বুকটা মনোরমার মোচড় দিয়ে ওঠে। এই তো সেদিন গেছে, চার বছরও পুরো হয়নি, আর এরই মধ্যে বাছার মুখখানা যেন ঝাপসা হয়ে এসেছে।

এমন একখানা ফটোর অভাব কি?

ফটো অবশ্য নাটুরা তুলে রেখেছে। গুলী বেঁধা বুকে লাল শালুর পতাকা দিয়ে ঢাকা। কিন্তু লাঠির বাড়িতে সেই ফটোর মাথাটা যে চৌচির। বুটের লাথিতে মুখটা থেঁতলানো?

মা হয়ে মনোরমা ছেলের সে-ফটো ঘরে টাঙিয়ে রাখতে পারে!

লতা বলে, 'ছবিতে আর কী দেখছেন! এমনিতে কাকাবাবুর চেহারা নাকি রাজপুত্তুরের মত ছিল।'

'তাই!' মনোরমা ফিরে আসে।

'লেখাপড়াতেও হীরের টুকরো ছিলেন।'

আচ্ছা! তবু, চেহারা রাজপুত্তুরের মত না হলেও খোকনও শহীদ। দুজনেই দেশের জন্যে শহীদ হয়েছে। প্রায় একই বয়েসে হয়েছে।

সুনীতির হাতখানা মনোরমা কোলে তুলে নেয়। হাজার তফাত থাকলেও ওরা দুজনে যেমন এক, তেমনি তারা দুজনেও। শহীদের বউ। শহীদের মা।

সুনীতি বলে, 'মস্ত চাকরি পেয়েছিলেন।'

নাকি!

'কিন্তু দেশকে যে ভালবাসে—'

পারেনা পারেনা। শুধু নিজেকে নিয়ে নিজের সংসারকে নিয়ে খুশী থাকতে সে পারে না। খোকনও পারে নি।

'চাকরির ফাঁকে ফাঁকে গোপন বিপ্লবী দলে—'

মস্ত বড় চাকুরে অবশ্য খোকন ছিলনা। নিতান্তই কেরানি। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে সে-ও পার্টি করত।

'তারপর একদিন যখন—'

তারপর একদিন আসে চরম পরীক্ষা নিজের সংসার আর দেশের মধ্যে একটাকে তখন বেছে নিতে হয়।

'বড় আশা ছিল দেশকে স্বাধীন করবেন। স্বাধীন দেশে বাঁচবেন।

দেশ সেই স্বাধীন হল, কিন্তু উনি দেখে যেতে পারলেন না। এই কথা যখন মনে পড়ে দিদি—'

এতক্ষণ দিব্যি মনোরমা মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছিল, সুনীতি গমরে উঠতে হকচকিয়ে যায়।

'ওর অত স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতার ফল আমি ভোগ করছি—' সুনীতি হিক্কা তোলে।

মানে কি কথাটার? স্বাধীনতার ফল ভোগ করছি মানে?

'মাসে মাসে যখন টাকাটা সই করে নিই বুক আমার ফেটে যায় দিদি মনে হয় মনে হয়—'

'আঃ কাকীমা!' তাড়াতাড়ি লতা এসে সুনীতিকে ধরে। 'ডাক্তার সোম না তোমায় অত করে মানা করে গেল। শুয়ে পড় দেখি, শিগগীর শুয়ে পড়।'

সুনীতিকে শুইয়ে দিয়ে লতা বুকে হাত বুলোয়।

মনোরমা এদিকে ছটফট করে কৌতূহলে।

সুনীতি খানিক ধাতস্থ হতেই শুধোয়, 'কিসের টাকা মা?'

'ওই যে সরকার ওঁকে মাসে সওয়া শো করে—'

'সরকার টাকা দেয়?'

'শহীদের স্ত্রী হিসেবে—'

'টাকা দেয়?'

'দেবে না? স্বাধীন সরকার। দেশের জন্যে যার ছেলে প্রাণ দিয়েছে স্বামী প্রাণ দিয়েছে তাদের পেনশন দেবে না? দেশসেবার রেকগনিশান মানে স্বীকৃতি, মানে—'

'দেশের জন্যে ছেলে প্রাণ দিলে মাকে সরকার পেনশন দেয়?'

'মানে তিনি যে সত্যিই দেশকে ভালবেসে দেশের জন্যে শহীদ হয়েছেন এইভাবে সরকার সেটা মেনে নেয় আর কি।'

'আর সরকার যদি না মানে তাহলে দেশকে ভালোবাসাটা দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়াটা মিথ্যে হয়ে যায়?'

'কেন আপনি পান না পেনশন?'

জবাব দেবে কি মহা ধাঁধায় পড়ে যায় মনোরমা। তার খোকন তাহলে—

'ও কি! ও কি!'

আমার খোকন তাহলে কেন খুন হল? আর্ত চিৎকার এই প্রশ্নটাই করতে যাচ্ছিল, তার বদলে মনোরমা হু হু করে কেঁদে ওঠে।

বুকে গুলী-বেঁধা লাঠিতে মাথা-ফাটা বুটে মুখ থ্যাতলানো ছেলেকে দেখেও সেদিন কাঁদেনি যে-মনোরমা।

পেল্লাই এক কাটোয়ার ডাঁটা দিয়ে থলে উপছে ফেলেও আমড়াতলায় পৌঁছনো মাত্র যতীন ঘেরাও হয়ে যায়।

'বাজার করলেন যতীনদা ?' 'সতীনদা না বাজার করে নিয়ে গেল ?' 'মাছের মুড়ো মাংস দই মিষ্টি'—'আপনি বুঝি ডাঁটা কিনতে এসেছিলেন ?' 'জামাইবাবু বুঝি ডাঁটার খুব ভক্ত ?'

চড়বড়িয়ে সবাই কথা বলে। চোখ সকলের থলের দিকে।

যতীন কোঁসিস করে হাসার ! কিন্তু হাসির বদলে গুটিকয়েক ঢোঁক গেলাই তার কাছে জরুরী হয়ে পড়ে।

টের পেয়ে গেছে ? পেল কী করে ? কার্তিকের দোকানে তো কেউ ছিল না। দোকানের ধারে-কাছেও না।

'এ কী ডাঁটা কিনেছেন ! শুকনো—ছিবড়ে ছিবড়ে !' বলে থলেতে মন্টু থাপ্পড় কষাতে যেতেই চট করে বাঁ হাতে থলেটা যতীন চালান করে দেয়।

'শুকনো ডাঁটা কিরে ! নতুন জামাইয়ের জন্যে যতীনদা শুকনো ডাঁটা কিনল ! দেখি যতীনদা, দেখি—'

সমর পা বাড়ানো মাত্র থলে বগলদাবা করে নর্দমার পাশে বসে পড়ে।

বরদার চাকরকে বাজারের মধ্যে বেইজ্জত করেছে। থলে কেড়ে নিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে।

তাকেও তাই করবে নাকি ? ঘাড় ধাক্কাটা না দিলেও থলে কেড়ে নিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দেবে ?

স্রেফ ডাঁটা হাতে ফিরতে হবে ?

সতীনের ওপর চোটপাট করে, বাড়ির ছোট-বড় সকলের, নতুন জামাইয়েরও আপত্তি নাকচ করে দিয়ে বুক চিতিয়ে বেরোলেও ফিরতে হবে মাথা হেঁট করে ?

জোর করে পেচ্ছাপ আমদানি মহা ঝামেলার ব্যাপার. কিন্তু ছেলেগুলোর মতলব না বুঝে ওঠা তক ওঠে কী করে !

'থলে ধরব যতীনদা ?' 'আহাহা, জামায় কাদা লাগছে যতীনদা !' 'ভাঁটা নর্দমায় ঠেকছে যে—!' 'দিন না থলেটা !'

কোলে টেনে নিয়ে থলেটা যতীন বুকের সঙ্গে জাপ্টে ধরে। লুট করার মতলব ? এমনিতে না দিলে ছিনিয়ে নেবে ? গাঁয়ের গরিবগুর্বোদের বাঁচাতে শহরে লুঠ চালাবে ?

বাজারে কিছু না বলে তাই ফাঁকায় নিয়ে এল ?

তাহলে তো একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। যুক্তফ্রন্ট হয়েছে বলে সাপের পাঁচপা দেখেছে ? হাতে মাথা কাটবে ?

যতীন উঠে পড়ে। নর্দমার ঝাঁঝালো গন্ধে পেট হর্দম পাক দিতে শুরু করায় বসে থাকারও আর যো ছিল না।

'তোরা কিছু বলতে চাইছিস মনে হচ্ছে। কী ব্যাপার ?'

অমর বলে, 'বুঝতেই তো পারছেন। সতীনদার দাদা হয়ে আপনি—'

সতীনদার দাদা ! যতীনের পরিচয় আজ সতীনদার দাদা !

'আপনার কাছ থেকে এটা আশা করিনি যতীনদা।' 'সত্যি, আপনি কোথায় আমাদের লীড দেবেন—' 'দেশকে তো আপনিও ভালবাসেন, পথটা আলাদা হলেও—'

নচ্ছারের দল ! একই সাথে জুতো-মারা ও মলম-লাগানো হচ্ছে !

মুখ বেঁকিয়ে যতীন বলে, 'চুরি- চামারি তো করিনি বাপু যে—'

'জোচ্চুরি করেছেন। ডাটার আড়ালে—' 'জোচ্চুরি নয়রে সিধু, ডাকাতি। পরের মুখের গ্রাস কেড়ে-খাওয়া—' 'চুরিচামারি করিনি বললেও কাজটা যে অন্যায় সে আপনিও জানেন, তাই না—' 'আসলে আপনি একটি জ্ঞানপাপী !'

দুপাটি দাঁত বের করে রসিকতার ঢঙে কথাটা বললেও যতীনের মনে হয় বটুক যেন মুখে এক দলা থুতু ছিটিয়ে দিল। বাপ যাকে দাদা বলে সমীহ করে জ্ঞানপাপী বলে ছেলে তার মুখে থুতু দিল !

শুনে সবাই আবার খিক খিক করে হেসে উঠল !

মাথায় যতীনের খুন চড়ে যায়।

গলা চড়িয়ে বলে, 'দস্তুরমত নগদ দাম দিয়ে কিনেছি, বুঝলে? দু টাকা করে কিলো!'

'এ কথা আপনার মুখে মানায় না, যতীনদা।' 'যুক্তিটা বড়ই ছেঁদো হয়ে গেল, যতীনদা। শহরের লোকের বাইং ক্যাপাসিটি বেশি, তারা যদি রেশন পাওয়া সত্বেও—' 'টাকার জোরটা যুক্তি হলে তো হোর্ডাররা ব্ল্যাক মার্কেটিয়াররাও পার পেয়ে যায় যতীনদা। কেন না টাকা দিয়েই তারা—' 'কাকে কী বোঝাচ্ছিস রাখাল। যতীনদা তোর আমার চেয়ে ঢের-বেশি জানে শোনে। দেশের জন্যে জেল খেটেছে যে মানুষ—'

একেই বলে মিষ্টি জুতো। বরদার চাকরকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছে, তাকে মারছে জুতো।

তবে কিনা গলিতে এনে মারছে। সবার আড়ালে মারছে। দেশের জন্যে জেল খেটেছে যে!

যতীন ঝিমিয়ে পড়ে।

কাতর স্বরে বলে 'তোরা বুঝছিস না বাবা, কাল রাত্তিরে জামাই এসে হাজির, নতুন জামাই, ঘরে এক দানা চাল নেই—'

'জামাইকে লুচি-মাংস খাওয়ান।' 'ভরপেট রাবড়ি সন্দেশ খাওয়ান।' 'নিউ মার্কেট থেকে চাল এনে পোলাও খাওয়ান।'

'এটা কি কথার কথা হলরে! সে সাধ্য যদি—'

'সাধ্য না থাকলে শখ কেন?'

'শখ যে কেন সময় হলে বুঝবি নারান। নতুন জামাইয়ের বায়নাক্কা—'

'বাজে কথা।' কোরাসে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে।

'বাজে কথা?'

বটু বলে, 'নয়? জামাইবাবু স্পষ্ট বলেনি রুটি খাবে? দু-বেলাই রুটি খাবে বলেনি?'

'বলেছে?'

'বলেনি? আপনাকে বাজারে আসতে জামাইবাবু, রেখাদি, সতীনদা সবাই মানা করেনি? সতীনদার সাথে ঝগড়া করে আপনি বাজারে আসেন নি?'

আচ্ছা! এতক্ষণে বোঝা গেল কাটোয়ার ডাঁটা দিয়ে থলে উপচে ফেলেও শেষ রক্ষা কেন হল না। কার্তিকের দোকানের ধারেকাছে কেউ না থাকা সত্ত্বেও টের পেয়ে গেল কী করে।

ঘরের শত্রু বিভীষণ! সব নষ্টের গোড়া সতীন হারামজাদা!

ভাইকে বাপ তুলে গালাগাল দিয়েও যতীনের আশ মেটে না। মুখটাকে ভাইয়ের বক্সিংয়ের বস্তা ভেবে দুহাতে ঘুঁষি চালায়। মনে মনে চালায়।

কুলাঙ্গার! বংশের কুলাঙ্গার! বেজাতে বিয়ে করার মতো বেদলে নাম লিখিয়েছে: সব সময় গুজগুজ করে আজেবাজে কাগজ পড়িয়ে মাথাগুলি বিগড়ে দিয়ে বাড়ির সবাইকে পোষ মানিয়েছে। নতুন জামাইকে পর্যন্ত শ্বশুরের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছে!

তাতেও সাধ না মেটায় লেলিয়ে দিয়েছে পাড়ার ছেলেদের?

নেতা হতে চায়? দাদাকে ঘায়েল করে ভাই নেতা হতে চায়?

যে যতীন চক্কোত্তিকে সাঁতরাগাছির সবাই এক ডাকে চিনত তার পরিচয় এখন সতীনের দাদা যতীন?

ভাই মায় সংসার মায় তামাম সাঁতরাগাছির উপর আক্রোশে যতীনের আগাপাশতলা রী রী করে।

খানিক গুম মেরে থেকে বলে, 'মানা করেছিল বুঝি? সকলের মানা সত্ত্বেও আমি বাজারে এসেছি—তোদের সতীনদা বুঝি তাই বলেছে? বাঃ! সতীনটার তো দিব্যি বুদ্ধি খুলেছে। পলিটিকসের ধাপ্পাবাজি—

'মানে?' মন্টুরা ঘাবড়ে যায়। 'বাড়ির সবাই করেনি মানা? আপনি গোঁয়ার্তুমি করে—'

'আমি গোঁয়ার্তুমি করব? তোদের সতীনদার মতো আমি গোঁয়ারগোবিন্দ? চিরকাল যে গান্ধীজীর—বলি জন্ম থেকে তো দেখছিস আমাকে, বাপদাদার কাছে আমার কথা শুনেছিস, গোঁয়ার্তুমি করা, ঝোঁকের মাথায় কাজ করা—'

'তাহলে—?' মন্টুরা এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

'অবাক লাগছে, না? তোদের সতীনদা ধাপ্পা দিতে পারে ভাবতেই পারছিস না? বেশ, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—এই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম

গিয়ে শুধিয়ে আয়। তোদের সতীনদা যদি ফের ওই কথা বলে, এই থলে আমি দিয়ে দেব, তারপর তোদের নিয়ে গিয়ে তোদের সামনেই ভজিয়ে দেব যে—'

সশব্দে যতীন নাক ঝাড়ে।

একটু দূরে সরে গিয়ে ছেলেগুলো জোট বাঁধে। চাপা গলায় কথা চালাচালি করে।

বটুক বলে 'ঠিক আছে। মন্টু আর অমর থাক, আমরা দৌড়ে গিয়ে—'

'অবিশ্বাস! ডিসবিলিফ! পাহারা রেখে যাচ্ছিস! ছি ছি ছি—আমাকে তোরা—আমাকে তো-তো-তোরা—' যতীনের তোতলামি এসে যায়, 'অবিশ্বাস করছিস!' চোখমুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে ওঠে।

চাপা গলায় ছেলেগুলো আর এক দফা কথা চালাচালি করে নেয়। তারপর মন্টু বলে, 'অলরাইট। আমরা সবাই যাচ্ছি। আপনি এখানেই থাকবেন তো?'

যতীন বিনীত সায় দেয়।

'আমরা দৌড়ে যাব ছুটে আসব। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই—স্টার্ট'!

মন্টুরা দৌড় দেয়। এ-ওকে টেক্কা দেওয়ার ছলে দৌড়ের স্পীড বাড়ায়।

পেছন থেকে যতীন বলে, ছুটিসনিরে ছুটিসনি—এই রোদ্দুরে এমন করে ছুটিসনি।'

মুখে ওদের ছুটতে বারণ করলেও গলির বাঁকে ওরা আড়াল হওয়া মাত্র নিজেই যতীন শুরু করে দেয় ছোটা।

উল্টো দিকে ছোটা।

ঘরে ঢুকে বরদা বলে, 'কী ব্যাপার হাঁফাচ্ছ যে! বোস বোস—'

যতীন বলে, 'এক সেকেণ্ড সময় নেই। তোমার চাকর চাল আনতে পারেনি শুনে কাল থেকে মনটা এমন খচখচ করছিল—এই নাও।'

'করো-কি করো-কি' বলে বরদা হাঁ হাঁ করে ওঠে, তাকে আমল না দিয়ে যতীন থলেটা মেঝেয় উবুড় করে দিয়ে বলে, 'দু-বেলা ভাত না হলে তোমার যে কী কষ্ট হয় জানি তো।'

কঠিন মুখে বরদা বলে, 'না, দুবেলা ভাত কোন ইস্যু নয়, এটা চ্যালেনজের প্রশ্ন। যুক্তফ্রণ্ট যে শায়েস্তা খাঁর আমল ফিরিয়ে আনার কথা বলেছিল—যুক্তফ্রণ্টের--'

'তিন সের আছে, সওয়া দুটাকা করে—'

বরদা বলে 'সওয়া দুই কেন তার ডবল হোক, গতবার চার হয়েছিল এবার আট হোক, চাল আমি আনতামই, বিকেলে গাড়ি পাঠিয়ে লাইন ধার থেকে আনতাম, যত দাম হোক—আমি শুধু দেখতে চাই গতবারেও যাদের আক্কেল হয় নি, আবার যারা ভোট দিয়ে ওদের এনেছে, গোরুর পাল সেই জনসাধারণ—'

'তোমার পেট্রল বাঁচিয়ে দিলাম।' যতীন বাহাদুরির হাসি হাসে। 'চলি—তাড়াতাড়ি আবার না ফিরলে—'

'দাঁড়াও না। এক কাপ কফি অন্তত—'

'খেয়েছি! এখুনি না গেলে—।' যতীন হাঁটা শুরু করে। বরদা সাথে সাথে চলে।

'ভালো কথা, কী করে ম্যানেজ করলে বললে না তো? মস্তানগুলো তো শুনেছি সব সময়—'

'ডাঁটা।'

'ডাঁটা?'

থলেটা উঁচিয়ে দেখায়, 'চার আনার এই ডাঁটা গাছটি কিনে--'

'তাহলে তোমার আরও চার আনা পাওনা বলো।'

'না না, ডাঁটার দাম তোমায় দিতে হবে না। তোমরা তো এসব খাওনা, হাই প্রোটিন ছাড়া তোমার বাড়িতে---'

'কিন্তু আমার জন্যেই যখন কিনতে হয়েছে—একটু দাঁড়াও টাকাটা নিয়েই যাও—'

'এখন না, পরে, টাকা পরে নেব। এখন একদম সময় নেই। চলি—'

ছুটতে ছুটতে যতীন আমড়াতলায় চলে আসে।

ওরা ফেরেনি। এরি মধ্যে ফেরা সম্ভবও না।

বয়েস ওদের তার অর্ধেকের কম হলেও ওদের ছোটার স্পীড তার

ডবল হলেও আমড়াতলা থেকে বরদার বাড়ি আর চৌধুরীপাড়ায় যতীনের বাড়ির ফারাকটাও তো চার ডবল।

হাঁফ ধরার প্রমাণ উবিয়ে দিতে বিরাট হাঁ করে যতীন ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে, থলে নামিয়ে রেখে কোঁচা দিয়ে মুখ বুক ঘাড় গলা রগড়ে রগড়ে ঘাম মোছে।

নীট বারো আনা! বরদার ওপর টেক্কা দিতে পেরে খুশিতে গর্বে মনটা যতীনের থই থই করে।

টেক্কা দিয়েছে মন্টুদের ওপরেও। আসুক না ওরা। এক গাল হেসে বলবে, ঠাট্টা করছিলাম রে, ঠাট্টা—রসিকতা। আফ্টার অল দেশকে তো আমিও ভালোবাসি, দেশ মানে তো দেশের মানুষ, দেশের মানুষের ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ—'

একটানা লেকচারে ওদের মুখ খোলার ফুরসৎ দেবে না।

'তবে তোদের বাড়াবাড়ি দেখে খানিক জব্দ করার জন্যে শুধু ডাঁটা কিনে—'

ঠা ঠা করে হেসে উঠবে।

'যুক্তফ্রন্ট এসেছে বলে কি ঠাট্টা-রসিকতাও করতে পারব না?'

ফের একচোট হাসি।

স্বয়ং নায়ক

ঘটুক ঘটুক, কিছু-একটা ঘটুক, এমন একটা-কিছু ঘটুক দুই ঠ্যাং ধরে জীবনটাকে যা ধোপার মত পটাপট আছাড় মেরে ধোপদুরুস্ত করে ছেড়ে দেবে।

প'য়তাল্লিশ বছরের চেনা মা বিশ বছরের চেনা বউ আঠারো ষোল চোদ্দ বারো বছরের চেনা ছেলেমেয়ে একঘেয়ে হয়ে গেছে মামুলী হয়ে গেছে নামতার মত মুখস্ত হয়ে গেছে। দুইয়ের নামতার মত।

এর চেয়ে ঝিটাকে মা বানিয়ে ফেললে মাতৃভক্তি ফের উথলে উঠবে। বয়েসে বছর পনেরোর ছোট ঝিটাকে। মেথরানিটাকে বউ করে নিলে ফুলশয্যার রাত ফিরে আসবে। বছর দশেকের বড় মেথরানিটাকে।

সেই সাথে সতু চৌধুরীর ডল পুতুলমার্কা নাতিনাতনীগুলোর বাপ হয়ে বসলে তো সোনার সংসার।

কিন্তু কতদিন ? সেই সোনার সংসারও কতদিন !

সব সংসারই গোড়ায় গোড়ায় সোনার হলেও শেষ অব্দি সোনার থাকে কোন্ সংসার ?

একঘেয়ে হয়ে যায় মামুলী হয়ে যায় দুইয়ের নামতার মত মুখস্ত হয়ে যায়।

ব্যবহৃত ব্যহৃত ব্যবহৃত হয়ে।

হয়ে যায় শুয়োরের মাংসের মতন। অফিসের কলিগ বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন ওই শুয়োরের মাংস। মা বউ ছেলে মেয়ে ওই শুয়োরের মাংস। বাহ্যে পেচ্ছাব হাসি কান্না কাজ আড্ডা ওই শুয়োরের মাংস। সব ওই শুয়োরের মাংস। সব সব সবকিছু।

খবরের কাগজ চমক আনে—লটারিতে লাখ ! চাঁদে মানুষ !

কিন্ত হাতে আচমকা পাঁচ লাখ এসে গেলেও এই দুনিয়াতেই তো থাকতে হবে ? চাঁদে পাড়ি দিলেও ফিরে তো দুনিয়াতেই আসতে হবে ?

এর চেয়ে পৃথিবীকে যদি এক লাথিতে চাঁদে পাচার করা যেত ! ওই শুয়োরের মাংসের মতন এই পৃথিবীটাকে !

'পৃথিবীটাকে চাঁদে ?' দু চোখ রাজীবের ঠিকরে বেরোয়।

গম্ভীর চালে বলে 'উঁহু, তাতেও লাভ হবে না। পৃথিবী বানচোৎ আমাকেও চাঁদে নিয়ে তুলবে।' দমকা শ্বাস ছাড়ে, 'আবার যে-কে সেই !'

'তোর কী হয়েছে বলতো ? কদিন ধরেই দেখছি' —

না তাকিয়েও টের পায় ভ্যাবচ্যাকাখাওয়া ভূপালকে লোকনাথ ইসারায় থামতে বলছে। তার দিকে আড়ে তাকিয়ে নিজের মাথায় আঙুলের টোকা দিতে দিতে বাকি সবাইকেও মুখ খুলতে মানা করছে।

হায়, ওরা ভেবেছে মাথায় আমার গোলমাল দেখা দিয়েছে। কিন্তু ওরা কি ভুলে গেল সাত দিনও হয়নি স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট পেয়েছি ? খানিক আগেই এঘরে এসে আমার কালকের স্টেটমেণ্টের তারিফ করে গেছে মেনন ? ওদেরই সামনে করে গেছে ?

আসলে ওরা এই জীবনের কেনা গোলাম। প্যাভলভের কুকুর। পান থেকে চুন খসলেই ওদের অস্বস্তি।

বেকুবের দল বাঁচতে ব্যাকুল।

কিন্তু বাঁচাটা কি এতই জরুরী ? জীবনের জের টেনে চলার চেয়ে ঝকমারি কিছু আছে ? গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়া বা ঠেসে ঘুমের বড়ি গেলা কি বেশি রোমাঞ্চকর নয় ? বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের-ঢের বেশি রোমাঞ্চকর ?

দুচার মাস মরে থেকে বেঁচে ওঠা অবিশ্যি সবার সেরা রোমাঞ্চ। কাশ্মীর-রাণীখেতে ঘুরে আসার মত।

কিম্বা কারো সাথে জীবনটা বদলাবদলি করে নেওয়ার ব্যবস্থা যদি থাকত ! দুচার মাসের জন্যে বদলাবদলি করে নেওয়ার ব্যবস্থা।

থাকলে কার সাথে বদলাত ?

রাষ্ট্রপতি গিরি থেকে বেয়ারা ভানু অব্দি জনাপঞ্চাশেককে বাতিল করে ভবতোষকে বেছে নেয়। পা-কাটা ভবতোষকে।

সকলের দুটি পা, ভবতোষের দুটোই হাঁটু থেকে ছাঁটাই। এমনটি আর কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।

দিনরাত বিছানাবন্দী। প্যান না ধরলে পেচ্ছাপ করতে পারে না। মুখ না বাড়ালে চুমো খেতে।

দুনিয়াটাকে তালাক ঠুকেও দুনিয়ার কাছ থেকে নিজের পাওনাগণ্ডা উসুল করে নিচ্ছে ষোল আনা। সাবাস ভবতোষ! সাবাস!

ভবতোষ হলো মালতীরও স্বামী? পা-ওলা ভবতোষের প্রেমে পড়ে পা-কাটা ভবতোষকে বিয়ে করে মালতী তার প্রেমের পরাকাষ্ঠার, মানে নিখাদ বাহাদুরির প্রমাণ দিয়েছে। স্বামীর পা গজালে নির্ঘাত সে খুশিতে পাল খাবে। নয়া বেহুলার ইণ্টারভিউয়ের জন্যে রিপোর্টাররা শকুনের পালের মত গিয়ে হামলে পড়বে।

ওভারটাইমের নামে এর-ওর সাথে সিনেমা-রেস্তরাঁ-হোটেলের ঘরে যাওয়া ছাড়ান দিয়ে আগের মত স্বামীর সাথে মালতী হররোজ অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরবে। হরগৌরী হয়ে ফিরবে।

কিন্তু জ্যোৎস্না কী করবে? পা-কাটা ভবতোষ স্বামীগিরি-ফলানোর জন্যে চড়াও হতে বললে জ্যোৎস্না কী করবে? লজ্জাবতী জ্যোৎস্নারাণী? সতীলক্ষ্মী জ্যোৎস্নারাণী?

'এই যে শশাঙ্ক—শোনো শোনো।' ভাবনা মুলতুবি রেখে হাঁকডাক শুরু করে দেয়। 'বোসো। সিগারেট খাও।'

'সিগারেট—'

'আমি অফার করছি—দোষ নেই—খাও।'

নিজেই শশাঙ্কর মুখে সিগারেট গুঁজে দেয়। ধরিয়েও দেয়।

'আচ্ছা ভাই, তুমি তো বিজ্ঞান বোঝো, প্রবন্ধটবন্ধ লেখ, রেডিওতে টক দাও—আচ্ছা বলো তো ভাই বিজ্ঞান কি এমন-কিছু ইনভেণ্ট করতে পারে যাতে মানুষ কিছু দিনের জন্যে মরে গিয়ে আবার বেঁচে উঠবে, কিম্বা প্রাণ চাইলে কারো সাথে জীবনটা বদলাবদলি—'

'মানুষ আদৌ মরবে কেন বলুন?' নাকে মুখে গল-গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শশাঙ্ক অভয় দেয়, 'ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এমন ব্যবস্থা করবে—'

'মানুষ মরবে না ?'

'দরকার না হলে মরবে না। যতদিন খুশি বাঁচবে।'

'যতদিন খুশি বাঁচবে ?'

'যতদিন খুশি। দু-চার শো বছর—'

'দু-চার শো বছর বাঁচবে ?'

'নিশ্চয় ! থিওরিটিক্যালি মানুষের দু চার-শো বছর বাচা কিছু আশ্চর্য না।' শশাংক সোজা হয়ে বসে। 'মানুষ মরে কেন ? শরীরের যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে যায় বলেই তো ? সেটা বদলে নিলেই ল্যাঠা চুকে গেল। এখন যেমন ব্লাড কিনতে পাওয়া যায় মানুষের পার্টসও তখন কিনতে পাওয়া যাবে।'

'হুম !' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে শুধায়, 'তা তোমার কবে নাগাদ মানুষের পার্টস বাজারে বেরোবে ?'

'সেটা বলা শক্ত দাদা। তবে বিজ্ঞান যেভাবে এগোচ্ছে—'

'কিন্তু মানুষের যেসব পার্টস চোখে দেখা যায় না—যেমন মন, আত্মা, বিবেক—সেগুলো? সেগুলোও কিনতে পাওয়া যাবে তো ?'

শশাংক যায় ঘাবড়ে।

'কী ? কথা বলছ না যে ? মন, আত্মা, বিবেক—'

'ওগুলো তো এখনই কিনতে পাওয়া যায়রে। তোর অন্তত জানা উচিত।'

রাজীবের কথায় কান না দিয়ে দুহাতে শশাংকর কাঁধ চেপে ধরে, 'ও ভাই ! জবাব দাও—ওগুলোও কি একদিন বাজারে বিক্রি হবে ?'

'আমি আসি দাদা' ! জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শশাংক উঠে দাঁড়ায়, সরে পড়ে।

ভারি দমে যায়। না তাকিয়েও বোঝে লোকনাথ ইশারা করেছে। তার দিকে আড়ে তাকিয়ে নিজের মাথায় টোকা দিতে দিতে ইশারা করেছে।

হায়, ওরা ভেবেছে মাথায় আমার গোলমাল দেখা দিয়েছে। কিন্তু ওরা কি ভুলে গেল সাতদিনও হয়নি স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট পেয়েছি ? খানিক

আগেই এ ঘরে এসে আমার কালকের স্টেটমেণ্টের তারিফ করে গেছে মেনন ? ওদেরই সামনে করে গেছে।

আসলে শশাংক জানে না যে মন আত্মা বিবেক যুক্তির ধার ধারে না। বিজ্ঞানের জারিজুরিও তাই খাটবে না।

এই মন নিয়ে এই আত্মা নিয়ে এই বিবেক নিয়েই দু-চারশো বছর তবে কাটাতে হবে ?

নতুন নতুন পার্ট'স কিনে দেহের খোল-নলচে পাল্টে ফেললেও ওগুলো থাকবে ইনট্যাক্ট ?

সেরেছে !

আতংকে দিশে হারাচ্ছিল, আইডিয়াটা হঠাৎ মাথায় উঁকি দেয়। চকিতে উঠে দাঁড়ায়। ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা অ্যাকাউণ্টসে গিয়ে ঢোকে। শশাংকর টেবিলে ঝুঁকে পড়ে।

হুকুমের স্বরে বলে 'একবার বাইরে এসো।'

'আ-আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত দাদা।' শশাংক হয়ে যায় নার্ভাস।

'জরুরী ব্যাপার, এসো।'

'ছুটির পরে—'

'না, এক্ষুনি—'

'কিন্তু এখন যে—'

'চাটুয্যের পারমিশান নিতে হবে ? চাটুয্যে আমাকে দেখেছে। আমার সাথে বেরোলে ওর বাপও কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু, আমার কথা যদি না শোনো—মেনন আমার হাতের মুঠোয়—'

'চলুন।' ভয়ে ভয়ে শশাংক উঠে দাঁড়ায়। পেছন পেছন আসে।

করিডরে তার কাঁধে দুই থাবা বসিয়ে শুধায়, 'আচ্ছা ভাই বিজ্ঞান তো এমন ব্যবস্থাও করতে পারে—'

'আমি বিজ্ঞানের কিছুই বুঝিনা দাদা বিশ্বাস করুন—আপন গড—আপনি অরিজিনাল লেখক আর আমি সায়ান্স ডাইজেস্ট পড়ে—কাঁধে লাগছে।' শশাংক কেঁদে ফেলার যো করে। 'আমায় ছেড়ে দিন—আপনার পায়ে পড়ি—'

'আঃ! ন্যাকামি কোরো না।' সস্নেহে ধমক হাঁকিয়ে জোরসে কাঁধে এক ঝাঁকানি দেয়। 'কথাটা আগে শোনোই না ভাই। ধরো. মনের সাথে বনিবনা হচ্ছেনা—অমি এক ডোজ ওষুধ খেয়ে মনটাকে বমি করে ফেললাম। তারপর মাংসের লোম বাছার মত বেছে, ভালো করে ধুয়ে ডিসইনফেক্ট করে ফের গিলে ফেললাম : বিবেকটা বাগড়া দিচ্ছে—অমি একটা স্ট্রং জোলাপ নিয়ে সেটাকে বের করে আনলাম—'

'হয়েছে! ওকে ছেড়ে দিয়ে এখন বাড়ি চলো।'

'মানে?' ঘুরে দাঁড়িয়ে রুখে ওঠে। 'তোরা? তোরা কেন—'

'বাড়ি চল।'

রাজীব আর লোকনাথ আচমকা দুপাশ থেকে জাপ্টে ধরে টানতে শুরু করে দেয়।

'কী হচ্ছে কী! ছেড়ে দে—ছেড়ে দে বলছি।'

'মেননকে বলা আছে—'

'মেনন কালই বলেছিল দরকার বুঝলেই—'

'ছেড়ে দে—নইলে কিন্তু—ভালো হচ্ছে না মাইরি!'

'মেননই তার গাড়িতে বাড়ি পৌছে দিতে বলেছে।'

'অফিসের ডাক্তার কাল বাড়িতে যাবে, তারপর—'

'তোরা কি ভেবেছিস—'

রাজীব বলে, আমরা কিছুই ভাবছি না দাদা। ভাবার যা ম্যানেজমেণ্ট ভাববে। পেয়ারের লোক যখন—'

লোকনাথ বলে, 'নেহাত কলিগ, অনেক দিন একসাথে যে কাজ করছি—'

'যাব না। কক্ষনো আমি—'

'সিন ক্রিয়েট করিস না সবাই জানে—এখুনি ভিড় জমে যাবে।'

'তখন দারোয়ানরা এসে চ্যাংদোলা করে—চল, ভালোয় ভালোয়।'

আক্রোশে অপমানে মাথা দপদপ করে। সত্যি সত্যিই সবাই তাকে পাগল ভেবেছে? সাতদিনও হয়নি যে স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট দিয়েছে, সকলের সামনে কালই যে তার স্টেটমেণ্টের তারিফ করে গেছে সেই মেনন পর্যন্ত?

অফিস ফাটিয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়েও সামলে নেয়। সে হবে আরও কেলেংকারি। আমি মাতাল নই বলে মাতালের গলাবাজির মত কেলেংকারি।

'আমিও এর শোধ তুলব।' হিসিয়ে ওঠে। 'নইলে আমার নামে কুকুর পুষিস।'

ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গটমট করে এগিয়ে যায়।

রাজীব আর লোকনাথকে বডিগার্ড বানিয়ে গটমটিয়ে যায়।

ভাগ্যিস ট্যাক্সিটা পেয়ে গিয়েছিলাম। গাড়ি আনতে রাজীব গ্যারাজে-আর সিগারেট কিনতে লোকনাথ দোকানে গেলে খালি ট্যাক্সিটা চোখে পড়েছিল ভাগ্যিস!

নইলে অফিসের ছোট সাহেবের গাড়িতে অফিসের দুই বন্ধু ভরদুপুরে পৌঁছে দিলে বাড়িতে নির্ঘাত মড়াকান্না পড়ে যেত।

কদিন ধরেই আড়ালে আড়ালে যা ফিশফাশ চলছে। কদিনেই মুখগুলি সবার যেমন আমসি হয়ে এসেছে।

গা ঘষাঘষি করেও আমল না পেয়ে 'তোমার কী হয়েছে বলো তো?' বলে কাল রাত্তিরে জ্যোৎস্না ফোঁপানি শুরু করেছিল, 'আমার কী হল গো!' বলে এখন শুরু করে দেবে ডিরেক্ট কান্না।

বউ কাঁদলে মা পিছিয়ে থাকবে না। কান্নার সাথী হওয়ার তরে ইস্কুল-কলেজ থেকে ছেলেমেয়েদেরও জরুরী তলব করা হবে। মেননের গাড়ি দাবড়ে রাজীব লোকনাথই হয়ত তাদের নিয়ে আসবে।

দরদ দেখানোর এমন মওকা পাড়াপড়শীই কি ছাড়বে! মুফতে দরদ দেখানোর এমন মওকা।

সে হবে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। যাচ্ছেতাই ব্যাপার। ভাগ্যিশ ট্যাক্সিটা পেয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু রাজীব লোকনাথ এখন যদি বাড়ি গিয়ে হাজির হয়? সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার জন্যে?

কাল যদি অফিসের ডাক্তার নিয়ে যায়?

ট্যাক্সি থেকে নেমে ডবল ডেকারের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

হায়! মরেও কি পার আছে! অপঘাত! মৃত্যুর যে পোস্টমর্টেম হয়! পোস্টমর্টেম হলে যে—

হু হু হাওয়াতেও ঘাম ছোটে।

'কাঁহা যানা সাব?'

'বিশুকা পাশ।'

'জী?'

'মানে—আর একটু আগে—সামনের মোড় মে।'

বিশু ছাড়া এখন গতি নেই। আফটার অল হাফপ্যাণ্ট বয়েসের বন্ধু। সেই বয়েসের যাবতীয় কীর্তির কমরেড। বিশুর কাছে লজ্জা কিসের!

সর্দারজীকে আস্ত একটা টাকা বকশিশ দিয়ে গলিতে ঢোকে।

কলিং বেল ঠেসে ধরে।

দরজা খোলে চাকর। 'কাকে চাই'?

'ডাক্তার বাবু আছেন?'

'এখন তো—'

'বলো, জরুরী দরকার—ভীষণ জরুরী দরকার—আমি ওর ছেলেবেলার বন্ধু—আমার নাম, বলতে বলতে নিজেই 'বিশু!' 'বিশু!' বলে হাক শুরু করে দেয়। চাকরকে ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ে। 'বিশু- বিশু—'

বিশু এসে বলে, 'আরে লেখক যে! কদ্দিন পরে! এই মাত্র খেয়ে উঠলাম। তুই না হলে—যাক, তারপর আছিস কেমন? বোস বোস। বঘু, তুই যা। বোস না।'

রেওয়াজ মাফিক মুখখানাকে হাসি হাসি করে তুললেও ভেতরে অস্বস্তি বোধ করে দারুণ।

ক বছরেই কী বদলে গেছে! চেহারার কী চেকনাই! বাড়িতেও শার্টট্রাউজার পরে থাকে! পাকা সাহেব!

এই বিশু কি সেই বিশু ইস্কুলে যে নাকের সিকনি আঙুলে নিয়ে আচারের মত চাটত?

'ওপরে যাবি? চল। শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাবে।'

'তোর বউ কোথায়?'

'ওপরে, ডাকব ?'

'না না না।' ওপরে যাওয়ার আতঙ্কে ধপ করে বসে পড়ে। হাঁটু মুড়ে বসে।

'ও কিন্তু তোর ভীষণ অ্যাডমায়ারার। আমি অবিশ্যি আজকালকার লেখার প্যাচট্যাচ—'

'মাসিমা—?'

'না তো গত বছর—'

যাক! খানিক স্বস্তি তনু। সোফায় গা এলিয়ে দেয়। 'আমি বড্ড বিপদে পড়ে—'

'বিপদ?' বিশু পাশে বসে। 'কিসের বিপদ?'

'হাসপাতালে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না, চেনাজানা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না আবার পাছে ব্ল্যাকমেল করে সেই ভয়ে অচেনা ডাক্তারের কাছে—'

'হয়েছেটা কী?'

'মাসখানেক ধরে যে আমার কী ভাবে কাটছে বিশু! চব্বিশ ঘণ্টা দুশ্চিন্তা! রাতে ঘুম হয় না, কেবল দুঃস্বপ্ন দেখি, জেগে স্বপ্ন দেখি, আবোল-তাবোল ভাবি, কাউকে সহ্য হয় না, কিছু ভালো লাগেনা—ভবিষ্যত ভেবে—কী যে ডেঞ্জারাস কণ্ডিসানরে বিশু!'

'ধেত্তোর! ব্যাপারটা খুলে বলবি তো!'

'ব্যাপারটা—।' ভেবেছিল গলগল করে কথা বলতে বলতে কথার তোড়ে বলে ফেলবে, কিন্তু সেটা না হয়ে ওঠায় চোখ মুখ প্রাণপণে কাতর করে তোলে। সাথে সাথেই আবার হাসে এক দফা। 'ব্যাপারটা—'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা কী? কী হয়েছে?'

'তুই ডাক্তার, ছেলেবেলার বন্ধু—'

'অফকোর্স।'

'ব্যাপার এক কাণ্ড!'

'মানে?'

'হল-কি অফিসে স্ট্রাইকের সময় মবলক কিছু টাকা হাতে এসে গেল—'

'স্ট্রাইকের সময় টাকা এসে গেল ?'

'ও কথা যাক। যা বলছিলাম—ভাবলাম এবার নতুন সাবজেক্ট নিয়ে নতুন টেকনিকে একটা উপন্যাস লিখব, তাই খানিক এক্সপিরিয়েন্সের জন্যে —কিন্তু এভাবে ফেঁসে যাব ভাবতেও পারিনি। স্ট্রিটওয়াকার হলেও মেয়েটাকে দেখে একবারও—'

'আচ্ছা!'

'তুই হাসছিস বিশু!' কঁকিয়ে ওঠে।

'হাসব না! গাড়োল কাঁহাকা! বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে হলে ম্যাকিনটোস পরে বেরোতে হয় জানিস না? ভিজলে সর্দি তো হবেই।'

'সর্দি ?'

'ও আজকাল সর্দির মতই। একটা কি দুটো কোর্সেই—'

'অ্যাঁ!'

চটপট সোজা হয়ে বসে। 'আর আমি কি না সুইসাইড করার কথা পর্যন্ত ভেবেছি। শুধু পোস্টমর্টেমে সব জানাজানি হয়ে যাবে বলেই—'

'শালা এই বুদ্ধি নিয়ে গপ্প বানাস! তুই একটা বোকা পাঁঠা। আস্ত বোকা পাঁঠা।'

মানানসই গালাগাল দিয়ে বন্ধুর পিঠে বন্ধু হাত বুলোয়, 'ভয় নেই রে ভয় নেই—ডোণ্ট ওরি। ব্লাডটা আজ দিয়ে যা, কাল থেকেই—চল, বউয়ের কাছে যাই।'

বন্ধু বন্ধুকে টেনে তোলে।

বিকল্প

অপর্ণা হাঁ হাঁ করে ওঠে। কিন্তু যা হবার ততক্ষণে হয়ে গেছে : চমকে চোখ মেলে চেয়েই দু থাবায় মাই আঁকড়ে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে অতি দুরন্ত ছেলে তার।

কি করলি বলত !

বকুল বড় অপ্রস্তুত হয়। বলে, আগে বুঝিনি দিদি !

কাল রাতভর জ্বালিয়েছে। দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি। কোথায় ভাবলুম খেয়ে-দেখে এখন একটু—

দিদি ! অপরাধী গলায় বকুল বলে, বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ—

অপর্ণা বলে, ভারি হুড়ুমবাজ তুই !

অপর্ণার স্বরে প্রশ্রয়ের আভাস পেয়ে বকুল বলে, যা বলেছ ! দাও না কানটা মলে। সাজা না পেলে আমি সায়েস্তা হব না।

হয়েছে ! কী বলছিলি বল শুনি ?

চুক চুক করে মাই খেতে খেতে পিট পিট করে তাকায় খোকন। সইয়ে সইয়ে গালে থাপ্পড় মেরে তার দুটি চোখ বুজিয়ে দেবার চেষ্টা করে অপর্ণা। কি বলছিলি, বল ?

বকুল বলে, খোকনকে আমার কাছে দিয়ে তুমি ঘুমোও দিদি। দেখো, এক ফোঁটা না কাঁদিয়ে ওকে আমি ঠিক রাখতে পারব। কী, বিশ্বাস হল না বুঝি ? দিয়েই দেখ আজ—।

ওমা ! মুচকি হেসে অপর্ণা বলে, বিশ্বাস হবে না, বছর পুরতে না পুরতে যে—

আঃ ! ধপ করে পাশে বসে অপর্ণার মুখ চাপা দিয়ে বকুল বলে, তুমি যেন কী ! পাশের ঘরে মা রয়েছেন না ? দাও, খোকনকে আমার কোলে দাও। আয় তো মাণিক।

খোকন আরও গুটিসুটি হয়ে শোয় মার কোল ঘেঁষে। মাকে আরও আঁকড়ে ধরে।

অপর্ণা বলল, শুধু মিষ্টি কথায় ভোলার ছেলে নয়, দেখছিস না? ও টের পেয়ে গেছে আর কমাস না গেলে তোর কাছে গিয়ে লাভ নেই।

মুখ লাল করে বকুল উঠে দাঁড়ায়।

চললুম! দিনকে দিন তোমার মুখটা যা হচ্ছে—

বোস ছুঁড়ি। বকুলের আঁচল ধরে অপর্ণা তাকে টেনে বসায়। তার ইচ্ছে হয় আরও দু-চারটি এমন রসিকতা করে, চোখমুখ যাতে বকুলের দগদগে ঘায়ের মত লাল টকটকে হয়ে ওঠে। অশ্লীল রসিকতায় অস্থির করে তোলে মেয়েটাকে—হাত চেপে ধরে বসিয়ে রেখে।

কী করবে তাহলে বকুল? কেঁদে ফেলবে? বয়েই গেল! কামড়ে-খামচে নাজেহাল করবে? ইস্! বলে দেবে প্রশান্তকে?

তা আসুক না প্রশান্ত ওই নিয়ে কিছু বলতে। সে মুখ থাকলে তো? জীবনে বিয়ে কক্ষনো করবো না—কী ধনুর্ভাঙা পণ! আর এখন? বিয়ের জল শুকতে না শুকতেই বাবা হতে চলেছে!

তা অন্যায় অবশ্য এতে কিছু নেই। ভরা বয়সে বিয়ে হলে অমন হয়ই। তারও হয়েছে। মানুষ মাত্রের হয়। তবে কিনা এমন মানুষ অভাবের অজুহাতে বিয়ে না করার পণ করেছিল কোন লজ্জায়? বছর বছর তার ছেলেপিলে হত বলে খোঁচা দিত কোন্ মুখে?

প্রায়-ঘুমন্ত ছেলেটা ঘুমের ঘোরে একটু নড়াচড়া করে উঠতেই ঠাস করে তার পিঠে এক চড় কষিয়ে দিয়ে আরও জোরে তাকে বুকে চেপে ধরে অপর্ণা। ছেলে কেঁদে ওঠে।

কেন মিছিমিছি মারলে দিদি! বেচারি ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম! হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি ওর। তা হাঁরে কী বলতে এসেছিলি, বললি না?

তুমি শুনলে না, একেবারে কুরুক্ষেত্র করবে দিদি!

আমি তো তাই করি। কিন্তু হয়েছে কী শুনি?

ওদিকে দেখ গিয়ে রান্নাঘরে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ!

কেঁচো খুঁড়তে সাপ! তা তুই-ই বা খাওয়া-দাওয়ার পর রান্নাঘরে

গিয়ে ছিলি কেন, ছোট? কেঁচোর খোঁজে? কেঁচোর বদলে সাপই তো ভাল রে!

খালি বাজে কথা তোমার। যা বলছি—যাওনা একবার, ওঠো—নিজে দেখে এসো। অপর্ণাকে ঠেলে তুলে দেয় বকুল। শিগগীর যাও। মহারাণী নাইতে গেছে এক্ষুণি এসে পড়বে?

আগে বলবি তো না ছুঁড়ি, কী ব্যাপার কী বিত্তান্ত?

মুখে আর কি বলব! দেখগে যাও—তৃতীয় তাকের বাঁদিকে দেয়াল-ঘেঁষে কলাই করা বাটিতে ঢাকা আছে। কেটে কেটে কথাগুলি বলে বকুল। বলে চোখমুখের ভাব রহস্যময় করে তোলে।

অগত্যা অপর্ণাকে যেতেই হয়। ছেলে কাঁকে নিয়ে মনে মনে গজগজ করতে করতে যায় অপর্ণা।

চটে যায় সে বকুলের ওপর। ছেলেমেয়ে একদিন তারও হয়েছে। সাতটি ছেলেমেয়ের মা সে। কিন্তু কই, প্রথম পোয়াতীই কি শেষ পোয়াতীই কি—এমন ছোঁক ছোঁক করে সব সময় তো হেঁসেল-ভাঁড়ার হাঁটকে ফেরেনি?

লেখাপড়া জানা কলেজে পড়া মেয়ে, তার ধরণই আলাদা। লাজলজ্জার যদি বালাই থাকে! এমনি তো মুখে কত বড় বড় কথা বি-এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছে, এম-এ পাশ না করা পর্য্যন্ত স্বামীকে ছুঁতেই দেবে না। যদি দেয়ও আঁটঘাট বেঁধে হুঁশিয়ার হয়ে, তবে।

অথচ—। বকুলের ওপর রাগতে রাগতে ফের অপর্ণা প্রশান্তর ওপর চটে যায়। অল্প মাইনের কেরাণীর বছর বছর বাবা হওয়া ভালো না, ভালো না। অমন করে গা এলিয়ে দিও না বৌদি দিও না। শুধু জন্ম দিলেই হয়? ছেলেমেয়ে মানুষ করা কি চাট্টিখানি কথা!—বৌদি হলেও গুরুজন সে—তার মুখোমুখি প্রশান্ত সেদিন এ-সব কথা বলত কি করে?

সেদিন মনে বড় বেজেছিল অপর্ণার। কেঁদে কেটে নালিশ জানিয়েছিল আরেকজনের কাছে: এ অপমানও তাকে সইতে হয়? হয় সে আরও বেশী করে টিউশানি করে আরও রোজগার বাড়াক, নইলে বউকে পাঠিয়ে দিক বাপের বাড়ি। জন্মের মত। মুখে ভাইরা যাই বলুক অভাগা বোনটাকে চোখের সামনে না খাইয়ে রাখবে না।

মানুষটা শুধু নির্বিকার হেসেছিল। বলেছিল, শান্তটার এবার বিয়ে না দিলেই নয়।

ঠাকুরপো বিয়ে করবে না।

বিয়ের আগে ও কথা আমিও বলতাম গিন্নি। বাবা বিয়ে দিতে দেরি করেছিলেন বলে। মেয়ে দেখে আমার পছন্দ হচ্ছিল না বলে।

ঠাকুরপো প্রতিজ্ঞা করেছে—

মেয়ে পছন্দসই হলে ও প্রতিজ্ঞা উবে যাবে। বলে একগাল হেসে তাকে সোহাগ ভরে কাছে টানতে যাচ্ছিল মানুষটা।

গা রী রী করে উঠেছিল অপর্ণার। ছিটকে সরে গিয়েছিল।

আজ অপর্ণার মনে হয়, কী ভুল ধারণাই করেছিল। নইলে বছর পুরতে না পুরতে—

অপর্ণার গা রী রী করে উঠে প্রশান্ত আর বকুলের ওপর। ওদের জন্যেই না স্বামী নিজে থেকে তাকে সোহাগ জানাতে এলেও তেজ দেখিয়ে সেদিন সে সরে বসে ছিল?

হায়, কে জানত! সেই দিনই মানুষটা অ্যাকসিডেণ্ট করে বসবে! তারপর মাস দুয়েক হাসপাতালে কাটিয়ে চলে যাবে। একেবারে!

বাপ হয়েও একটিছেলের মুখ দেখে যেতে পারবে না! যে মানুষ ছেলেমেয়ে অত ভালোবাসত!

ছেলের কপালে চুমো দেয় অপর্ণা, ঘুমন্ত ছেলেকে আদর করতে নেই জেনেও।

ব্যাপার সত্যিই মারাত্মক।

বাটি হাতে নিয়ে হনহন করে আসে অপর্ণা!

ও কি—ও কি দিদি—

বকুলের কথা সে গ্রাহ্য করে না। সোজা গিয়ে বিমলার ঘরে ঢোকে। থমথমে গলায় বলে, এই দ্যাখ দ্যাখ তোমার পেয়ারের ঝিয়ের কাণ্ড!

রামায়ণ কোলে জানালার দিকে চেয়ে ছিল বিমলা, অবাক হয়ে চড়ুইয়ের নাচ দেখছিল—একেবারে মুখের কাছে এনে বাটিটা অপর্ণা ধরতেই বিমলা ছি ছি ছি, করো কী করো কী বৌমা বলে আঁৎকে ওঠে।

দেখেছ ? দেখলে তো ? এবার বুঝলে তো ব্যাপার ?

বিমলা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

ফেটে পড়ে অপর্ণা, রোজ এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র হয়। তুমি শোন না মা !

তা কিছু কিছু শোনে বৈকি বিমলা। বেঁচে আছে যখন। কালা নয় যখন। সংসারের সাতেপাঁচে না থাকলেও কানে তার সবই আসে। মুখে কিছু না বললেও শুনে যেতে হয়। পেয়ারের ঝি বলে বউয়ের খোঁটা পর্যন্ত !

পচা হোক গলা হোক গলাকাটা দাম হোক মাছ না আনলে চলে না মহারাণীর ? কেন চলে না—বুঝলে তো এবার ? মাগীর নিজের যে মাছ ছাড়া ভাত রোচে না !

চিৎকার করে করে কথা বলে অপর্ণা। চোখ দিয়ে যেন তার আগুন ঠিকরোয়।

অপরাধী মুখে বসে থাকে বিমলা। তার পেয়ারের ঝি যখন অপরাধ তারই।

দেখে বেকুব বনে যায় বকুল। তার মনে হয়, এইবার সত্যি সত্যিই কেঁচোর বদলে সাপ বেরিয়েছে।

আশ্চর্য ! সামান্য ব্যাপার নিয়ে দিদি এমন একটা কাণ্ড করে বসবে জানলে সে কী কখনো বলত কথাটা ?

মাছ নিয়ে হইচই অবশ্য একটা না একটা রোজ লেগেই আছে। মাছ কেনার কী যে অসাধারণ ঝোঁক সুভদ্রার।

বিকেলের বাজার। সব দিন ভালো মাছ পাওয়া যায় না। দেখে আনে রক্তমাখা তাজা টুকরো, অথচ কড়াইয়ে দেওয়া মাত্র দ্যাখে দুর্গন্ধে বাড়ি মাথায়। সে মাছ কেউ পাতেও নেয় না। শেষ পর্যন্ত ঝুরি করে খেতে হয় একাই বকুলকে।

আবার কোন দিন জ্যান্ত কুচোকুচো মাছ আনল তো, বাচ্চাদের বেছে দিতে গিয়ে আরেক কাণ্ড। এ বমি করে ও ওয়াক তোলে।

এর ওপর একেকজনের রুচি আবার একেক রকম—কেউ এ মাছ খায় না, কেউ ও মাছ খায় না।

খাওয়া নিয়ে নিত্যদিন গোলমাল তাই লেগেই আছে।

অথচ মাছ না এনে ছাড়বে না সুভদ্রা। রাগমাগ করে দুদিন যদি বাদও দেয়, তৃতীয় দিন পাঁচ টাকার নোট হাতে পেয়ে গোটা একটা ইলিশই হয়ত কিনে আনল।

ইলিশ মাছ সকলেরই পছন্দ। ইলিশ মাছ হলে আর কোন তরকারিই কেউ পাতে নেয় না। ছেলে মেয়েরা তো শুধু মাছের তেল দিয়েই সব ভাত খেয়ে ফেলে, মাছ না হলেও চলে তাদের।

ওদিকে একদিনের বাজারে তিন টাকা খরচ করে ফেললেও হিসেবে সুভদ্রা ঠিকই আছে—এ মাছ দুদিন চলবে। হরে দরে সেই একই দাঁড়ায়।

সুতরাং সেদিন সকলেই তার বাজারবুদ্ধির তারিফ করে।

অপর্ণা পর্যন্ত দরদ দ্যাখায়, তুই খাবি কি দিয়ে সুভদ্রা ? আনাজ-তরকারি তো সব হবিষ্যি ঘরে দিয়ে দিলি।

আমার তরে ভেবনি বড় বৌদি। চার পয়সায় কচু এনিছি, চার বেলা ঠিক চলে যাবে খন। ও ঘরের ডাল দিও খন একটুকু।

দূর ! সস্নেহে অপর্ণা বলে। শুধু ডাল নয়, সেই সঙ্গে খানিকটা নিরামিষ তরকারিও সে হবিষ্যি ঘর থেকে সুভদ্রাকে এনে দেয়।

খেতে বসে সেদিন গোগ্রাসে ভাত গেলে সবাই। তাই দেখে চোখ দুটি সুভদ্রার চকচক করে।

কতদিন এটা লক্ষ্য করেছে বকুল। কথাটা বলেওছে প্রশান্তকে। ভারিক্কি চালে মাথা নেড়ে অধ্যাপক প্রশান্ত বলেছে, হয় হয়, এমন হয়। ওর নিজের বঞ্চিত সাধটা ও এই ভাবে পূর্ণ করতে চাইছে। সাইকোলজিতে একে বলে গিয়ে—

তোমার মুন্ডু ! কথার প্রতিবাদ করবার জন্যে নয়, অমন লেকচারি ঢংয়ে কথা বললে স্বামীকে আর স্বামী বলে মনে হয় না বলে কথার মাঝখানেই ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়েছে বকুল।

আজ, এখন, বকুলের মনে হয়, ধমকটা সে যা ভেবেই দিক দিত ন্যায়সম্মত ভাবেই : এই নাকি নমুনা বঞ্চিত সাধ পূরণ করার ? সবচেয়ে বড় পেটির টুকরোটা রেখেছে নিজের জন্যে ! ভেজে লাল কটকটে করে ! ভাজলেই মনে হয়, মুড়মুড় করছে মুখের মধ্যে। কাঁটাগুলি পর্যন্ত গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ! জলে ভরে ওঠে বকুলের মুখ।

কিন্তু যাই বলো, এই নিয়ে এত চেঁচামেচি করা ঠিক হচ্ছে না দিদির।

বামুনের বিধবা বলে দিদি আর মা মাছ খায়না—কিন্তু কায়েতের মেয়ে হয়ে ও যদি খায়, আপত্তি কিসের? ওর মাছ খাওয়া নিয়ে আপত্তি করতে পারে না কেউ। সে ওর নিজের খুশি। তবে?

আস্তে আস্তে বকুল বলে, দিদি। ও স্নান করে এসেছে। এখুনি রান্নাঘরে ঢুকবে।

ঢুকুক। মুখ ঝামটা দিয়ে অপর্ণা বলে, ঢুকুক। ঢুকে ওর মাছের বাটি না দেখে এসে বলুক—দ্যাখাচ্ছি মজা।

কিন্তু দিদি, একবার বিমলার একবার অপর্ণার মুখের দিকে চেয়ে বকুল বলে, ও মাছ খেলে তো আপত্তি করা যায় না?

যায় না?

মানে, ওদের মধ্যে তো বিধবারাও মাছ খায়। লজ্জায় ও হয়ত গোপনে খায়। এখন ধরা পড়ে গিয়ে যদি বলে—

তীব্র চোখে বকুলের দিকে তাকায় অপর্ণা।

বলি, তুই কী বলতে চাস ছোট?

থতমত খেয়ে বকুল বলে, না, আমি আর কী বলব? তবে কিনা এই নিয়ে ভর দুপুর বেলায় একটা হাঙ্গামা—

হাঙ্গামা! এর মধ্যে তুই শুধু হাঙ্গামাই দেখছিস, কেমন? আর এই মাছ খাওয়া নিয়ে ও যে দিনের পর দিন আমায় যা নয় তাই শোনায়? মার চেয়েও মাসির দরদে চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় করে? তখন? সবাই ভাবে আমি বিধবা হয়েছি বলেই বুঝি—

দিদি!

বড় বৌমা!

কেঁদে ফেলে অপর্ণা। দেখুন মা দেখুন। ও নিজে গিয়ে কোথায় এ নিয়ে ও মাগির কাছে কৈফিয়ত চাইবে, না ও-ই এখন আবার থামাতে আসে। ঝিয়ের মান বাঁচতে আমায় উপদেশ দিতে আসে!

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বকুল। বুক ঠেলে তার কান্না ওঠে। কী কথায় কী মনে করে বসল দিদি! ঝিয়ের কাছে মা-কে ছোট করবে—এত

ছোট মন বকুলের ? শাশুড়ীর কাছে পর্যন্ত নালিশ জানিয়ে বসল ? কেঁদে উঠল অমন হু হু করে ?

অপর্ণার প্রতি অভিমানে বুক বকুলের গুমরে উঠে।

দিনকে দিন কেন কেন এমন হয়ে যাচ্ছে দিদি ? ঠাট্টার ছলে সব সময় তাকে খোঁচা দেয়, সে গায়ে মাখে না। ভাবে, আহা ঠাট্টার সম্পর্ক, তায় সুযোগ পেয়েছে—করবে বৈকি ঠাট্টা! সেকেলে মানুষ, ঠাট্টাটা যদি বাড়াবাড়ি হয়ে যায়—হোক না। ঠাট্টা বইতো নয়!

কিন্তু আজ শাশুড়ীর সামনে তার নামে নালিশ জানিয়ে বসল!

ঘরে ঢুকে ফিস ফিস করে সুভদ্রা ডাকে, ছোট বৌদি!

ছোট বৌদি! বিরক্ত করিস না এখন, যা।

যাওয়ার বদলে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দেয় সুভদ্রা। বলে, বড় বৌদি অত আগুন কেন গা ? আমার ওপরেই চটেছে মনে হচ্ছে।

চটবে না! না না করেও বলে ফেলে বকুল, নিজে মাছ খাস, খাস—লুকিয়ে খাস কেন ? নিজের মাছ ছাড়া ভাত রোচে না, কিন্তু অন্য অজুহাত দিস কেন ?

কি বলছ গো ছোট বৌদি!

থাক! আর ন্যাকামি করিসনে। তাকের ওপর কলাইকরা বাটিতে কার জন্যে মাছ ভেজে তুলে রেখেছিস শুনি ?

আমি মাছ খাই!

ফের ন্যাকামো!

বিশ্বাস কর বৌদি মাছ আমি খাই না—তবে—

তবে কি ?

খানিক গুম হয়ে থাকে সুভদ্রা। অপলক বকুলের দিকে চেয়ে থাকে।

তবে কি শুনি ?

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সুভদ্রা বলে, খাইনে কিন্তু খেতে চাই!

খাইনে কিন্তু খেতে চাই! এ তুই কোন দিশী হেঁয়ালি শুরু করলি সুভো!

সুভদ্রা চুপ করে থাকে।

খাইনে কিন্তু খেতে চাই মানে কি—অ্যাঁ ?

কাঁদ কাঁদ স্বরে সুভদ্রা বলে, বললে কি তুমি পেত্যয় যাবে ছোট বৌদি।

মানে ?

ফের সুভদ্রা চুপ করে থাকে। লেখাপড়া জানা ছোট বৌদিকে কী করে কথাটা সে গুছিয়ে বলবে, বুঝিয়ে বলবে ? নিজেই কী স্পষ্টস্পষ্টি জানে—খাইনে কিন্তু খেতে চাইয়ের মানে ?

চুপ করে আছিস কেন, বল ? খাই না কিন্তু খেতে চাইয়ের মানে শুনে কৃতার্থ হই।

করুণ দুটি চোখ মেলে তাকায় সুভদ্রা। কাতর স্বরে বলে, তুমি বিশ্বাস করো ছোটো বৌদি—

সত্যি সে মাছ খায় না, তবে খেতে চায়। এই ঝোঁকটা চেপেছে তার বছর দেড়েক থেকে, বড় দাদাবাবু মারা যাওয়ার পর থেকে। সকলের সামনে যাই বলুক, আড়ালে বড় বৌদির কড়া হুকুম—সপ্তাহে একদিনের বেশি মাছ আসবে না। খরচ কমাতে হবে। কিন্তু বড় বৌদির মানা না শুনেও সে মাছ আনে কারণ এক টুকরো মাছ ছাড়া যে ছোট দাদাবাবু খেতে পারে না ? এটা জেনেও কেন মাছ আনা নিয়ে এত জেদাজেদি করে বড় বৌদি ? আড়ালে তার ওপর রাগারাগি করে ? খরচ বাঁচাতে ? কিন্তু বলুক দেখি কেউ একটি দিনও সুভদ্রা মাছ আনতে গিয়ে হিসেবের বেশি খরচ করেছে। তাছাড়া সংসারের গিন্নি হয়ে বড় বৌদি খরচটাই শুধু দেখবে ? যে মানুষটা উদয়াস্ত খেটে সংসারটাকে টিকিয়ে রেখেছে—হড়বড় করে কথা বলছিল সুভদ্রা, শেষ দিকে তাও জড়িয়ে যায়।

ও কথা বাদ দে সুভো। দীর্ঘশ্বাস চেপে বকুল বলে—

কথাটা মিথ্যে নয়, তবু সুভদ্রার মুখে শুনতে কানে বড় বাজে। বড় বেশি মাথার কাজ করতে হয় প্রশান্তকে, তাই আধসের দুধ রাখার কথা একদিন সে আভাসে বলেছিল অপর্ণাকে—তা নিয়েও কি অশ্লীল ঠাট্টা অপর্ণার ! ঠাট্টা করেও যদি দুধের বরাদ্দটা ঠিক করে দিত !

যাক, কি বলছিলি—?

বাড়ির ঝি সুভদ্রা মাইনে করা দাসী। সে কেন ভাববে ছোট দাদাবাবুর কথা ? কোন অধিকারে ভাববে ? তাই সুভদ্রা মাছ কেনে নিজের নাম

করে, নিজে মাছ খাবে বলে কেনে, নিজের জন্যে এক টুকরো মাছ তুলে রাখে। খাবে বলে।

কিন্তু বিধবা মানুষের কি মাছ খেতে আছে ?

মনে পড়ে যায় খাওয়ার সময়।

আস্তাকুঁড়ে তখন ফেলে দেয় মাছের টুকরোটি।

এমনি রোজ।

কিন্তু বাজারে গিয়ে মাছের গন্ধেই ছোট দাদাবাবুর কথা মনে পড়ে যায়। তখন ঠিক করে, কাল থেকে নিশ্চয় সে মাছ খাবে।

প্রথম দিকে শুধু গন্ধ শুঁকে ফেলে দেবে—গা গুলিয়ে ওঠা মাত্র। তারপরের দিন খাবে এক টুকরো ভেঙে নিয়ে। তারপর একটু একটু করে। খেয়ে খেয়ে অভ্যেস করে ফেলবে। এমন অভ্যেস যে মাছ ছাড়া আর রুচবে না তখন। অবিকল ছোট দাদাবাবুর মত। প্রকাশ্যে তখন মাছ আনবে কী ক্ষতি তাতে। মাছ খায় না সে বড় বৌদির জন্যে। আহা ! মাছঅন্ত প্রাণ ছিল যার, বিধবা হয়ে সে এখন মাছ ছোঁয় না—তাঁর সামনে আরেক বিধবা সুভদ্রা কী করে মাছ খায়, হলই বা সে কায়েতের মেয়ে।

আর কারো জন্যে না হোক মাছ আনবে তখন নিজের জন্যে অন্তত। দরকার হলে নিজের মাইনের টাকা থেকেই আনবে। কী হবে তার টাকা জমিয়ে ? কে আছে তার সংসারে ?

তাহলে তো বড় বৌদি আপত্তি করতে পারবে না।

তারপর—তার মাছ থেকে দুবেলা দুটুকরো দেবার নাম করে সবটুকু রেঁধে দেবে ছোট দাদাবাবুকে।

তখন তো বড় বৌদি খরচের কথা বলতে পারবে না।

একটানা কথা বলে যায় সুভদ্রা। উল্টোপাল্টা কথা। আবোলতাবোল কথা। গাঢ় গলায়। বোজা গলায়।

কিন্তু সব কথার সেরা কথাটা বুঝতে আদৌ দেরি হয় না বকুলের। হঠাৎ দুই চোয়াল তার শক্ত হয়ে ওঠে, দপ করে জ্বলে ওঠে চোখ।

বটে ! তিক্ত স্বরে বকুল বলে, ছোট দাদাবাবুর ওপর দরদে যে বুক ফেটে যায় রে তোর !

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে সুভদ্রা, যায় ছোট বৌদি যায় ! জানো,

আরেকটা মানুষও যে মাছ বড় ভালবাসত বৌদি। মরার কালে সে এক টুকরো মাছ খেতে চেয়েছিল, দিতে পারিনি – পয়সা ছিল না বলে দিতে পারিনি বৌদি! সে কথা ভাবলে যে আজও মোর বুক ফেটে যায় গো!

একটু থেমেই ফের সুভদ্রা বলে, তা ছাড়া—মানুষের জীবন বৌদি, বলা কি যায়—দেখলে তো বড় বৌদিকে! ওনার মত আমিও যে মাছ বড় ভালোবাসতুম বৌদি!

রাগ করবে কি সহানুভূতি জানাবে কি হঠাৎ-আতঙ্কে বকুল দিশেহারা।

পরিশিষ্ট

বউয়ের ওপর যতীন সেদিন চটে যায়ঃ সাতটা না পাঁচটা না একটা বোন। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এসে পড়েছে। চাকরি করতে ঠেলে পাঠাল? ছ' মাস পুরতে না পুরতে চাকরির জোয়ালে যুতে দিল!

নিজেরা একটু কষ্টফষ্ট করে থাকলে আরেকটা মানুষের খাওয়া-পরা হয়ে যেত না? সামান্য একটা বিধবা মানুষের?

বউয়ের ওপর চটে যতীন আজও যায়ঃ মান! গরিবের আবার মান! পেটের জন্যে লড়াইতে অপমান! লড়াই না করলে দাবি আদায় হয়? সোজা আঙুলে ঘি ওঠে? গত বছর যে তারা তিন মাসের বোনাস আদায় করল—

তোমাদের কথা বাদ দাও! সুবালা ঝামটা দিয়ে ওঠে, তোমাদের ওখানে মেয়েছেলে কাজ করে? করে? করে?

কিন্তু চটকলে? হাওড়া জুট মিলে যে শয়ে শয়ে—

যত্তসব তেলেঙ্গি!

আচ্ছা! তেলেঙ্গি মেয়েছেলে মেয়েছেলে না?

বাঙালি মেয়েছেলে আর তেলেঙ্গি মেয়েছেলে এক? কী বুদ্ধি!

অ! খানিক থমকে থেকে হঠাৎ যতীন গলা চড়ায়, কিন্তু সেনবাবুর মেয়ে শীলা? কলকাতার অফিসে কাজ করে না? মিছিলে বেরোয় নি? খবরের কাগজে শীলার ছবি তুমি দ্যাখোনি? দ্যাখোনি?

শীলার সাথে ঠাকুরঝির তুলনা?

কেন না? দস্তুরমত বাঙালি—দুজনেই দস্তুরমত—

বাঙালি হলেই হল? ওদের চালচলন—জানো না, না ন্যাকা সাজছ? ওরা যা পারে তোমার বোন তা পারবে? দেবে তুমি পারতে? কই জবাব দাও?

এটা অবিশ্যি ভাবার কথা। সেনবাবুর মেজ মেয়ে এক সোয়ামীকে

তালাক ঠুকে আরেক সোয়ামী নিয়ে দিব্যি ঘর সংসার করছে। সেজ মেয়ে বেজাতে বিয়ে করেছে। চাঁপার দেড়া-বয়সী শীলা এখনও আইবুড়ো। সেজেগুজে অফিসে যায়। রাত করে বাড়ি ফেরে। পীরিতফীরিত করে নাকি।

চাঁপাকে শীলার সঙ্গে এক করে ভাবা মুশকিল বইকি। গেরস্ত ঘরের মেয়ে পথের ধারে না খেয়ে বসে থাকবে, সবাই সঙ দেখতে আসবে—মাগো! নিজেকে সুবালা চাঁপার জায়গায় কল্পনা করে শিউরে ওঠে। কত ধরণের লোক। ভালো-মন্দ কত জাতের লোক আছে। কে কী চোখে তাকাবে! কে কী বলে বসবে!

কী দরকার ভাই এই হুজ্জোতে? যা পাচ্ছিনে—

চাঁপা বলে, আমার হয়ত দরকার নেই। আমার দাদা আছে তুমি আছো। আমাকে তোমরা ফেলবে না জানি। কিন্ত যাদের এই চাকরি করে সংসার চালাতে হয়, আজকালকার বাজার আশি-নব্বুই টাকায়—কী অবস্থা তাদের ভাবো দেখি? কুন্তিদির কথাই ধরো না। মেয়ে মরে যেতে তিনটে নাতি-নাতনী জামাই ঘাড়ে চাপিয়ে গেল, যোগেশদা বাতে অথর্ব—কুন্তিদি মাইনে পায় আটাত্তর টাকা। আটাত্তর টাকায় পাঁচজন! মোহনদা গোড়া থেকে আছে, পঁচানব্বুই টাকা! বাড়িতে খাওয়ার লোক—

নবরূপার দারোয়ান থেকে অপারেটর পর্যন্ত কে কত বছর চাকরি করছে. কে কত এখন মাইনে পায়, কার বাড়িতে কতগুলো মুখ—গড়গড় করে চাঁপা বলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয় বছর বছর কী রকম বাড়ছে কোম্পানীর মুনাফার বহর। মুনাফার টাকায় কলকাতায় ফ্ল্যাটবাড়ি বানাচ্ছে, আমতায় নতুন হাউস খুলছে। অথচ যাদের মেহনতে এই মুনাফা—

সুবালা তাজ্জব। বছর খানেক চাকরি করেই দিন দুনিয়ার হালচাল মেয়েটা এমন জেনেবুঝে গেছে! জলের মত বুঝিয়ে দিচ্ছে!

আসলে তবে হাবাগোবা নয়? বারচালাক না হলেও হাবাগোবা নয়।

চাকরি করতে পাঠিয়ে তবে ঠিকই করেছিল? সেনবাবুর মেজ মেয়ের কাণ্ড দেখে চাকরি করতে পাঠিয়ে মোহনের চালচলন দেখে চাকরি করতে পাঠিয়ে।

সোয়ামী জলজ্যান্ত থাকা সত্বেও ওই ধুমসী মাগী যদি ফের বিয়ে

করতে পারে, চাঁপা পারে না ? আঠারো বছরের বিধবা মেয়েটা ! মোহনের মত ছেলেকে !

এই বয়েসে বিধবা হয়ে সামলে থাকা সহজ কথা ! আজকালকার দিনে সামলে থাকা !

নিতাইয়ের ভাইঝিটার মত কাণ্ড করে বসার চেয়ে বিয়ে করা ভালো নয় ? ঢের ঢের ভালো নয় ?

লোকে টিটকারি দেবে ? বয়ে গেল ! বিয়ে করে মেয়েটা যদি সুখী হয় কী আসে যায় লোকের টিটকারিতে ।

তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, আপত্তি কোরো না । সুবালার দু' হাত চাঁপা জড়িয়ে ধরে !

হুম্ ! দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুবালা শুধায় মোহনও থাকবে তো ?

থাকবে না ! মোহনদাই তো নেতা ।

বড় ভালো ছেলে মোহন ! বড্ড ভালো ছেলে ! বলতে বলতে চাঁপার চোখ-মুখ সুবালা যাচাই করে । মোহনের মত ছেলে জন্মে দেখিনি ! মোহনের মত—

ও-ও তোমায় খুব ভক্তি করে বৌদি । বলে, বৌদির মত বুঝ-সুঝ—

ওমা, বলে বুঝি ! হাসিতে সারা মুখ সুবালার ভরে যায় ।

যতীন বলে, হুঁ হুঁ বাবা ! কার ইস্তিরি দেখতে হবে তো !

মরণ !

এরপর রাজি না হয়ে উপায় থাকে না ।

তবু সুবালার খটকা যায় না. কিন্তু একটা কথা বুঝি না ভাই—দোষ করল মালিক, তোমরা কেন না খেয়ে থাকবে ?

যতীন বলে, এও লড়াইয়ের একটা কায়দা ।

কায়দা ? পরের দোষে নিজে উপোস করা কায়দা ? চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার কায়দা ?

বাঃ, গান্ধীজীই তো প্রথম—

থামো বাপু থামো ! ওনার কথা আর বোলো না । ওনার চেলাদের রাজত্বিতে যা সুখে আছি !

ছোলার ডাল ধোঁকার ডালনা বেগুন ভাজা লুচি ।

নিজের হাতে সুবালা সব রান্না করে। চাঁপাকে হেঁসেলের কাছেও ঘেঁষতে দেয় না।

পরেশের সাইকেলে যতীন রামরাজাতলা দাবড়ে আট আনায় চারটি সন্দেশ নিয়ে আসে।

তোমরা কি পাগল হলে বৌদি!

ছোলার ডাল তুমি ভালোবাসো ঠাকুরঝি।

ধোঁকার ডালনা ছেলেবেলায় তুই ভালবাসতিস চাঁপি।

তাই জন্মের শোধ খাইয়ে দিচ্ছ দাদা?

হারামজাদী! মারব এক থাপ্পড়—

বালাই ষাট! কী কথার ছিরি! যেমন ভাই তেমনি বোন!

চাঁপা হাসে খিলখিল করে।

যতীন আজ আগে খেতে চায় না। বোনকে পাশে নিয়ে খাবে।

ননীরাও বায়না ধরে পিশির সাথে খাবে।

আবার সুবালাকে বাদ দিয়ে খেতে চাঁপা নারাজ।

যতীন বলে, এক কাজ করলে হয় না—সেনবাবুদের মত সবাই এক সাথে—

চেয়ারটেবিলে বসে? যত্ত সব ঢং!

চেয়ার টেবিল নেই তো কী হয়েছে। বড় ঘরের মেঝেয়—

লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না?

লুচির আবার ঠাণ্ডা গরম!

অত থালাই বা কোথায়?

থালা অবিশ্যি কোন সমস্যা নয়! পাবলেব কাছে চাইলেই হয়। গরম মশলা নেই জেনে যেচে দিয়ে গেছে, ময়দা কম দেখে ধার দিতে চেয়েছে—তিন খানা থালা দেবে না?

কিন্তু খাবারে যদি টান পড়ে?

ভালো ভালো খাবার দেখে সকলের খিদে যদি আজ ডবল হয়ে যায়?

ধমকধামক দিয়ে চার ছেলেমেয়েকে সুবালা আগে খাইয়ে দেয়। তারপর গায়ে হাত বুলিয়ে মিনতি করে যতীনের সাথে চাঁপাকে বসায়।

খাওয়া হয়ে গেলে চাঁপাকে বলে, তাড়াতাড়ি এখন গিয়ে শুয়ে পড় দেখি! যাও!

এত তাড়াতাড়ি আমি শুই ? ইস্ট্রাইক না হলে ফিরতুমই তো—

বাজে বোকোনা। কাল ভোরেই—ওকি ! রাখো—রাখো !

এঁটো বাসনগুলো—

রাখলে ! চাঁপাকে টানতে টানতে হেঁসেলের বাইরে নিয়ে আসে। লক্ষ্মীটি ভাই ! আজ আমার কথা শোনো। ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো তারপর ছুটি নিয়ে সাতদিন তুমি সংসার ঠেনোখন, আমি কুটোটিও নাড়ব না।

তুমি এমন করছ না বৌদি—!

জানো না তো ঠাকুরঝি কালকের কথা ভেবে বুকের ভেতরটা আমার কেমন করছে !

লুচি আছে সাতখানা। একটু ধোঁকার ডালনা। দুটি বেগুন ভাজা। ছোলার ডাল শেষ।

চারটি সন্দেশের দুটি ননীদের চাঁপা ভাগাভাগি করে দিয়েছে। জোর করে যতীনকে একটি খাইয়েছে। বাকিটার আধখানা নিজে খেয়ে আধখানা সুবালার জন্যে রেখে গেছে।

চারখানা লুচি দুটি বেগুন ভাজা আর ধোকার ডালনাটুকু সুবালা আলাদা করে তুলে রাখে। বড ভালোবাসে মেয়েটা ছোলার ডাল। ইশ, ননীদের একটু ঠেনে দিত যদি ! যতীনকে অত সাধাসাধি না করত যদি !

যতীনের পাত-কাচা ডাল দিয়ে লুচি তিনটি খায়। আধখানা সন্দেশ। তারপর এক ঘটি জল শেষ করে হেঁসেল গুছোয়।

সকাল থেকে উপোস। সুর্য ওঠার আগেই খাইয়ে দেবে। অম্বুবাচিতে তো অমন খায়। শিবরাত্রির সময় নিজেও সে খেয়েছে।

কবে হাঙ্গামা মিটবে কে জানে ! কতদিন উপোস করে থাকতে হবে কে জানে !

রাতভর ছটফট করে কাক ডাকা মাত্র সুবালা উঠে পড়ে।

তার সাড়া পেয়ে চাঁপাও খিল খুলে বেরোয়।

তুমি এখনই উঠলে কেন ?

ঘুম ভেঙে গেল বৌদি।

ঘুম হয়েছে ?

হবে না ! অমন খাওয়ার পর—

তুমি মুখে জল দাও। আমি চট করে জনতা ধরিয়ে চা করে ফেলি।

চা তো আমি আজ খাব না।

মানে ?

বারে! আজ থেকে—

কোথায় চারখানা লুচি দুটি বেগুন ভাজা একটু ধোঁকার ডালনা দিয়ে চা জলখাবার খাবে—না চা-ই খাবে না!

অমন চায়ের নেশা তোমার—দুখানা লুচি দিয়ে—দিন হতে এখনও দেরি আছে ঠাকুরঝি!

কথা না বলে চাঁপা ঘাড় নাড়ে।

ঠাকুরঝি! সুবালা হাত ধরে। কেউ জানবে না। কারুকে আমি—

আমাকে তো কেউ ঠেলে পাঠাচ্ছে না বৌদি। নিজে থেকে যাচ্ছি। কেন তবে জোচ্চুরি করব ? কার সাথে করব ? উচিত জোচ্চুরি করা ?

মুখোমুখি তাকিয়ে এমন কেটে কেটে কথাগুলি বলে চাঁপা যে সুবালার মনে হয় এর চেয়ে ঠাস ঠাস করে তার গালে যদি কয়েকটা চড় কষিয়ে দিত! সরাসরি চড় কষিয়ে দিত!

তোমার ভারি দেমাক ভাই!

বৌদি!

ব্যাটা ছেলের মত রোজগার করো বলে তুমি ভাবো—

গাল দিচ্ছ বৌদি! দুহাতে সুবালার গলা জড়িয়ে ধরে কাতর স্বরে চাঁপা বলে, আজকের দিনে তুমি আমায় গালমন্দ করছ! সাত সকালে শাপ দিচ্ছ!

বুকের সাথে চাঁপাকে সুবালা পিষে ফেলতে চায়।

দরজায় দাঁড়িয়ে ঘুম ঘুম চোখে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে সারা দেহমন যতীনের চনমনিয়ে ওঠে: যাবে নাকি ? যাবে ? যাবে ? এক লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ে এক সাথে ওই দুটোকে জাপটে ধরবে!

চাঁপার দিদিমার বয়সী হলেও কুন্তিত সধবা মানুষ। ফর্সা লাল পাড় শাড়ি ছিটের শেমিজ কপালে সিঁথেয় দগদগে সিন্দুর থলথলে শরীরে বেশ গিন্নিবান্নি দেখাচ্ছে।

পাটভাঙ্গা প্যাণ্ট শার্টে মোহনকেও মানিয়েছে চমৎকার। পাছায়-তালি প্যাণ্টে। কলার ফাঁসা শার্টে।

আর চাঁপার পরনে কিনা আধময়লা থান! গায়ে ঢলঢেলে লং-ক্লথের ব্লাউজ! হাত গলা কান খাঁ খাঁ!

কাপড়টা বদলে নাও ঠাকুরঝি।

থাক।

থাক কেন। দু মিনিট তো লাগবে। আমি বের করে দিচ্ছি—

মিছে হাঙ্গামা করবে বৌদি। চাঁপা হাসে।

এ হাসির মানে সুবালা বোঝে। করুণ এই হাসির মানে। কাল এটা বেচে রাখলে না কেন? রাত্তিরেও বেচে টান টান করে মেলে দিলে—

খেয়াল ছিল না।

কালো-পাড় সাদা শাড়ি আমারও ছাই নেই যে—

পারুল বলে, আমার আছে, দেবরে চাঁপি? কালো হলেও পাড়ে একটু চুড়ি-কাটা, তা ওতে কিছু এসে যাবে না। দেব?

আমি তো নেমন্তন্য খেতে যাচ্ছি না পারু মাসি।

সুবালা বলে, কারখানা ছুটির পর ও তোমায় দেখতে যাবে। গিয়ে যদি দেখে আদুরে বোনটিকে ভাজ ঝিয়ের বেশে পাঠিয়েছে—ফিরে আমায় আস্ত রাখবে!

বিভা বলে, কাপড় না বদলাস না বদলালি—হাত গলা একেবারে খালি! ধেৎ!

বিভাদি!

না বাপু, এ তোমার বাড়াবাড়ি।

বলো। তোমরাই বলো। সবাইকে সাক্ষী মানে সুবালা। তারপর 'বাধা দিলে আমার মাথা খাও ঠাকুরঝি, আমার মরা মুখ দেখ ঠাকুরঝি!' বলে চটপট নিজের কান থেকে ইয়ারিং খুলে হাত থেকে সোনার চুড়ি দুগাছা খুলে জোর করে চাঁপাকে পরিয়ে দেয়।

আমার হারটা পরবে মাসি? পরো না গো। গলা থেকে হার খুলে বুঁচি এগিয়ে দেয়।

বিভার মা বলে, এই বেশ ভালো হল। বাঃ!

ঝরঝর করে চাঁপা কেঁদে ফেলে।

আর জন্মে তুমি আমার মা ছিলে বৌদি!

বড় খুকি বেঁচে থাকলে তোর বয়েসীই হত লো।

সুবালাকে প্রণাম করে বুঁচিকে চাঁপা জড়িয়ে ধরে। তুই আমার বোন ছিলি! মায়ের পেটের বোন ছিলি।

চাঁপাকে বুঁচি প্রণাম করে। তার দেখাদেখি ননী ফণীরা। পারুলের দুই ছেলে, বিভার মেয়ে।

পারুল, বিভা, বিভার মাকে প্রণাম করে চাঁপা।

বিভার মা বলে, দুগ্গা দুগ্গো! সাবধানে থাকিস মা।

আশীর্বাদ করুন মাসিমা যেন—

করছি না! দুগ্গো দুগ্গো!

গলিতে ছোটখাট ভিড় জমে গেছে। বস্তির সবাই বেরিয়ে এসেছে। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই।

গলির মুখে সেনবাড়ির দোতলার বারান্দায় কর্তা গিন্নি ছেলেমেয়েরা ঝুঁকে পড়েছে।

সুবালা বলে, কুন্তিদি, একটু দেখবেন। মোহন, একটু দেখ ভাই। ছেলেমানুষ, কখনো তো এসব—

ছেলে মানুষ! মোহন হাসে। ওকে আমরা ঝান্সির রাণী বলি বৌদি! ওর তেজ তো জানেন না!

চাঁপা চোখ পাকিয়ে তাকায়।

দেখে মন সুবালার ভরে যায়।

হঠাৎ ফুলওলা পতিতের সাত বছরের খোঁড়া নাতিটা 'দাঁড়াও গো দাঁড়াও গো' বলে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে তিনটে গাঁদা ফুলের মালা হাতে দৌড়ে আসে। দাদু পাঠ্যে দিল। তোমাদের পইরে দিতে বলল।

মোহন কুন্তি চাঁপা উবু হয়ে হয়ে মালা পরে।

আসি বৌদি। আসি মাসিমা।

দুগ্গা দুগ্গো!

মালা পরে হাসিমুখে তিনজনে এগোয়। পিছনে মিছিল।

বেলা নটায় যায় মিছিল করে ফুলের মালা পরে হাসিমুখে, বেলা তিনটেয় যতীনকে জড়িয়ে ধরে রিকশা থেকে নামে হাউ হাউ করে কাঁদিতে কাঁদতে।

কপালে ব্যাণ্ডেজ! ব্লাউজে রক্তের দাগ।

আমরা হেরে গেলুম বৌদি!—হেরে গেলুম মাসিমা! হেরে গেলুম! হেরে গেলুম!

খেতে বসে সুবালা দু গেরাসের বেশি মুখে তুলতে পারে নি। মেয়ের বয়সী মেয়েটা উপোস করে রইল কোন্ আক্কেলে সে ভাত গেলে!

লুডো খেলার জন্যে বিভা ডাকলে গুল দিতে হবে বলে এড়িয়ে গেছে। গুল দিতে বসে শুধু গোবর ছেনেছে।

রেডিও শুনবি সুবালা? নতুন ব্যাটারী এনেছে। আয়।

তুই শোন পারু। আমার ভালো লাগছেনা। মনটা বড় ছটফট করছে।

মনের ছটফটানি তবে মিছে নয়?

ব্যাকুল স্বরে সুবালা শুধায়, কী হয়েছিল ঠাকুরঝি? কে এমন সর্বনাশ করল?

যতীন বলে, মালিকের গুণ্ডারা। বোমাতে কুন্তিদির একটা হাত উড়ে গেছে বৌদি!

হাত উড়ে গেছে! সুবালা পারুল বিভা বিভার মা একসাথে আঁতকে ওঠে।

মোহনদাকে পুলিশ পিটতে পিটতে ধরে নিয়ে গেছে। হেরে গেলুম বৌদি! হেরে গেলুম! হেরে গেলুম!

বিভার মা শুধায়, কী হয়েছিল বাবা? গুণ্ডারা বোমা মারল? ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেল? কী দোষ এরা করেছিল?

যতীন বলে, বড় ভীষণ দোষ মাসীমা। শান্তিভঙ্গ।

শান্তিভঙ্গ?

নয়! পরম শান্তিতে মালিক মুনাফা লুটছিল, এরা বাগড়া দিল। প্রথমে স্ট্রাইক, পরে হাউসের সামনে হাঙ্গার স্ট্রাইক—মালিকের মনে শান্তি থাকে?

তাই বলে ওই ষাট বছরের বুড়োটাকে বোমা মারল যতীনদা? বড্ড বাহাদুর তো!

গুণ্ডারা অমন বাহাদুরই হয়রে বিভা!

পুলিশ কিছু বলল না? বলল না মানে? পাছে আরও শান্তিভঙ্গ হয়, মোহনকে তাই মারতে মারতে ধরে নিয়ে গেল না!

তুমি কী করে খবর পেলে?

এসব খবর চাপা থাকে না পারু। খবর পাওয়া মাত্র ছুটী করিয়ে হাসপাতালে গেলুম—যাকগে, চাঁপিকে এখন কিছু দাও ননীর মা। নরেশবাবু বলেছে—

খাবো না! কখনো আমি খাবো না! সুবালার বুকে মুখ গুঁজে চাঁপা অঝোরে কাঁদে। হেরে গেলুম বৌদি! হেরে গেলুম! হেরে গেলুম!

বোকা কাহাকা! লড়াইতে হারজিৎ আছেই। খেয়ে নে। নরেশবাবু তো তোর সামনেই বলল—

পারুল বলে, খেয়ে নে চাঁপি। নরেশবাবু যখন বলেছে তখন আর কথা কি। ভাত আছে সুবালা?

সুবালা ঘাড় হেলিয়ে জানায় আছে।

বিভা বলে, আমার পোস্তচচ্চরি আছে। দেব? ভাতে কম পড়লেও—সুবালা ঘাড় নেড়ে জানায় দরকার নেই।

বৌদি, হেরে গেলুম! হেরে গেলুম!

আবার ওই কথা! যতীন মৃদু ধমক হাঁকায়। লড়াই কি শেষ হয়ে গেল? ফের লড়বি। লড়াইয়ের নিয়ম হচ্ছে দুপা আগে এক পা পিছে। এবার আরও জোরসে লড়বি। কুন্তিদির তো শুধু হাতে চোট লেগেছে—আর আমাদের নিমাই মিত্তিরকে গুণ্ডারা খুন করেছিল। আমরা সেবার হেরে গিয়েছিলুম। কিন্তু হেরে থেকেছি? শোধ নিইনি? দালালগুলোকে ইউনিয়ন থেকে লাথি মেরে তাড়িয়ে কোম্পানির ঘাড় মটকে পাওনা আদায় করিনি? চড়া সুরে এক দমে কথা বলে যতীন হাঁফায়।

নিমাই মিত্তিরকে গুণ্ডারা খুন করেছিল। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে নিমাই মিত্তিরকে।

নিমাই মিত্তিরের মা কাঁদেনি। মিটিংয়ে গেছে। মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে বলেছে, আমরা ছেলেকে খুন করার শোধ তোমরা তোলো। যদি না পারো তাহলে বুঝব—মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছে।

চাঁপার পিঠে সুবালা হাত বুলোয়। কেঁদ না ঠাকুরঝি, কেঁদ না।

আমাকেও কিছু খেতে দাও। দুপুরে খাওয়া হয়নি।

বিভা বলে, তুমি আমার ঘরে খাবে এসো যতীনদা। বিউলির ডাল পোস্ত চচ্চড়ি আছে।

চাঁপারা কি শোধ তুলতে পারবে না? বোমা মেরে কুন্তিদির হাত উড়িয়ে দেওয়ার শোধ? পিটতে পিটতে মোহনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার শোধ? নিজের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার শোধ? ঠাকুরঝি।

হেরে গেলুম বৌদি! হেরে গেলুম!

চাঁপার পিঠে সুবালা হাত বুলোয়। কেঁদনা। কাঁদতে নেই।

দুটি খেয়ে নে চাঁপি। যা—

খাব না! খাব না! আমি আর কখনো খাব না!

কেন খাবে না ঠাকুরঝি! এর শোধ তুমি—

হেরে গেলুম বৌদি! হেরে গেলুম!

ছেলেমানুষি করিসনি চাঁপি। যা, খেয়ে নে।

দাদা! হেরে গেলুম!

এ তো আচ্ছা—! বিরক্ত হয়ে চটে উঠতে গিয়ে বোনের কান্না ভেজা কাতর-করুণ মুখখানা দেখে যতীন সামলে নেয়। খানিক থম ধরে থেকে বলে, ভালো মনে পড়েছে, তোমার সেই বাঘডাঁসার গল্পটা চাঁপিকে শুনিয়ে দাও তো ননীর মা। দাও শুনিয়ে। ওই গল্প শুনলে—

বাঘডাঁসার গল্প! নিমাই মিত্তির খুন হতে যতীনও সেদিন এই ভাবে ভেঙে পড়েছিল। সারাটা রাত গুমরে গুমরে সে কী কান্না মানুষটার!

বাঘডাঁসা কি জানিস? আমরা যাকে গো-বাঘা বলি, তোর বৌদিদের দেশে তাকেই বলে বাঘডাঁসা। বলো না গো গল্পটা।

ভোর বেলা গল্পটা বলেছিল। গল্প শুনে চোখের জল উবে গিয়েছিল, টান্ টান্ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পাগলের মত এক চোট তাকে আদর করেই

বেরিয়ে গিয়েছিল। সাথীদের সব ডেকে এনেছিল। বাঘডাঁসার গল্প শোনাতে। বাঘডাঁসার গল্প!

কই, বলো। সুবালাকে হুকুম করে নিজেই যতীন শুরু করে সে অনেক দিন আগেকার কথা। তোর বৌদির ছেলেবেলার কথা। একটা বাঘডাঁসা না গাঁয়ে ভীষণ উপদ্রব শুরু করল। আজ এর হাঁস মারে কাল ওর ছাগল মারে আজ এর বাছুর মারে কাল ওর মুরগি মারে। গাঁয়ের লোকেরা সাবধান হয়। তবু বাঘডাঁসাটা—

বাঘডাঁসার গল্প! যতীনের সাথীরা তার কাছে শুনে তাকে নিয়ে গিয়েছিল নিমাই মিত্তিরের মায়ের কাছে। নিমাই মিত্তিরের মাকেও শুনিয়েছিল বাঘডাঁসার গল্প।

বাঘডাঁসার গপ্প শুনেই নিমাই মিত্তিরের মার চোখের জল শুকিয়ে যায়। চোখে আগুনের ঝিলিক দেয়।

তোর বৌদির না একটা বেড়াল ছিল। খুব আদরের বেড়াল। সেই বেড়াল নিয়ে খেত, বেড়াল নিয়ে খেলত বেড়াল নিয়ে শুত। কী নাম যেন গো বেড়ালটার ?

বাঘডাঁসার গল্প শুনেই নিমাই মিত্তিরের মা হাওড়া ময়দানের মিটিংয়ে যায়। বক্তৃতা দিতে উঠে। আমার ছেলেকে খুন করার শোধ তোমরা তোল। তা যদি না পারো তাহলে বুঝব—এক টানে মাথার আঁচল টেনে ফেলে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

সেই বেড়ালটাকেও শালা মারল। সে কী কান্না তোর বৌদির! কী কান্না! ও শালার কিন্তু সাহস বেড়ে গেল। একদিন ভরসন্ধেয় শালা করল কি মানু বৌদির চোখের সামনে দাওয়া থেকে তার ছ মাসের ছেলেটাকে—

ছেলে নিয়ে গেল যতীনদা ?

নিমাইয়ের মার বুক-ফাটা কান্না। শোনা মাত্র তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়, বসে-থাকা মানুষগুলি। এক গলায় গর্জে উঠে, নিমাইয়ের মৃত্যুর শোধ চাই। রক্তের বদলে রক্ত চাই।

এইবার গাঁয়ের লোক কোমর বাঁধল। মানুষের ওপর হামলা! এত বড় সাহস শালা বাঘডাঁসার! সন্ধে থেকে সকাল অবধি জোয়ান ছেলেরা

কোচ বল্লম সড়কি নিয়ে গাঁ পাহারা দেয়। মুখুজ্জেদের দারোয়ান বন্দুক ঝাগিয়ে রাত ভর মুখুজ্জেদের বাড়ির চারপাশে ঘোরে।

নিমাইয়ের মৃত্যুর শোধ চাই! রক্তের বদলে রক্ত চাই! তবু তো ওই মানুষগুলি বাঘডাঁসার গল্প শোনেনি!

বাঘডাঁসা তো আর এ সব জানে না। মানুষের বাচ্চা মেরেও পার পেয়ে ধরাকে এখন শালা সরা জ্ঞান করছে। একদিন—ঠিক দুপুরে বেলা শালা এসে ঢুকল নন্দীদের গোয়ালে। পুকুরঘাট থেকে দেখল নন্দীদের এক মুনীষ—কী যেন নাম গো? সাধুচরণ না?

তারপর কত লোক এসেছে বাঘডাঁসার গল্প শুনতে। কতবার বলেছে বাঘডাঁসার গল্প।

মুনীষটা করল কি পা টিপে টিপে গিয়ে দুম করে টেনে দিল গোয়ালের ঝাঁপ। দিয়েই চিৎকার—

যতীনের বন্ধুরা বলে, বাঘিনী বৌদি! বাপের বয়সী একজন তো একবার বাঘিনী মা বলে ঢিপ করে প্রণাম করেও বসেছিল।

হাঁক শুনে হই হই করতে করতে সবাই ছুটে এল।

বাঘডাঁসাটাকে মেরে ফেলল যতীনদা? মেরে ফেলল?

ফেলবে না! মওকা পেয়েছে—ছেড়ে দেবে? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। দিন একদিন সবারই আসে। অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। প্রথমে সড়কি দিয়ে বিঁধল, তারপর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে শালাকে খতম করে ফেলে দিল।

না না না! প্রচণ্ড প্রতিবাদে সুবালা ফেটে পড়ে।

না মানে? যতীন ভড়কে যায়। বাঘডাঁসাটাকে মেরে ফেলল না?

ফেলল। কিন্তু—

কী কিন্তু?

এইভাবে গল্প বলে বাঘডাঁসার! এর নাম বাঘডাঁসার গল্প বলা! চাঁপাকে ঠেলে সরিয়ে সুবালা সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

বাঘডাঁসা ফাঁদে পড়েছে শুইনাই মানুবৌদি ছুটতে ছুটতে আইল। হ হ, মানুবৌদি যার পোলারে খাইছে অই রাইক্ষসে হেই মানুষডা। হাতে তার মস্ত একখান দাও। হ হ, দাও। দাও—হাতে মানুবৌদি ছুটতে

ছুটতে আইল। অরে মারিস না, অরে মারিস না। কেউ অরে মাইর না। আমার পোলার শোধ আমি নিজে লমু। তখনও রাইক্ষসের ল্যাজখান একটু একটু নড়তে আছিল। আইসাই মানুবৌদি দাওয়ের এক কোপে ল্যাজখানারে কাটল।

মানুবৌদি ?

হু—হু মানুবৌদি। দুই চোখ সুবালার দপ দপ করে। গলা চিরে বলে, আমাগো গায়ের বউ মানুবৌদি। আমার দাদা কইত বৌঠান। আমরা ডাকতাম বৌদি। হায়াফায়া তখন তার চুলায় গেছে গিয়া। রাইক্ষসডার সামনে উবু হইয়া রইল। তারপর দাও দিয়া হেডারে কোপাইতে লাগল। কোপাইয়া কোপাইয়া কাটল। কাইট্যা টুকরা টুকরা করল। টুকরা টুকরা করল—

ননীর মা। বৌদি! সুবালা! সুবালাদি! বৌমা!

কাইট্যা টুকরা টুকরা কইরা কইল, ভাগাড়ে এখন ফেইলা দাও। বাঘডারে এখন শকুনে খাউক। বাঘের মাংস শকুনে খাউক।

এটা কিন্তু তুমি আগে—সুবালার চোখেমুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা যতীন শেষ করার ভরসা পায় না।

আগে কই নাই বুঝি? না কই নাই। দরকার পড়ে নাই বইলা কই নাই।